শাক্তপদাবলী

ও

শক্তিসাধনা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

সিটি কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ডি এম লাইব্রেরী,
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীগাপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ—২রা চৈত্র ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—মহালয়, ১৩৬৭

মূল্য ঃ ছয় টাকা

মুদ্রাকর ঃ

মহেন্দ্র প্রেস
৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সহৃদয় বন্ধু

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু

পূর্বভাষ

শক্তি-সাধনা এবং শাক্ত সাহিত্য বাঙলার জাতীয় জীবনেরই একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে শাক্ত ধর্ম ও দর্শনের বহুবিচিত্র ইতিহাস আমরা প্রাচীনকাল হইতেই পাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বিভিন্ন শক্তিপূজার কেন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়, শাক্ত সাধনপদ্ধতিকেও আমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির সহিত বহুস্থানে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত দেখিতে পাই, তথাপি আমাদের স্বীকার করিতে হয়, এই শাক্ত সাধনার ধারা বাঙলাদেশে যেমন বিশিষ্ট এবং ব্যাপক পরিণতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে, এ-রূপ আর কোথাও নহে। শাক্তধর্ম এখনও বাঙলার জীবন্ত ধর্ম। অষ্টাদশ শতকে সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে প্রসারিত করিয়া একটি সার্বজনীন রূপ দিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মূর্তিকে কেন্দ্রে রাখিয়াই একটি সর্বধর্মসমন্বয়ের নূতন ইঙ্গিত দিলেন, বিংশ শতাব্দীর যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ এই তন্ত্রসাধনার উপরেই তাঁহার 'দিব্যজীবনে'র সাধনা গড়িয়া তুলিলেন। এই সাধনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেও শাক্তমতের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশপ্রীতির পটভূমিতে যে বহুযুগ-আবর্তিত শাক্ত ঐতিহ্যের গাঢ় বর্ণশাবল্য তাহাকে আমরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারি না।

এই শাক্ত চিন্তাধারা বহুকাল যাবৎ বাঙালীর জাতীয় জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়াছে। জাতীয় জীবনকে যে সব বিশ্বাস ও ধ্যানমনন এতদিন আলোড়িত করিয়াছে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের উপরে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্নভাবে তাহার প্রভাব পড়িবেই,—তাই আমরা বাঙলাদেশে দেখিতে পাই—বিপুলকায় শাক্ত সাহিত্য—সংস্কৃতেও রচিত বাঙলায়ও রচিত: অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পূর্ব কাল হইতে আমরা বাঙলায় সংস্কৃতে রচিত যে বিপুলকায় শাক্তগ্রন্থ দেখিতেছি, তাহার বড় অংশই অবশ্য হইল পুরাণ-উপপুরাণ, এবং তন্ত্র-উপতন্ত্রজাতীয়। কিন্তু শিব-শক্তিকে লইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যও যে রচিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পাওয়া গেল শাক্ত সাহিত্যের আর একটি রূপ—যাহা শুধু বাঙলাদেশেই পাওয়া গেল—ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা গেল না। তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দেখিতে

পাই আমাদের শাক্ত-পদাবলী ; ইহাও বাঙালাদেশের একান্তভাবে নিজস্ব জিনিস। দেবীকে লইয়া কিছু কিছু লোক-সঙ্গীত, বা হর-গৌরীকে লইয়া বিবাহ-উপলক্ষ্যে কিছু কিছু লোক-সঙ্গীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বাঙলার শাক্তপদাবলীর সহিত কোনও দিক হইতে তাহার কোনও তুলনাই চলে না।

বাঙলাদেশের এই দেশ-কালের বিপুলতায় এবং গভীরতায় পরিব্যাপ্ত শাক্ত সাধনা এবং শাক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা খুবই কম হইয়াছে। সংস্কার, কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া কতগুলি সত্য, অর্ধসত্য এবং অসত্য ধারণাই আমাদের মধ্যে সক্রিয় হইয়া আছে। আমাদের সাহিত্য সমালোচনাও অস্পষ্ট উচ্ছ্বাসবাষ্পে আচ্ছন্ন। এইরূপ অবস্থায় বাঙলার 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিশেষ অবকাশ এবং প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, সত্য-সন্ধানী এবং রসপিপাসু উভয়বিধ পাঠকেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানি সত্যসত্যই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত এবং বহুদিন প্রত্যাশিত।

লেখক বর্তমান গ্রন্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী' গ্রন্থখানিকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলেও এই শাক্তপদাবলীর প্রাচীন পটভূমিরও তিনি মোটামুটি ভাবে একটি পরিচয় দিয়াছেন। শাক্ত সাধনা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকিলে শাক্ত সাহিত্য সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা হয় না ; তাই শাক্ত সাধনার মূল কথাগুলি সম্বন্ধেও তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং পারিভাষিকতাকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া তিনি তথ্য ও সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থরচনার পশ্চাতে লেখকের বহু দিনের নিবিষ্ট অধ্যয়ন এবং সংস্কারমুক্ত চিন্তনের পরিচয় রহিয়াছে। বিভিন্ন ক্রমে শাক্ত সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার শেষে লেখক সাধক রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ শাক্তপদাবলী-কারগণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রগণের নিকটেই সহায়ক গ্রন্থরূপে যে অপরিহার্য হইয়া দেখা দিবে তাহা নয়—বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতীয় জীবনের সামগ্রিক রূপ লাভের জন্য যাঁহারা আগ্রহবান্ তাঁহাদের নিকটেও গ্রন্থখানি প্রচুর সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯।৩।৫৭

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

শাক্ত গীতি ও বৈষ্ণব পদাবলী উভয়ই বাঙলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। ভক্তি ও ভালবাসার এমন পবিত্র মধুর সঙ্গম অন্যত্র দুর্লভ। কিন্তু বৈষ্ণব পদ সাহিত্য লইয়া যেরূপ বিশদ আলোচনা হইয়াছে, তাহার তুলনায় শাক্তপদাবলীর আলোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ করিয়া যে শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শাক্ত সঙ্গীতের গীতরস উচ্ছলিত, তাহাদের কোন ধারাবাহিক, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশিত হয় নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের ছাত্রছাত্রীদিগকে এই সকল পদ পাঠ করিতে হয়। বহু দিন যাবৎ 'শাক্তপদাবলী'র অধ্যাপনা করিতে করিতে 'কাব্যের উপেক্ষিত' এই শাক্ত পদ-সাহিত্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। প্রধানতঃ এই কারণেই এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

অবশ্য শাক্ত-সঙ্গীতের আবেদন এদেশে সর্ব্বত্র প্রসারিত। বাঙলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্যামা-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করেন। শাক্তগীতি ভক্তের হৃদি-রঞ্জন, গৃহীর সান্ত্বনা এবং জনসাধারণের 'কর্ণামৃত'। যাহাতে এই পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকও শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। শক্তি-সাধনার সাঙ্কেতগুলির সহিত পরিচয় থাকিলে 'প্রসাদী' সঙ্গীতের আস্বাদ্য মাধুর্য্য আরও মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়। তাই এই গ্রন্থে সংক্ষেপে শক্তিবাদের ইতিহাস, শাক্ত গীতির উৎস, তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধনার যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ শাক্তপদাবলীর কাব্য-সৌন্দর্য্য ও কবি-প্রসঙ্গও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠক—উভয়কে লক্ষ্য করিয়াই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

অবশ্য যতটা আমার সাধ, সাধ্য তাহার তুলনায় অতি অল্প। এই পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিজেই সন্দিগ্ধ। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে। সিটি কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী, অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক অগ্রজোপম জগদীশ ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বন্ধু শান্তি সিংহরায়, অনুজোপম অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসু, প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত এবং আরও অনেকের আগ্রহাতিশয্যের

কথা এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। সর্ব্বোপরি এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা দিয়াছেন কৃতী অধ্যাপক ও কথাশিল্পী বন্ধুবর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিদান দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় গোপালদাস মজুমদার মহাশয় পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকমুদ্রনে সহায়তা করিবার জন্য শনিরঞ্জন প্রেসের তরুণ পরিচালক শ্রীরঞ্জন দাস এবং সুযোগ্য কর্ম্মসচিব শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকের 'পূর্ব্বভাষ' লিখিয়া দিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত ভূমিকা-সম্বলিত হওয়ায় এই সাধারণ পুস্তক অসাধারণ মর্য্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের ভাষা আমার নাই, করুণাময়ী জগজ্জননীর নিকট তাঁহার সুদীর্ঘ গৌরবময় জীবন কামনা করি

শাক্ত পদসাহিত্যের নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থেরও অত্যন্ত অভাব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী' পূর্ণাঙ্গ না হইলেও নির্ভরযোগ্য বিবেচনায়, অলোচনার জন্য এই গ্রন্থখানিই অবলম্বন করিয়াছি। শাক্তপদ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া প্রণালিবদ্ধ আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। আমার এই চেষ্টা প্রথম বলিয়া ইহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই থাকিবে। আশাকরি সহৃদয় সুধীবর্গ দোষগুলি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন এবং বন্ধুভাবে উপদেশ দিবেন। প্রুফ দেখায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ মুদ্রণ ত্রুটিও কিছু রহিয়া গেল। এ বিষয়ে সংশোধনী তালিকা নির্ম্মাণ অপেক্ষা পাঠকের বিচার বুদ্ধি সমধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করি। দোষখণ্ডনের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে 'অপরাধক্ষমাপণ' স্তোত্র আছে, তাহা উচ্চারণ করিয়া নিবেদন শেষ করিতেছি,—

অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যন্ন্যূনমতিরিক্তং বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম মহদ্বা স্বল্পমেব বা।
তৎ সর্ব্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি! ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ ॥

দোলপূর্ণিমা ১৩৬৩
সিটি কলেজ কলিকাতা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অত্যল্প কালের মধ্যে 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। পুস্তকখানি যে সহৃদয় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিভাগের পাঠ্য তালিকায় গ্রন্থখানি অনুমোদিত হইয়াছে। আমি এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি অংশ প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করিয়াছি। তাহাতে গ্রন্থের আয়তন একটু বাড়িয়াছে। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমি গুণগ্রাহী, কৌতূহলী পাঠকের প্রশংসা পত্র পাইয়াছি। তাঁহাদিগের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। এই সংস্করণের মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে 'মহেন্দ্র প্রেসে', কর্ম্ম সচিব শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত মহাশয় এজন্য ধন্যবাদার্হ।

পোঃ গড়িয়া (২৪ পরগণা)
মহালয়া, ১৩৬৭

সূচীপত্র

অবতরণিকা পৃষ্ঠা ১-৭৮

(**এক**) স্থচনা : শাক্তসঙ্গীতের বিভিন্ন নাম : শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা। (**তুই**) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শাক্তপদ রচিত না হইবার কারণ : অষ্টাদশ শতকে শাক্তগীতির সমৃদ্ধি। (**তিন**) শক্তিপূজার ইতিহাস : আর্য্য সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রসার : তন্ত্রশাস্ত্র : বৌদ্ধধর্ম্ম ও বাঙলাসাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব। (**চার**) শাক্তপদাবলীর সম্ভাব্য উৎস : বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্রশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যের রচনাবলী, গোবর্দ্ধন আচার্য্যের 'আর্য্যা সপ্তশতী', প্রকীর্ণ কবিতাবলী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য। (**পাঁচ**) শাক্তপদাবলীর বিশিষ্টতা : পরম উদার ভাব, সর্ব্বমতের সমন্বয়, অকৃত্রিমতা ও সরলতা, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, বিশিষ্ট স্থর ও উদ্দীপন-শক্তি। (**ছয়**) অন্যান্য গীতাবলীর তুলনায় শাক্তপদাবলী : চর্য্যাপদ, বাউল গান, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলী। (**সাত**) শাক্তপদাবলীর বিষয়-বিভাগ।

লীলাপর্ব্ব ৭৯-১০৮

(**এক**) আগমনী ও বিজয়া : লীলার তাৎপর্য্য : পারিবারিক আলেখ্য : লীলা-পর্ব্বের চরিত্র : মা ও মেয়ের মিলন দৃশ্য : বিজয়ার বিদায় দৃশ্য : নবমী রজনী : দশমীর প্রভাত : প্রকৃতির পটভূমিকায় মাতৃ-চিত্র : মেনকা, যশোদা ও শচীমাতা : আগমনী ও বিজয়ার গানে শক্তিতত্ত্ব।

উপাস্যতত্ত্ব ১০৫-১৫৩

(**এক**) শক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথা : বেদে-দর্শনে-পুরাণে শক্তিতত্ত্ব : তন্ত্রের শক্তি-তত্ত্ব। (**তুই**) ব্রহ্মময়ী মাতৃতত্ত্বের তুরধিগম্যতা। (**তিন**) মহামায়াতত্ত্ব : ইচ্ছাময়ী মা, লীলাময়ী মা। (**চার**) গুণময়ী মা : করুণাময়ী মা : কালভয়হারিণী মা। (**পাঁচ**) জগজ্জননীর রূপ : মূর্ত্তি কল্পনার হেতু : দেবীর বিভিন্ন রূপ : তন্ত্রোক্ত ধ্যানমূর্ত্তি : শাক্তগীতির শ্যামা মূর্ত্তি। (**ছয়**) মূর্ত্তি রহস্য ব্যাখ্যা : তন্ত্রমতে 'কালী' মূর্ত্তির রহস্য : শাক্তপদকর্ত্তাদের ব্যাখ্যা। (**সাত**) জগজ্জননীর রূপ-কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব।

উপাসনা-তত্ত্ব পৃষ্ঠা ১৫৪-২১৩

(এক) সাহিত্যে তান্ত্রিক সাধকের চিত্র: তন্ত্রোপাসনার মর্ম্মার্থ: তন্ত্র-সাধনা—সপ্ত আচার, ভাবত্রয়। **(দুই)** সাধন-প্রণালী: ভাব-ভক্তি ও শ্রদ্ধা: দীক্ষা: মাতৃপূজা: দেহতত্ত্বের কথা: নাড়ী, বায়ু, ষট্‌চক্র, সহস্রার পদ্ম: দেহ-সাধনা—ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম, অন্তর্যাগ, কুণ্ডলিনী-যোগ। **(তিন)** শাক্তপদাবলীতে শক্তি-সাধনার রূপ: ভক্তের আকুতি। **(চার)** মনোদীক্ষা: মনের প্রকৃতি ও মনোদীক্ষার তাৎপর্য্য: প্রবৃত্তি জয়ের উপায়: সাধন-পদ্ধতি: 'মনোদীক্ষা' পদাবলীর সৌন্দর্য্য। **(পাঁচ)** মাতৃপূজা: ভাবের পূজা: ব্রহ্মময়ী মায়ের পূজা: পূজার ফলশ্রুতি—সাধন-শক্তি।

কাব্যমূল্য ২১৪-২৪৩

(এক) ধর্ম্ম ও কাব্য: কাব্য-বিচারের মাপকাঠি 'জীবন': তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে 'জীবন': তান্ত্রিক সাধকের স্বাভাবিক কবিত্ব: শাক্তপদাবলীর ত্রুটি। **(দুই)** শাক্তসঙ্গীত জীবনরসাশ্রয়ী কাব্য: পারিবারিক চিত্র, চিরকালের নিপীড়িত মানবের চিত্র: শাক্তপদের ভাষা: প্রার্থনা সঙ্গীতরূপে শাক্তগীতির মূল্য: শাক্তপদের মাধুর্য্য-ভাব—মাতৃ-মহাভাব, সন্তান-ভাব। **(তিন)** শাক্তপদাবলীর নাটকীয় রূপ: গীতি-কবিতার রূপ। **(চার)** অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিতা হিসাবে শাক্তপদের বিভাগ।

কবি-প্রসঙ্গ ২৪৪-৩১৬

(এক) শাক্তগীতির ক্রমবিবর্ত্তন: অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ: অষ্টাদশ শতাব্দী: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শাক্তপদের রূপ: পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবে শাক্তগীতির রূপান্তর। **(দুই)** মাতৃসাধক ও ভক্ত কবি: রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি: রাজ-বংশীয় কবি—কৃষ্ণচন্দ্র, নন্দকুমার, রামকৃষ্ণ, মহাতাবচাঁদ প্রমুখ কবি: দেওয়ান বংশের কবি—ব্রজকিশোর, রঘুনাথ রায় প্রভৃতি: মাতৃবন্দনায় কবিওয়ালা—হরুঠাকুর, রাম বসু, এ্যান্টুনী ফিরিঙ্গী: টপ্পাগায়ক—নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা: পাঁচালিকার—দাশরথি রায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস দত্ত: যাত্রাওয়ালা—মদন মাস্টার, নীলকণ্ঠ, ব্রজমোহন রায়: নাট্যকার—মনোমোহন বসু, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হরিমোহন রায়, গিরিশ ঘোষ: অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক—ঈশ্বর গুপ্ত, কাঙাল হরিনাথ, প্যারীমোহন কবিরত্ন, মধুসূদন দত্ত, নবীন সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত সেন, অশ্বিনী দত্ত, পঞ্চানন তর্করত্ন: ভুলুয়া বাবা, সতীশচন্দ্র, গিরিশ ভট্টাচার্য: উপসংহার।

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

অবতরণিকা

॥ এক ॥

সূচনা

শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত বা শাক্তপদাবলী বাঙলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। অপূর্ব্ব সুরময়, বিচিত্র কবিত্বপূর্ণ, মাতৃদেবীর অনন্ত মহিমাব্যঞ্জক এই গান যেমন ভক্তির উদ্বোধক, তেমনই প্রাণোন্মাদক। শক্তিসাধনার সুউচ্চ আদর্শ লইয়া গানগুলি রচিত; শ্যামাসঙ্গীত সমুন্নত মাতৃ-আরাধনার কাব্যভাষ্য। বাঙালীর নিকট এই গানগুলি বড় আদরের সামগ্রী, যেন তাহাদের হৃদয়মন্থনোদ্ভূত অমৃত। বহুদিন পর্য্যন্ত এই অমৃত জাতীয় জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিসাধক কবিবৃন্দ অত্যাশ্চর্য্য সাধন-শক্তির বলে 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়া এই অমৃত আহরণ করিয়াছেন।

এই দিক হইতে সঙ্গীতগুলি যেন বাঙালীর জীবনে এক নবতত্ত্ব আবিষ্কার। শক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে অনেক কাব্য রচিত হইয়াছিল; অনেক শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল। তাহাদের মধ্যেও শক্তিতত্ত্ব, মাতৃভক্তি ও শক্তি-আরাধনার কথা ছিল। বাঙালী সে কাব্য আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের রস পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন এই নূতন শাক্তসঙ্গীতগুলি রচিত হইল, তখন যেন তাহারা আবার বিস্ময়াবিষ্ট হইল, আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবির ভাষায় বলিয়া উঠিল:

> **Then felt I like some watcher of the skies**
> **When a new planet swims into his ken.**
>
> **(Keats)**

শাক্ত সঙ্গীতের বিভিন্ন নাম

যাহা আমাদের অন্তরের সামগ্রী, কত নামেই না আমরা তাহাকে অভিহিত করিয়া থাকি। শাক্ত সঙ্গীতগুলিরও বিভিন্ন নাম। কেহ ইহাকে বলেন, 'মালসী', কেহ বলেন, 'প্রসাদী সঙ্গীত'। 'শ্যামা সঙ্গীত' ও 'শাক্ত পদাবলী' নামগুলিও প্রচলিত।

দেবী-বিষয়ক গানগুলির **'শাক্ত পদাবলী'** নামটি অবশ্য আধুনিক। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর নামসাদৃশ্যে এইরূপ নামের নির্ব্বাচন। 'পদাবলী' কথাটি কবি জয়দেব সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত চর্য্যা গীতিকার টীকায় 'ধ্রুবপদেনদৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ', 'দ্বিতীয় পদেন তমেবার্থং প্রতিনির্দ্দেশয়তি', 'তৃতীয়পদেন বর্ত্মমাহাত্ম্যং কথয়তি' প্রভৃতি উক্তিতে 'পদ' শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ স্থলে 'পদ' শব্দটির অর্থ দুই ছত্রের কবিতাংশ। কবি জয়দেব 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' বলিতে সম্ভবতঃ দুই ছত্রযুক্ত কতিপয় পদের সমষ্টি একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পববর্ত্তী কালে 'পদ' শব্দটিই একটি পূর্ণাঙ্গ সংহত সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইযাছে; 'পদাবলী' এইরূপ অনেকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। 'শাক্ত পদাবলী' নামটিও এই অর্থেই প্রযুক্ত।

পূর্ব্বে দেবী-বিষয়ক গানের নাম ছিল **'মালসী'**। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশযের 'করুণানিধান বিলাস' কাব্যে 'ভবানী-বিষয়ক' গানকে 'মালসী' বলা হইয়াছে।[১] 'মালসী' নামটি সুপ্রাচীন। চর্য্যা গীতিকায় (৩২, ৪০ নং চর্য্যা) 'মালসী' বাগিণীব উল্লেখ আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রের মতেও 'মালসী' রাগিণীবিশেষ, মালব বা ভৈরব বাগের স্ত্রী। অপরূপ তাঁহার রূপ। অপরাহ্ণকালে এই রাগিণীতে গান গাহিবার নিযম; সেখানে আরও বলা হইয়াছে—

শক্রোত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
গীয়তে তদ্‌বুধৈর্নিত্যং মালসী সা মনোহরা॥[২]

ইন্দ্রোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত যে বাগিণীতে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গান গাহিয়া থাকেন, তাহা মনোহারিণী মালসী।

কিন্তু সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, দেবী-বিষয়ক 'মালসী' শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মবদ্ধ রাগিণী নয়। এ দেশের জারি-সারি, ভাটিয়ালি গানের মত ইহা একপ্রকার লোকসঙ্গীত। যেহেতু মালসী (মালবশ্রী) ভৈরবরাগের প্রিয়া এবং দুর্গাপূজা উপলক্ষে

১। 'ভবানী ভবের গান মালসী মাযুর'; ভবানী-বিষয়ক গানের নাম 'মালসী', আর শিব-বিষয়ক গানের নাম 'মাযুর'।

২। সঙ্গীত দামোদর, শব্দকল্পদ্রুমধৃত 'রাগ' শব্দ দ্রষ্টব্য

ইহা গীত হয়, এই জন্যই ইহার নাম 'মালসী' হইয়াছে। এই অর্থে শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলির 'মালসী' নাম অসার্থক নয়।

পরবর্ত্তী কালে শাক্ত সঙ্গীতকে **'প্রসাদী'** গানও বলা হইয়াছে। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই সঙ্গীতগুলিকে একটি বিশিষ্ট সুরে ও ঢংয়ে গান করিতেন। প্রায় সকলেই তাঁহাকে এই সঙ্গীতেব প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কি ভাবের দিক হইতে, কি সুরের দিক হইতে অন্যান্য লেখক বা গায়কের শাক্ত সঙ্গীতের উপর রামপ্রসাদের অমোঘ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সকলেব নিকট 'প্রসাদ' নামে পরিচিত। সঙ্গীতের মধ্যেও তিনি নিজে 'প্রসাদ বলে এই কথা', 'প্রসাদের এই বাণী', 'প্রসাদ ভাষিছে' এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট সুরে শক্তি-বিষযক সঙ্গীত গান করা হয় জন্য, প্রসাদ নামের স্মৃতি-বিজড়িত এই সঙ্গীতগুলির 'প্রসাদী সঙ্গীত' নামটিও সুপ্রচলিত।

শাক্তপদাবলীর কতকগুলি গানকে **'আগমনী'** বলা হয। বাঙালীব ধারণা, দুর্গোৎসবের সময় বৎসরান্তে উমা পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই আগমনকে উপলক্ষ করিয়া কবিগণ মা মেনকার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অন্তরবেদনাকে গানের মধ্যে প্রকাশ কবিযা থাকেন। আগমন-বিষয়ক গান বলিযা শাক্তসঙ্গীতের 'আগমনী' নামটি প্রসিদ্ধ।

অনেকে যে কোন শাক্ত সঙ্গীতকেই 'আগমনী' বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিমত, দেবী দুর্গাব এক নাম 'আগমনী ; অতএব শক্তিবিষয়ক গান মাত্রই আগমনী। কিন্তু এই অর্থে আগমনীর ব্যবহা সীমাবদ্ধ। শাক্ত পদাবলীর এক এক অংশ যেমন 'নবমী', 'বিজযা', 'একাদশী'[১]—তেমনই আর একটি অংশ 'আগমনী'। 'আগমনী' প্রকৃতপক্ষে উমাব 'আসার আশা'র গান।

শক্তিবিষযক গানগুলির আব একটি প্রচলিত নাম **'শ্যামাসঙ্গীত'**। শ্যামা বলিতে বিশেষ ভাবে কালীকে বুঝায। শাক্ত পদাবলীর অধিকাংশ পদ শ্যামা-বিষয়ক। কালীই এখানে প্রধান দেবতা। অবশ্য তারার নামটিও শ্যামার সহিত অভেদে ব্যবহৃত হয। শাক্ত সঙ্গীতে অন্যান্য মহাবিদ্যা অপেক্ষা অসিতবরণা কালী ও তারার প্রাধান্য হেতু ইহার শ্যামাসঙ্গীত নামটি সার্থক এবং বহুল প্রচলিত।

শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা

শাক্ত পদাবলী রচিত হইবামাত্র জাতীয় জীবনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। সে উদ্দীপনায় কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা, ঢাকা সমগ্র

১। উমা কৈলাসে চলিয়া যাওয়ার পর, তাঁহাব মিলন-স্মৃতি লইয়া যে বিরহের গান, তাহা 'একাদশী'র অন্তর্ভুক্ত; এরূপ গানও পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। সাধক ভক্তের তো কথাই নাই, নবাব, রাজা, জমিদার পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কমলাকান্তের গানে নিষ্ঠুর দস্যুর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। এমন কি তখনকার দিনের 'হঠাৎ বাবু'র দলও ইহাদের মোহময় আকর্ষণ হইতে মুক্ত ছিলেন না।

শাক্ত সঙ্গীত জন-জীবনে এমন এক মোহকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তখনকার দিনের লোক-সঙ্গীতের পরিবেশকবর্গকে জনসাধারণের রসপিপাসা মিটাইবার জন্য, সহস্র সহস্র শ্রোতা-পরিবেষ্টিত গীতের আসরে শ্যামাসঙ্গীত গান করিতে হইত। আখড়াই এবং কবি গাহনার আরম্ভ হইত 'মালসী' গান গাহিয়া। পক্ষীর দলের বাবুরাও শাক্ত সঙ্গীত গাহিতেন। তথাকথিত বাবুর দল দুর্গোৎসব উপলক্ষে 'নবমী' গাহিয়া ঢলাঢলি করিতেন (দ্রষ্টব্য 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা')।

টপ্পা-গায়ক, কবির দল, পক্ষীর দল যেমন শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেন, পাঁচালী-গায়ক, যাত্রাওয়ালাদিগকেও তেমনই দেবীবিষয়ক গান গাহিতে হইত। পরবর্ত্তী কালের গীতাভিনয়, যাত্রা-নাট্য ও নাটকগুলিতে প্রচুর শ্যামাসঙ্গীতের সমাবেশ দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙলা দেশে নব্য ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে 'ইয়ং বেঙ্গল' যখন দেশীয় সকল আচার ও সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, তখনও শাক্ত সঙ্গীতের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত নিজে শক্তি-বিষয়ক পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বহু কষ্ট স্বীকার করিযা, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তিনি এই লুপ্তপ্রায় গীতরত্ন উদ্ধার করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাদস্তুর সাহেব ছিলেন মাইকেল এম. এস. ডাট বার-এ্যাট-ল'। তিনিও 'ফি' লইবার পরিবর্ত্তে 'আগমনী' গান শুনিয়া মক্কেলের মকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছেন, নিজে চতুর্দ্দশ পদাবলীতে 'নবমী' ও 'বিজয়া দশমী' লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ছিলেন 'মা পাগল' সাধক। গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে তিনি শ্যামাসঙ্গীত গান করিতেন, কখনও এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতগুলির সাহায্যে তিনি শক্তি-সাধনার গূঢ়তত্ত্ব অতি সহজ ও সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাধক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপাধন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক শ্যামাসঙ্গীতে পূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'আমি মায়ের ঘোর রূপের উপাসক।' তাঁহার রচিত Kali The Mother ('মৃত্যুরূপা মাতা')

একটি বিখ্যাত কবিতা। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ব্রহ্মসঙ্গীতের সহিত মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণ যেদিন দেশহিতব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সেদিনও মাতৃগীতি নূতন তাৎপর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ মাতৃকাকে জগজ্জননীর প্রতীক ধরিয়া প্রেমিক সন্তান 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অগ্নিচয়নেচ্ছু দামাল সন্তানের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকায় ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর (?) নব মাতৃসঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল :

না হইতে মা গো, বোধন তোমার
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডি, জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ তট।

পরাধীন জাতিব নাবী-সমাজকে জাগ্রত করিবাব জন্য চারণ কবি মুকুন্দদাস গাহিযাছিলেন :

জাগো গো, জাগো গো জননি !
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেউ জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে মা গো,
নাচিবে না ধমনি।

এই সকল গান গাহিয়া চাবণ কবি পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণকে শক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া স্বদেশেব ব্রতে দীক্ষিত করিতেন। অগ্নিযুগের জীবন্ত বাণীমূর্ত্তি নজরুল ইস্‌লামও শাক্ত সঙ্গীতের অদ্ভুত গীতমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, ভক্তের মতই আবেগভরে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিযাছেন। তাঁহাব রচিত 'বল্ রে জবা বল্', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায দেখে যা আলোব নাচন' প্রভৃতি গান বিখ্যাত।

॥ দুই ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শাক্ত পদাবলী রচিত না হইবার কারণ

অত্যল্পকালের মধ্যে শাক্ত পদাবলীর এইরূপ মোহকর প্রভাব ও ব্যাপ্তি মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। ভাবিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ হেন গীত রচিত হয় নাই কেন? বাঙলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইযাছে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। সুদীর্ঘ আট শত বৎসরের মধ্যে এই ধরনের গান রচনা করা হয নাই, যাহা হইয়াছে তাহা নখাগ্রে গণনা করা সম্ভব, তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি রামপ্রসাদাদি রচিত সঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র। ইহার কারণ কি?

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রচার-বিমুখতা

বাঙলাভাষায় অজস্র বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেরণা ও কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি জয়দেব হইতে পদরচনার যে বিপুল প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাটদের আমলেও তাঁহাদের উৎসাহে, বৈষ্ণব পদরচনার আবেগ অব্যাহত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সেই ভবাগঙ্গায় আবার নূতন জোয়ার আসিল। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিয়া তিনি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনার নবীন প্রেরণা সঞ্চার করিযাছিলেন। মহাপ্রভুর 'রাধাভাব সুবলিত' মোহন মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা অলৌকিক জীবন মানুষের মনে সুদূর অতীতের বৃন্দাবনী স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাঙলাদেশ, নীলাচল, বৃন্দাবন—এক কথায় সমগ্র ভারতবর্ষ সে প্রেমপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পদাবলীও লেখা হইয়াছিল অসংখ্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে আসিয়াছেন 'দ্বিতীয় চৈতন্য' শ্রীনিবাস আচার্য্য, রসকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক নরোত্তম দাস ঠাকুর। সেদিনও মৃদঙ্গ-করতালের ঝঙ্কারে, উন্মাদ-নৃত্যে, খেতরীর মহামহোৎসবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদরচনার ধারা প্রবল গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এইরূপে পর পর অলৌকিক ব্যক্তি-মহিমার স্পর্শে বৈষ্ণব কবিগণ যুগে যুগে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে প্রচারের ফলে বৈষ্ণব পদাবলী ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে।

শাক্ত সাধনার পশ্চাতে যে এ হেন ব্যক্তি-মহিমার স্পর্শ পড়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু প্রচারের উগ্রতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। সেন রাজাদের সময় হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে রাজকীয় সমর্থন লাভ না করিলেও এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মত পণ্ডিত ও দার্শনিক, ব্রহ্মানন্দ-পূর্ণানন্দ স্বামীর মত বিদগ্ধ সাধক ও মেহারের সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মত সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাব জনসাধারণ্যে কম বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু প্রচারের উদ্দেশ্য না থাকার জন্যই শক্তি-সাধনার গূঢ় রহস্যকে তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারাও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার', ব্রহ্মানন্দ স্বামীর 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী', পূর্ণানন্দের 'শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি' বিখ্যাত তান্ত্রিক নিবন্ধ। কিন্তু গ্রন্থগুলি সম্প্রদায়বিশেষের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত।

শক্তি-সাধনার গোপ্য প্রকৃতি

তান্ত্রিক সাধন-সম্পর্কিত কাব্য বাঙলা ভাষায় রচিত না হইবার অন্যতম কারণ ইহার গোপ্য প্রকৃতি। বীরভাবের শক্তি-সাধনা অতি গুহ্য, একান্তভাবে গুরুমুখী। ইহার সাধন-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্বভাবদুর্ব্বল মানুষ বহুক্ষেত্রে ব্যভিচারের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই তন্ত্রাচার একদিন বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হওয়ায় আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও জঘন্য আসঙ্গলিপ্সার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে, দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে', শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' রূপকে তাহার ভয়াবহ চিত্র আছে।

এই জন্যই তন্ত্রের কঠিন নির্দ্দেশ ছিল, 'ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব' (কুলার্ণব তন্ত্র)। এই বিদ্যা কুলবধূর মত গোপনীয়। গুরুর উপদেশ লইয়া নির্জ্জনে এই বিদ্যার সাধনা করিতে হইবে, মন্ত্র-রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা চলিবে না। প্রকাশ করিলে মন্ত্রহানি ঘটিবে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে: 'প্রকাশান্মৃত্যুলাভঃ স্যাদপ্রকাশ্যং কদাচন' (নীলতন্ত্র)। এই কঠোর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কেহই গুহ্য সাধন-রহস্যের কথা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই; সংস্কৃতেও যখন প্রকাশ করিয়াছেন, তখনও সাধন-সার বীজমন্ত্র উদ্ধারের সঙ্কেতটি রহস্যে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাহা ছাড়া, তন্ত্র সাধন-শাস্ত্র, ইহা ক্রিয়ার নির্দ্দেশে পূর্ণ। ইহাতে মন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, পূজা ও জপের যে বিধান আছে, সেইগুলিই মুখ্য। সেগুলি জ্ঞানের বিষয়, ক্রিয়ার বিষয়, ভাবের বিষয় নয়, তাহা লইয়া কাব্য রচনা করাও দুরূহ। তন্ত্রের ধ্যান ও স্তোত্রাংশে কিছুটা কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ আছে এবং তাহা তেমন গোপনীয়ও নয়।

এইরূপ স্তোত্র লইয়া সংস্কৃতে অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের 'ঠাকুরাণীবন্দনা' অংশে এবং 'চৌতিশা' স্তবে তন্ত্রোক্ত ধ্যান-স্তোত্রের অনুকৃতি রহিয়াছে। কিন্তু তন্ত্রের সাধন-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া শাক্ত পদাবলীর পূর্ব্বে কোন কবিতা রচিত হয় নাই। শক্তি-সাধনার গোপ্য প্রকৃতির জন্যই, 'গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্' (মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র)।

তান্ত্রিক সাধন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

তান্ত্রিক সাধনার প্রতি জনসাধারণের ভয়াবহ ও ভ্রান্ত ধারণাও সাধন-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রেরণাকে ব্যাহত করিয়াছে। অপরিচয় ও অল্প পরিচয়ের সূত্রে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। অনেকেই ইহাকে মাত্র যাদুবিদ্যা বলিয়া মনে করে। কোন কোন আর্য্য গ্রন্থে বহুস্থলে এই গুহ্য সাধনার প্রতি বক্র কটাক্ষ দেখা যায়। কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি বৈ'। পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড) ভগবান মহাদেবকে বলিয়াছেন, 'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তুঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।' এই সকল প্রচারের ফলে অস্পষ্ট ধারণা কোন কোন স্থলে বিরূপ মনোভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙলা দেশ শক্তি সাধনার পীঠভূমি হইলেও, কান্যকুব্জাগত বেদাচারী ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে এই মনোভাব এদেশেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহারা শক্তি-সাধনাকে বেদাচারসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই ধরনের পূজাই (পশুভাবের পূজা) প্রচলিত হইয়াছিল।

সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার রাজ-সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। তাঁহারা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু তন্ত্রাচারের প্রতি সমর্থন থাকিলেও তাঁহাদের সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই প্রাধান্য সূচিত হয় এবং রাজসভা, মন্দির, গৃহাঙ্গন বৈষ্ণব গীতির ললিত ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া উঠে, শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্' এক মোহময় আবেশ সঞ্চার করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মই কিছু দিনের জন্য দেশের মধ্যে বিপুল প্রেরণা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। সর্ব্ব মত খণ্ড খণ্ড করিয়া 'সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে' (চৈঃ চঃ)। তাহার ফলে অনেক শক্তি-সাধক এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস পূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রভাবে মহামায়ার উপাসক গোবিন্দদাস কবিরাজও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অতিপ্রচারে এবং শাক্তধর্ম্ম সম্পর্কে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবে

এই সময় শক্তি-সাধনা গুপ্ত পথে থাকিয়া চক্র-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। শক্তি-সাধনার রহস্যময় প্রকৃতি নিজেদের চারিদিকে আবরণ সৃষ্টি করায়, অবৈষ্ণব জনের নিকটও ইহা অহেতুক ভয় ও বিস্ময়ের কারণ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে ইহা তো নিন্দনীয় ছিলই।

বৈষ্ণবদের নিকট শাক্তের বামাচার সাধনা যে কিরূপ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল চাপাল গোপাল ও শ্রীবাসের কাহিনীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চাপাল গোপাল শ্রীবাসকে অপদস্থ করিবার জন্য

ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাতের উপর থুইল ওড় ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ১৭)

পরদিন নিজ গৃহদ্বারে শক্তিপূজার এই সব উপকরণ দেখিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইয়া এমন ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যেন ভবানী পূজা করা এক মহা অপরাধ! উপরন্তু, শ্রীবাস তখন,

হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল।
গঙ্গাজল গোময়ে সেই স্থান লেপাইল॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ১৭)

অবৈষ্ণব জনের মধ্যেও তন্ত্রাচার সম্পর্কে একটা বিস্ময়কর, ভয়াবহ ধারণা ছিল। মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে সারারাত্রি ভরিয়া কীর্ত্তন করিতেন তখন,

শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্‌গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে॥ (চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ৭)

এই সকল কারণেই শক্তি-সাধনার গূঢ়তত্ত্ব লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত কোন কাব্য বা গান রচিত হয় নাই। শাক্ত সাধনার রহস্যময় গোপনীয় প্রকৃতি, তন্ত্রমন্ত্রের কথা ভাষায় প্রকাশ করিবার অনিচ্ছা, অন্যধর্ম্মাবলম্বীর বিরূপ মনোভাব এবং অপরিচয় হেতু এই গুহ্য সাধনার প্রতি জনসাধারণের ভ্রান্ত ও ভয়াবহ ধারণাই প্রকৃতপক্ষে সাধনতত্ত্ব লইয়া শাক্ত-সঙ্গীত রচনায় প্রেরণাকে বিলম্বিত করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকে শাক্তগীতির সমৃদ্ধির কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি, শক্তিপূজা ও শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত রচনার যাবতীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

শাক্ত সঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে—সর্ব্বত্রই যেন একটি ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, একটি অভিযোগের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, পাল আমল হইতেই বাঙলাদেশ একটি নিস্তরঙ্গ, শান্ত, কৃষি-নির্ভর জীবনে পরিণত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল নির্ঝঞ্ঝাট, ধর্ম্মকেন্দ্রিক এবং বিক্ষোভহীন। রাজনৈতিক অনেক পরিবর্ত্তন এই দেশে দেখা দিয়াছে, সাময়িক ভাবে শান্ত জীবন বিপর্য্যস্তও হইয়াছে—কিন্তু তাহার ফলে জন-জীবনে বা কৃষক ও কারিগরে পূর্ণ বাঙলার গ্রাম্যজীবনে তেমন কোন বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হয় নাই। এই জন্যই এই দেশের সাহিত্যও বৈচিত্র্যহীন হইয়া থাকিয়াছে। শাক্ত গীতাবলীর বিষয়বস্তুতে তেমন কোন লক্ষণীয় বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ইহাতে যে ক্রন্দন-অভিযোগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে যে নিস্তরঙ্গ, শান্ত পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে একটি বিরাট আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয় এবং মনে হয়, শাক্ত পদাবলী রচনার পশ্চাতে এই সংঘাত প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

তখন দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে সুদৃঢ় মোগল শাসনের ভিত্তি ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে; সেই সুযোগে বাদশাহের নামমাত্র 'সনন্দ' লইয়া অকর্ম্মণ্য উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী নবাব এদেশের সিংহাসনে বসিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র অত্যাচার, অবিচার। যুগটিই 'মসিল দিয়ে তসিল' করার যুগ। নবাব জমিদারের উপর চাপ দিতেছেন, রাজস্ব আদায় না হইলে 'বৈকুণ্ঠবাসে'র ব্যবস্থা করিতেছেন। নানা উপায়ে রাজকর বৃদ্ধি করা হইতেছে, জমার উপর বাজে জমার অন্ত নাই। মুর্শিদকুলী খাঁ যে বাজে জমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সুজা খাঁর আমলে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। "তিনি 'নজরানা মোকররি', 'জার মাথট', 'মাথট ফিলখান' এবং 'আবওয়াব ফৌজদারী' নামে অনেকগুলি নূতন বাজে জমা বসাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর শাসন-সূচনাতে হীরাঝিলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সিরাজদ্দৌলা কৌশলক্রমে যে নজরানা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে 'নজরানা মনসুরগঞ্জ' নামে বার্ষিক জমায় পরিণত হয়। আলিবর্দ্দী প্রবর্ত্তিত 'চৌথ মারহাট্টা' নামে আরও একটি বাজে জমা বসিয়াছিল।"[১]

এইরূপ জমার উপর জমায় রাজা-জমিদার পর্য্যুদস্ত, রাজা-জমিদারের প্রজাগণও বিপন্ন। খাজনা না দিতে পারিলে তাহাদের সম্পত্তি নিলামে উঠে, দীর্ঘ মেয়াদের

১। সিরাজদ্দৌলা (৪র্থ পরি:)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

কয়েদে তাহাদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সর্ব্বত্রই জুলুম, কয়েদ, নিলামের হিড়িক। ঐতিহাসিক বলেন, 'Everebody and everything was on sale।"[১]

ইহার উপরে মগ ও ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীস দস্যুদের অত্যাচার। বাঙলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল সুন্দরবন তাহাদের অত্যাচারে ও দস্যুতায় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল: The Mugs of those days were the desolators of the Sundarbans; they, an alliance of the Portugeese, helped to reduce the now waste Sundarbans to a jungle though once fertile, populous country. (Rev. Long)

এই অত্যাচারের মধ্যে দেখা দিল কুখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা। "The Maratha Government lived by and for plunder". (V. A. Smith) রাজস্বের চতুর্থ ভাগ 'চৌথ' আদায়ের জন্য এই মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দস্যু পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিয়া বাঙালীর জীবনে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে লুটপাট প্রবল আকার ধারণ করিল, তাহাতে ছোট বড ভেদ নাই:

বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগীর তরে রসদ না মিলএ॥
কলার আইঠা যত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিষম বিপত্ত্য বড বিপরীত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল॥[২]

এই হাঙ্গামায় কাহারও নিস্তার ছিল না। নবাব, রাজা, মহারাজ, মুদি, বেনে, গ্রামবাসী সকলেরই সমান অবস্থা। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন:

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥[৩]

রাষ্ট্রীয় এই অব্যবস্থার যুগে, অত্যাচার, হাঙ্গামা ও অবিচারের এই সঙ্কটকালে প্রত্যেকটি লোক, এমন একটি বরাভয়দায়ী আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন, যাহা তাহাদিগকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে সে আশ্রয় নাই, কারণ

১। The Oxford History of India—Vincent A. Smith (British Period, chap. 2)
২। মহারাষ্ট্রপুরাণ—গঙ্গারাম ৩। অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থ-সূচনা

এ ধর্ম্ম শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, নরক-মুর-বিনাশন ঐশ্বর্য্যের প্রতীক, সর্ব্বশক্তির আধার কৃষ্ণের শরণ না লইয়া, প্রেমঘন, তারুণ্য ও কারুণ্যামৃত ধারায় অভিষিক্ত মহামাধুরীর ভজনা করিয়াছে। মহাপ্রভুর সময়ে সে ভজনাতেও বলিষ্ঠতা ছিল; কীর্ত্তনের হুঙ্কারে-গর্জ্জনে অত্যাচারী কাজী তটস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই বলিষ্ঠ প্রেমধর্ম্মের প্রাণ-প্রাচুর্য্য ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল, ছিল দুর্ব্বল আবেগ আর ভাবালুতা। উপরন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম গুরুবাদ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ায় 'গুরুপ্রসাদী'র ব্যভিচার দেখিয়াও জন-সমাজ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশুদ্ধ কান্তাপ্রেমের অসামাজিক পরিণাম, এবং দুর্ব্বল আবেগ-প্রবণতায় মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছিল না।

জনগণ তখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল এমন একটি প্রেমাশ্রয়ের জন্য, যেখানে প্রেম আছে, ব্যভিচার নাই; ব্যভিচারের সম্ভাবনাও নাই। অথচ তাহাতে অত্যাচারের প্রাবল্য হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, পরম নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করা চলে। এই আশ্রয় শক্তির ব্যূহ, অনন্ত করুণাময়ী, 'কালভয়হারিণী' জগজ্জননীর চরণ। রাজশক্তি যেখানে অব্যবস্থিত, রাজ্য যেখানে দুর্ব্বল, রাজসভা যেখানে বিচারমূঢ়, সেখানে সর্ব্বাশ্রয়াশ্রয় মাতৃচরণই একমাত্র ভরসা, মায়ের এজলাস অভিযোগ জানাইবার উপযুক্ত স্থান। তাই সন্তান সহস্র অভিযোগ লইয়া মায়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নালিশ জানাইয়াছিলেন :—

(১) কোন্ অবিচারে আমার পরে
করলে দুঃখের ডিক্রিজারী? (রামপ্রসাদ)

(২) কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল। (নীলাম্বর মুখো)

(৩) আমি ওই খেদে খেদ করি—
ওই যে মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি। (রামপ্রসাদ)

অবশ্য অত্যাচারের প্রাবল্যে মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ করিবার আকূতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'পশুগণের গোহারি' তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন ভূস্বামী—চাঁদ রায়, কেদার রায়, যশোররাজ প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি শক্তির উপাসক ছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনীভূত হওয়ায় শক্তির উজ্জীবন এ যুগে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় বা পার্থিব ঋদ্ধির কামনায় মঙ্গলকাব্য-গুলির মধ্যে শক্তির চরণে শরণ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও, মঙ্গলকাব্যাদির দেব-আদর্শ কোনক্রমেই উন্নত ধরণের ছিল না। হর-গৌরীর জীবনকে অতি সাধারণ পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়া কবিগণ বস্তুতঃ ভক্তিরসের পরিবর্ত্তে 'অনুকম্পা রসে'র (?)

সৃষ্টি করিতেছিলেন। সেখানে দেবী 'কোপনচণ্ডী,' ঈর্ষ্যাদ্বেষের অধীন। ভক্তের নিকট পূজা আদায় করিবার ছলে তিনি যে-কোন হীন কর্ম্ম করিতে পারেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' রূপ ধারণ করা সত্ত্বেও কালকেতু ও ফুল্লরাব মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন নাই। শিবায়ন কাব্যে দেবী একেবারে অতি সাধারণ বাঙালী রমণীর মত সামান্য শাঁখার জন্য স্বামীর সহিত কোন্দল করিয়াছেন। কোঁচনীর বেশে মহাদেবকে ছলনার ইঙ্গিতটিও সুস্থ নয়। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যা-সুন্দর কাব্যে দেবী 'কালের কামিনী', অবৈধ কামনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য তিনি উপর হইতে ভক্তকে 'সিঁদকাঠি' ফেলিয়া দিয়াছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা ও চণ্ডী উভয়ের আদর্শই অনুন্নত। 'মঙ্গলকাব্যে'র দেবী অপ্রতিষ্ঠিত. পুরাণ ও তন্ত্রের রুদ্র-সুন্দর মহিমান্বিত করুণাময়ী অথচ দৈত্যদলনীর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায়, যাঁহারা শক্তিব্যূহে আশ্রয় লইতেছিলেন, তাঁহারাও শক্তি-সাধনার সমুন্নত আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রাজ-রাজড়ার মধ্যে অনেকেই শক্তিপূজার রাজসিক আয়োজন ও পঞ্চম-কার তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মোগলশাসনের অস্তংগমনকালে বিকৃত বাদশাহী মেজাজ ও চালচলন অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা দিল্লীর নাগরসুলভ নগ্ন লালসা, প্রাণ-হীন আড়ম্বর, কৃত্রিমতা ও রুচিবিগর্হিত দেহসম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মও এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। প্রতিমার সাজসজ্জা, ঝাড়লণ্ঠন রোশনায়ের সমারোহ, বাহ্যপূজার উপচারবাহুল্য, অশ্লীল নৃত্যগীত—এইগুলি ছিল পূজার মুখ্য উপকরণ।

এই পরিস্থিতির মধ্যে শক্তির সাধকবৃন্দ স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। জনগণের অসহায় অবস্থা, দেবীচরিত্রের দুর্গতি এবং মাতৃ-আরাধনার এই বিকৃত আদর্শ তান্ত্রিক যোগীর তপোভঙ্গ করিল। নিবাতনিষ্কম্প দেহে অনুকম্পার আবেশ সঞ্চারিত হইল; স্বকীয় গোপ্য প্রকৃতি বিসর্জ্জন দিয়া প্রবর্ত্ত সাধকের মত তাঁহারা সংসারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শত সহস্র নিপীড়িত মানবের অভিযোগ তাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, কেন এই অবিচার, কেন এই দুঃখ?

শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যের হীনতা ও দীনতা হইতে মুক্ত করিয়া, পুরাণ ও তন্ত্রের অলৌকিক মহিমাদ্বারা তাঁহারা জগজ্জননীর রূপমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জননী প্রতিষ্ঠালোভী, ঈর্ষ্যাকাতর কোপনচণ্ডী নহেন, তিনি মহামহিমান্বিতা জননী, তিনি মহিষাসুরমর্দ্দিনী অথচ বরাভয়ধারিণী, তিনি করুণারূপিণী, অনন্ত স্নেহময়ী! তাই তাঁহারা গাহিলেন:

উমা আমার সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয়, তা নয়।···
ওহে, কারো চতুর্মুখ, কারো পঞ্চমুখ
উমা তাদের মস্তকে রয়। (রামপ্রসাদ)

মাতৃপূজার সর্ব্বোত্তম আদর্শও তাঁহারা দেখাইলেন। মাতৃপূজা জাঁকজমকের পূজা নয়, ভাবের পূজা, ভক্তির পূজা: 'ঢাকের বাজনায়, ডাকের গয়নায়' তিনি তুষ্ট হন না, কপটভক্তির ছল তিনি ধরিতে পারেন। মাতৃ-আরাধনার যে মহান আদর্শ, যে অতি-সুন্দর দিব্যভাব তন্ত্রশাস্ত্রে গোপন ছিল, শক্তিসাধক কবিগণ তাহাকেও প্রকাশ করিলেন। অতি গোপনীয় 'কুণ্ডলিনী যোগ' গোপন রহিল না। শাক্ত পদাবলীর পদে পদে এই উন্নত তান্ত্রিক যোগের নির্দেশ রহিয়াছে।

ধর্ম্মাচরণে ভেদবুদ্ধি আরোপ করিয়া মানুষ দ্বেষাদ্বেষি করিতেছিল। সাধক তাহারও অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন। এ দেশের সংস্কৃতিতে বহুকাল হইতে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল। এই শতাব্দীর অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে শাক্তসঙ্গীতগুলির মধ্যে সেই সমন্বয়ের বাণী উদ্ঘোষিত হইল। সাধকগণ যেমন একদিকে শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর বিষ্ণুভক্তদিগের একত্ব প্রতিপাদন করিলেন, তেমনই আবার হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গীদের উদ্দেশ্য করিয়াও গাহিলেন, 'সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।'

আঠারো শতকের রাজনীতিক পরিবেশে জনজীবনে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত ও বেদনা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জয় করিবার কৌশলও সাধকগণ মানুষকে শিখাইতে লাগিলেন। মাতৃচরণে শরণাগতি, মায়ের চরণে অনন্ত নির্ভরতাই দুঃখ জয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কালীনামের কেল্লায় যে বসবাস করে তাহার দুঃখ কি, ভয় কি! তিনিই তো নির্ভয়ে বলিতে পারেন, 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?' অবশ্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই শক্তিসাধনার চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে মনকে অন্তর্মুখী করিতে হয়। মনকে অন্তর্মুখী করিতে পারিলে যে-কোন দুঃখকে জয় করা সম্ভব। তান্ত্রিক যোগ ইহার উপায়। শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে বহুস্থলে সেই অতি গূঢ় যোগের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু এই যোগ নীরস যোগ-সাধনা মাত্র নয়, ইহা মাতৃমহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবের ভিত্তির উপর এই যোগ। মায়ের সহিত ভাব করিয়া, মায়ের প্রতি মন রাখিয়া, মা-কেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া এই যোগ সাধন করিতে হয়। সেই মা বাহিরে নাই, আছেন ভিতরে, আছেন এই দেহের মধ্যেই। চঞ্চল মনকে মাতৃভাবে ভাবিত করিয়া

দেহ-চক্রে কেন্দ্রীভূত করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সাধনার মধ্যে একদিকে যেমন দুঃখজয়ের ইঙ্গিত বর্তমান ছিল, তেমনই আবার ইহার মধ্যে বাঙালীর চিরকালের ভাবসাধনাও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

শাক্ত সঙ্গীতগুলির অসাধারণ সমৃদ্ধির কারণ গীতিকবিতারূপে ইহাদের প্রতিষ্ঠা। শাক্ত-পদাবলী গীতিকবিতা। গীতিকবিতার ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবের অঙ্কুর এই বিশিষ্ট সাধন-প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। কবি যখন বহির্বিশ্ব হইতে মনকে গুটাইয়া আত্ম-সমাহিত হন, তখনই গীতিকবিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা অত্যাচার ও আড়ম্বর হইতে মাতৃচরণে শরণ লইবার আকাঙ্ক্ষায়, ভক্তজনের অন্তর্মুখী হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই অন্তর্মুখিনতা জগৎ-পলাতকার মনোবৃত্তি বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ শক্তিসাধনার মধ্যে সংসারত্যাগের কথা নাই; তাঁহাদের নিকট 'ন গৃহং বন্ধনাগারম্'—গৃহ বন্ধনাগার নয়। শক্তিসাধক প্রায় সকলেই গৃহী। দেহস্থ শক্তিকে সঙ্কর্ষণ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শাক্তসাধনার উদ্দেশ্য। অতএব পলায়নের মনোবৃত্তিতে নয়, দুঃখকে জয় করিবার মত শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই সাধককে আত্মস্থ হইতে হয়। এই অবস্থাতেই স্মরণীয় স্মৃতির রোমন্থনের সুযোগ ঘটে। তাহাই কবিতার বীজ। (তুলনীয়, **'Emotion recollected in tranquillity'**). শাক্ত পদাবলীর মন্ময় কবিতাগুলি এই অবস্থার সৃষ্টি। তাই জন-জীবনের বিচিত্র দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতিই অতি গোপনীয় শক্তি সাধনার সঙ্কেত-সূচক শাক্তপদাবলী রচনার উৎসমুখটি অনর্গলিত করিয়া দিয়াছে। যেহেতু ইহাদের রচয়িতা ও শ্রোতা উভয়ই নিষ্পেষিত বাঙালী সমাজ, সেইজন্য বাঙলা ভাষাতেই গানগুলি রচিত হইয়াছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারের পেষণতলে তন্ত্রের বাধানিষেধ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে 'সকনিরুক্তি' হইয়াছে ভাবপ্রকাশের নিরুক্তি, কুলবধূর মত গোপ্য গুহ্যসাধন হইয়াছে ইহাদের বর্ণনীয় বিষয়। দুঃখের অভিঘাত হইতে ইহাদের জন্ম, সামাজিক চেতনা ইহাদের অবলম্বন; কালীনামে ইহাদের প্রতিষ্ঠা, মন্ময়সঙ্গীতে ইহাদের প্রকাশ। যুগের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মগত প্রেরণাই শাক্তসঙ্গীতের মূল প্রেরণা। এইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাদের এত সমৃদ্ধি।

॥ তিন ॥

শক্তিপূজার ইতিহাস ও ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবাদের প্রভাব।

শক্তিবাদে বিমিশ্র উপাদান

শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি আধুনিক কালে রচিত হইলেও, যে শক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া এগুলি গীতমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্ত্তমানের মাতৃরূপ, তাঁহার তত্ত্ব ও উপাসনার মধ্যে অনেক যুগের অনেক সংস্কার আসিয়া মিলিত হইয়াছে: 'There is no doubt that this Goddess and her cult do unite traits of very different deities, Aryan as well as Non-Aryan.'[১]

শক্তিদেবী ও তাঁহার উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে একদিকে আছে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতা ও ভাবুকতা, অন্যদিকে আছে তামসিক আচারের প্রাবল্য; দেবী একদিকে কৃষ্ণবর্ণা, নগ্নিকা, ভয়ঙ্করী, অন্যদিকে বরাভয়দায়িনী; উপাসনার একদিকে বিশুদ্ধ যোগ, অন্যদিকে পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে যে আর্য্য ও ভারতের আদিমতম জাতির প্রভাব একাধারে সংহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবতাকে মাতৃরূপে কল্পনা করিবার পশ্চাতেও আদিমতম জাতির মনোভাবটি সুস্পষ্ট।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও অনেক কালের প্রাচীন কাহিনী ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। শাক্ত পদকর্ত্তা যখন গান করেন,

> পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী,
> কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো। (রামপ্রসাদ)

অথবা,—

> তোমায় ধরা সে তো বিষম দায়।…
> ধরেছিল ব্যাধের ছেলে কালকেতু তোমায়।…
> তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি যত্নে যত্ন কোরে
> পূজা কোরে সংবংশেতে যায়। (নীলমণি পাটনী)

১ A Hist. of Indian Lit. Vol. 1—Winternitz.

—তখন মনে হয়, পাতালের ভদ্রকালী, ব্যাধের ছেলে কালকেতুর মাতৃপূজা, রাক্ষস রাবণ রাজার মাতৃ-আরাধনা প্রভৃতি পৌরাণিক সংস্কার মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের অনুসরণ করিলে ধরা পড়ে, ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন জাতিগুলির মাতৃ-উপাসনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে।

এ দেশে মাতৃ-আরাধনার প্রথাটি অনাদি কালের। বেদে তন্ত্রে দর্শনে পুরাণে একাধিকস্থলে বলা হইয়াছে, দেবীই 'প্রথমা' 'আদ্যা' 'নিত্যা'; শাক্ত পদাবলীতে আছে, তিনি 'আদিভূতা সনাতনী'। উক্তিগুলি কেবল তত্ত্বগত নয়। যাঁহারা ভূবিদ্যা, নৃবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরিয়া সত্যকে উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, 'From time immemorial India is the home of the worship of Prakriti or later Sakti.'[১]

ভারতের আদিমতম জাতিরাই মাতৃ-দেবতার প্রথম উপাসক

এই প্রকৃতির প্রথম উপাসক কাহারা? ভারতীয় সংস্কৃতিতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় পাওয়া যায়: 'দৈব আসুর এব চ', 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব'। একটি দৈব বা বৈদিক, অপরটি আসুর বা তান্ত্রিক, একটি পুরুষ-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান। আর্য্যসমাজ পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাঁহাদের প্রধান দেবতা পুরুষ। অতএব অপর ধারাটি আর্য্য ভিন্ন অন্য জাতির। এই জাতি আর্য্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; আর্য্যসমাজের নিকট ইঁহারা চিরকাল নিন্দিত হইয়া আসিয়াছেন। বেদে ইঁহাদিগকে বলা হইয়াছে অসুর, দস্যু; ইঁহারা 'অনাসা' (noseless 'শিশ্নদেবা' (worshipper of phallic emblems), 'অযজ্ঞ' (never performed sacrifices) এবং 'অন্যব্রতা' (follower of strange laws); ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহাদিগকে বলা হইয়াছে বয়াংসি, অন্ত্যজ। ইঁহারাই মহাকাব্য-পুরাণের রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নিষাদ, কিরাত। ইতিহাসে ইঁহারা শবর, পুলিন্দ বা আদিবাসী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক বা তান্ত্রিক ধারাটি এই আর্য্যেতর জাতির ধারা। মাতৃপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক ইঁহারাই। ইঁহাদের সমাজ মাতৃকেন্দ্রিক (Matriarchal), তাই ইঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, উৎসব মাতৃভাবে পূর্ণ। ধর্ম্মও মাতৃ-প্রধান। মাতৃভাবাসক্ত বলিয়াই সেই আদিযুগে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, যখন ইহারা প্রথম ধর্ম্মের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

১ Hist, of Ancient India—R. S. Tripathi.

মাতৃকাদেবী; সৃষ্টির মূলে পালনীশক্তিরূপে, ধ্বংস ও ভীতির অধিকর্ত্রীরূপে, সমাজের নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে জননী বা মাতৃদেবতাই ছিলেন প্রথমা ও প্রধান।

ইতিহাস হইতেও এই সত্য সুস্পষ্ট হয়। আর্য্য-ভিন্ন অপর জাতি হিসাবে ইতিহাসে (১) নিগ্রোবটু" (২) অস্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় ও (৪) মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীন (Tibetan Chinese) জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

অস্ট্রিক

নিগ্রোবটু জাতির তেমন কোন চিহ্নই আজ আর নাই; সম্ভবতঃ এই জাতি অস্ট্রিক জাতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল রূপে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী আজিও বর্ত্তমান। ইঁহারা মাতৃ-উপাসক। পর্ব্বতে অরণ্যে ইহাদের বাস, জীবিকা শিকার ও কৃষিকার্য্য। সম্ভবতঃ দেবীর 'শাকম্ভরী', 'সীতা' ('কর্ষকাণাং চ সীতেতি'—হরিবংশ), 'বনদুর্গা' নামগুলি অবণ্যচারী, কৃষিজীবী অস্ট্রিক জাতি হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়

আর্য্যপূর্ব্ব জাতিদের মধ্যে শিক্ষায়-দীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত ছিলেন দ্রাবিড় জাতি। একদিন সমগ্র ভারতবর্ষে তাহাদের একাধিপত্য ছিল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত বেলুচিস্থান (ব্রাহুই) হইতে উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্ত বঙ্গদেশ-আসাম পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, এমন কি সিংহল পর্য্যন্ত ইঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার কীর্ত্তি এই দ্রাবিড় জাতির।

মার্শাল সাহেব ও ফাদার হেরাশ এবং অন্যান্য সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার স্রষ্টারা ছিলেন মাতৃ-উপাসক। ইঁহাদের মধ্যে উন্নত ধরণের যোগসাধনা (দ্রষ্টব্য পশুপতি শিবের চিত্র) এবং মাতৃ-উপাসনা (দ্রষ্টব্য গৌরীপট্ট) প্রচলিত ছিল। 'মৃতের স্তূপ' মহেঞ্জোদারো হইতে এই যে জীবন্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয়, এদেশের মাতৃ-উপাসনার উৎস অতি প্রাচীন: **"The clay figures and phallic beatylic stones suggest that Durga and Shiva worship was of a very much greater antiquity in India, than has hitherto been supposed".**[১]

১। Donald A. Mackenzie (Preface to Pre-historic Ancient & Hindu India)

মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীন জাতি

মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীন জাতিও মাতৃভাবাসক্ত। অবাচীন মোঙ্গল জাতির আদি জননী এক বিধবা নারী: 'The soberest story on record that their anscestor Budantsar was miraculously conceived of a Mongol widow.' (Encyclo Britannica), অতএব ইহঁরাও মাতৃ-উপাসক।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইঁহারা চীন ও তিব্বতীয়দের সংস্কার লইয়া, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ধরিয়া, অরণ্য-সঙ্কুল গিরিপথে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। আসামের পার্ব্বত্য জাতি, কোঁচ, কিরান্তী, নাগা, গারো এই মোঙ্গল জাতি-সম্ভূত, প্রাচীন সাহিত্যে ইহারা নাগ, কিরাত নামে অভিহিত হইয়াছেন, V A Smith মনে করেন, বৈশালীর বৃজি-লিচ্ছবি বংশে মোঙ্গলীয় প্রভাব বর্ত্তমান।

বাঙলাদেশে দ্রাবিড় জাতির সহিত এই মোঙ্গল জাতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বাঙালীকে কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, 'Mongolo Dravidian'[১] এ দেশের মাতৃসাধনার ইতিহাসে মোঙ্গলীয়দের প্রভাব অপরিসীম। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙলার মঙ্গলচণ্ডী মোঙ্গলজাতির উপাস্য দেবতা। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের মতে, হিন্দুতন্ত্রের 'তারা' বৌদ্ধ 'মহাচীনতারা' হইতে অভিন্ন, ইঁহার পূজা চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। শক্তিপূজার প্রধান ফুল জবাফুল, ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় China rose, হইতে পারে, বাঁধুলও চীন হইতে আগত। তিব্বতীয় লামাগণ শক্তির প্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির উপাসক. হিন্দুতন্ত্রের 'ডাকিনী' লামাদের দেবতা হইতে পারেন, কারণ তিব্বতে জ্ঞানী অর্থে 'ডাক' শব্দটির প্রচলন আছে। 'ডাকিনী' ইহার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ।

ফল কথা, মাতৃ উপাসনার প্রবর্ত্তক ও কল্পনাকারী যে আর্য্যেতর মাতৃতান্ত্রিক জাতি, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। আর্য্যগ্রন্থেও বহুস্থলে দেবীকে পুলিন্দ, শবর, কিরাত ... দের উপাস্য দেবতা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে:

> পর্ব্বতাগ্রেযু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
> বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ ॥
> শবরৈর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
> ময়ুরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বশঃ ॥[২]

১। Cambridge Hist. of India, Vol 1. ২। খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়

এই আদিম জাতিব মধ্য হইতেই মাতৃ-উপাসনার ধারা উৎসারিত হইয়া, যুগে যুগে অন্যান্য প্রত্যেকটি ধর্ম্মের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আসুব বা লৌকিক বলিয়া ইহার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও, এই সাধনার মোহকর আকর্ষণ হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারেন নাই। আর্য্যধর্ম্মে ও সাহিত্যে, বৌদ্ধতন্ত্রে, বৈষ্ণব সাধনায় এবং বাঙলা সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখায় শক্তিপূজার প্রভাব বর্ত্তমান। তবে কোথাও ইহা উন্নীত হইয়াছে, কোথায়ও আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছে, কোথায়ও বা সমীভবনের ফলে মাতৃ-উপাসনা নব রূপান্তব লাভ কবিযাছে। এই উন্নযন, অবনমন ও রূপান্তরের মধ্যেই শক্তিসাধনার বিবর্ত্তনের সূত্র বিধৃত।

আর্য্য সাহিত্যে মাতৃভাবেব প্রসার

আর্য্য সমাজ ছিল পুরুষ-কেন্দ্রিক। আর্য্যধর্ম্মে পুরুষেবই প্রাধান্য। ঋগ্বেদের দেবতাগণের মধ্যে প্রধান—ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, অগ্নি। ইঁহাবা পুরুষ, এক একজনে অসাম শক্তিধর। ইহাদের তুলনায় স্ত্রীদেবতা একান্ত নিষ্প্রভ। পুরুষের স্ত্রী, দয়িতা এবং কন্যারূপে তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠা। সবস্বতীকে যদিও 'অম্বিতমে' 'দেবীতমে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তথাপি তিনি সবস্বান্ নদীব পত্নী, দেব-নদী-বিশেষ। পৃথিবীমাতা দৌস্পিতাব ছাযামাত্র। বাত্রি ও ঊষা 'দুহিতর্দিবঃ অর্থাৎ দৌস্পিতার কন্যা; তাঁহাবা দুই ভগ্নী, দুই দিব্যযোষা; ঊষা সূর্য্যেব দয়িতা, আব বাত্রি বরুণের প্রিয়া।

কিন্তু আর্য্যেতর জাতির মাতৃদেবী 'পার্ব্বতী', স্বামী শিবের কেবল ছায়া নহেন, তিনি স্বতন্ত্র। আদিমতম জাতিগণ সৃষ্টির মূলানুসন্ধান কবিতে গিয়া যে দুইটি জনন-যন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করিযাছিলেন, তাহাদের কোনটিকেই তাঁহাবা তুচ্ছ বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সৃষ্টি-ক্রিয়ায় উভয়েরই সমান প্রাধান্য। উপরন্তু জনয়িত্রী ও পালয়িত্রী শক্তিরূপে জননীবই শ্রেষ্ঠত্ব। তাই তাঁহাদেব দৃষ্টিতে জননীই প্রধান ও প্রথমা। পরবর্ত্তী আর্য্য সাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখা যায়।

দেবীসূক্ত

পুরুষ-প্রধান বৈদিক সাহিত্যেও কোন কোন স্থলে মাতৃকা দেবী অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিদের মধ্যে ছিল অদ্ভুত কবিত্বশক্তি। তাঁহাদের দার্শনিকতাও অসাধারণ। এই কবিত্বে ও দার্শনিকতায় মণ্ডিত হইয়া ঋগ্বেদেরই শেষাংশে (দশম মণ্ডলে) মাতৃকাশক্তি 'আদিশক্তির্দেবতা'রূপে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছেন। অম্ভৃণ-ঋষি-কন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাক্ পরমকারণকে মাতৃশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন,

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ (ঋগ্বেদ, ১০।১০।১২৫)

—একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণরূপে আমিই নিখিল বিশ্বে পরিভ্রমণ করি; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। ইহাই প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের প্রথমাংশ। এই সূক্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'রাষ্ট্রী'—রাষ্ট্রশক্তি, তিনিই 'চিকিতুষী'—সর্ব্বদর্শিনী; তিনিই 'সংগমনী বসুনাং' সম্পদসমূহের জনয়িত্রী, তিনিই 'প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্'—যজ্ঞোদ্দিষ্ট দেবতাগণের মধ্যে প্রথমা। দ্যাবা পৃথিবীতে তিনিই অনুপ্রবিষ্ট, তিনিই দ্যুলোকের প্রসূতি; তিনিই আবার 'পরো দিবা পর এনা পৃথিবী'—আকাশ ও পৃথিবীর অতীত হইয়া 'এতাবতী মহিনা সংবভূব'—স্বীয় মহিমায় জগদ্রূপ ধারণ করিয়া আছেন।

বস্তুতঃ আর্য্যেতর জাতির মাতৃকাদেবী এই সূক্তেই সর্ব্বপ্রথম লিখিতভাবে আত্ম-দর্শন সুলভ ব্যক্তাব্যক্ত সূক্ষ্মতায় অভিষিক্ত হইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মের মত দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে তিনি একই আধারে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক: তান্ত্রিক শক্তি-সিদ্ধান্তের ইহাই প্রথম লিখিত প্রকাশ।

রাত্রিসূক্ত

শক্তিদেবীর এইরূপ মহিমা বেদের অন্যত্রও দুর্লভ নয়। বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীমন্ত্রে ইনিই সপ্তলোকচারী সবিতাদেবের বরণীয় দ্যুতি, বুদ্ধির নিয়ন্ত্রী শক্তি। একটি সামসূক্তে ময়ূরপুচ্ছভূষণা, পাশহস্তা কিরাতী বা শবরী 'রাত্রি' দেবীরূপে স্তুতি লাভ করিয়াছেন: এখানে তিনি প্রাণিগণের সুখবিধাত্রী এবং সমস্ত কৌমারী শক্তির সমষ্টিরূপে কল্পিতা হইয়াছেন:

ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্।

সামবেদের এই রাত্রিসূক্ত এবং ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত চণ্ডীপাঠের সময় পাঠ করার রীতি আছে। ঋগ্বেদেও একটি রাত্রিসূক্ত আছে। এই সূক্তে রাত্রির যে রূপময়ী অভয়দাত্রী মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা 'কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি' রূপা মহাকালীর রুদ্র-সুন্দর রূপপ্রতিমা।

অথর্ব্ববেদে শক্তিসাধনার কথা

বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে অথর্ব্ববেদেই শক্তিবাদের প্রভাব বেশী। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদকেই শক্তিপূজার মূল উৎস বলিয়া মনে করেন। এই বেদে শক্তি-উপাসনার মূলতত্ত্ব, শক্তিপূজার অভিচারাদি ক্রিয়া, শাক্তাচারসম্মত দীক্ষা, বিবাহ, মৃতের সংকার, যজ্ঞ এবং অদ্ভুত ভৌতিক ও ইন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের জগৎ যেন অথর্ব্ববেদের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ঋগ্বেদে কবিত্ব ও কল্পনা, অথর্ব্ববেদে সাধনক্রিয়া; ঋগ্বেদে পার্থিব ঋদ্ধির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা, আর অথর্ব্ববেদে যাদুবিদ্যার সাধনা। অথর্ব্ববেদে অপ্রাকৃত দানবীয় শক্তির প্রতি স্তুতি; ইহা পিশাচ ও রাক্ষসের উপদ্রবকে শান্ত করিবার নানাপ্রকার মন্ত্রে পরিপূর্ণ। এক কথায় শক্তিসাধনার যাবতীয় ক্রিয়া অথর্ব্ববেদে রূপ ধরিয়াছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত অথর্ব্ববেদ আর্য্যঋষির ত্রিবেদের অন্তর্ভুক্ত হয় নাইঃ ইহার সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে; "অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্ত শান্তি-পৌষ্টিকাভিচারাদি-কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব।" (প্রস্থানভেদ)।

উপনিষৎ

কেবল অথর্ব্ববেদের সংহিতাভাগে নয়, উপনিষদ্‌গুলিতেও আদিমতম জাতির শিব ও শক্তিদেবতার অখণ্ড প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। শক্তিতন্ত্রে শিব ও শক্তির অদ্বৈত সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। সমগ্র সৃষ্টি শিব-শক্ত্যাত্মক। কোন্ অনাদিকালে শিব-শক্তির যুগনদ্ধ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছিল, কাহারা ইহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু অনাদ্যন্তকাল হইতে শিব-শক্তির যুগল সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। যোগাচারে যেমন তন্ত্রাচারের প্রভাব পড়িয়াছে, তেমনই তন্ত্রাচারের মধ্যে যোগাচারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। শিব-শক্তির মেলনক্রিয়াই তন্ত্রোক্ত যোগ। অথর্ব্বোপনিষদ্‌গুলির মধ্যে এই যোগ ও শক্তিপূজার নির্দ্দেশ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে মাতৃকাশক্তির অপরিসীম প্রভাব। ত্রিপুরোপনিষদে পঞ্চ ম-কার সাধনার উল্লেখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

অন্যান্য বৈদিক সংহিতার উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেও মাতৃকা শক্তির কথা আছে। প্রচলিত উপনিষদে কালী, করালী, উমা-হৈমবতী, ভদ্রকালী নামগুলিও পাওয়া যায়। রুদ্রপত্নীরূপে তিনি অম্বিকা, অগ্নিশিখারূপে তিনিই কালী, করালী, ব্রহ্ম-

শক্তিরূপে তিনি উমা-হৈমবতী। সংগ্রামে অসুর-বিজয়ী ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু স্ব-স্ব শক্তির গর্বে যখন স্ফীত হইয়া উঠেন, তখন যক্ষরূপী ব্রহ্মের নির্দেশে অগ্নি একগাছি তৃণও দগ্ধ করিতে সমর্থ হন না, মাতরিশ্বা বায়ু সে তৃণটিকে একচুল নড়াইতে পারেন না। অসুর-বিজয়ে দেবতার গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে ইন্দ্র যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন বহু শোভমানা দিব্য স্ত্রী-মূর্ত্তি আকাশে আবির্ভূত হইলেন; ইনিই উমা-হৈমবতী। ইনি এখানে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী. দেবতাদের ভ্রান্তি তিনিই অপনোদন করিলেন, তিনিই ইন্দ্রকে জানাইলেন, অসুর-বিজয়ে দেবতাগণ নহেন, ব্রহ্মই বিজয়ী হইয়াছেন, ব্রহ্মের বিজয়েই দেবতাগণ মহিমান্বিত হইয়াছেন,

'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি।[১]

অবশ্য প্রচলিত উপনিষদ্‌গুলিতে ব্রহ্মেরই সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাতৃকাশক্তি এখানে অপ্রধান, ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। সূর্য্যে-সোমে তিনিই বিরাজমান, তিনিই বিশ্বের নিয়ামক। অথচ তাহাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। তিনি কেবল জ্ঞানগম্য। এই জ্ঞান লাভ করাই 'নিঃশ্রেয়স্' —ইহাই অমৃত। এই অমৃতলাভের জন্য একদিন ভারতের সর্ব্বস্তরের নর ও নারী, শিশু ও যুবা, রাজা ও সন্ন্যাসী উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন

উপনিষদের 'ব্রহ্মতত্ত্ব' লইয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল; ব্রহ্ম এক না বহু, পুরুষ কি, প্রকৃতি কি, ঈশ্বর সিদ্ধ না অসিদ্ধ, সর্ব্বার্থসিদ্ধির উপায় কি, যোগ না জ্ঞান—এই সকল সমস্যারই আলোচনা ভারতীয় ষড়দর্শন। এই দর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া বেদান্তে ও সাংখ্যদর্শনে মায়া-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তের মতে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা। সৃষ্টি 'মায়া'র রচনা, এই মায়াও মিথ্যা; জ্ঞানোদয়ে মায়ার ফাঁদ ফাঁসিয়া যায়, তখন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের শারীরিক ভাষ্য রচনা করিয়া এই 'মায়াবাদ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতেও ব্রহ্মই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

সাংখ্যদর্শন বেদান্তের প্রতিবাদী। ইহা কপিলমুনি-রচিত। কপিলমুনির জন্ম-স্থান বঙ্গদেশ। সম্ভবতঃ এই জন্যই সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। সাংখ্যমতে

১ কেনোপনিষৎ, ৪।১

যাবতীয় সৃষ্টি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে বিধৃত। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি প্রধান তত্ত্ব। অন্যান্য তত্ত্বগুলির মূল কারণ প্রকৃতি; প্রকৃতিই প্রধান, বাস্তব, প্রপঞ্চ সৃষ্টির কারণ—আর পুরুষ অকর্ত্তা, দ্রষ্টা, সাক্ষীমাত্র। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি অন্ধ জড়শক্তি। পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রে, পুরাণে যে শক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্যের প্রভাব অপরিসীম। পুরাণাদির দেব ও দেবশক্তির প্রতিমা ও তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতেই নির্ম্মিত।

পুরাণে মাতৃদেবীর আদর্শ

আর্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জনসাধারণের জীবনে পুরাণের অত্যন্ত সমাদর। হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবপ্রতিমা সবই পুরাণ হইতে গৃহীত। জাতীয় জীবনে ইহাদের অপ্রতিহত প্রভাব; আধুনিক হিন্দু সমাজ পুরাণের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণগুলি রূপক। বেদ, বেদান্ত-দর্শনে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা আছে, তাহা কায়াহীন। দর্শনের যুগে এই আলোচনা বিশুষ্ক তর্কে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ সূক্ষ্মতত্ত্ব বা কায়াহীন ব্রহ্মকে কল্পনা করিতে পারে না, তাহারা চায় কিছুটা রস, কিছুটা রূপ। অচিন্ত্যতত্ত্বের রস-রূপায়ণ পুরাণ। পুরাণগুলিতে মনোজ্ঞ উপাখ্যানের মধ্য দিয়া যেমন একদিকে সূক্ষ্মতত্ত্বকে বুঝানো হইয়াছে, তেমনই সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য দেবতাকে প্রতিমারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইখান হইতেই হিন্দুর পৌত্তলিকতার সূচনা।

পুরাণগুলিতে মাতৃকাশক্তির অখণ্ড প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তি পুরাণের প্রধান প্রতিমা। কিন্তু সর্বত্রই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। ব্রহ্মার শক্তিরূপে তিনি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তিরূপে তিনি বৈষ্ণবী শক্তি, শিব-শক্তিরূপে তিনি শিবানী। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রতীক যথাক্রমে তিন শক্তি—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী। পুরাণগুলিতে শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। অন্য পুরাণের কি কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে গোপীরা 'কাত্যায়নী' দেবীর পূজা করিয়াছেন।* মার্কণ্ডেয় পুরাণে, দেবীভাগবতে, কালিকাপুরাণে মাতৃকাদেবীই সার্ব্বভৌম সম্রাজ্ঞী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তিনি বলিয়াছেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' (চণ্ডী, ১০ম অঃ); দেবীভাগবতে বলিয়াছেন, 'কিংনাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি' (৩য় স্কন্ধ, ৬ অঃ)।

* সেখানে এরূপ নির্দ্দেশও আছে,—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।৪৭)

বস্তুতঃ মাতৃ-কারণবাদী পুরাণগুলিতে, দেবীর মূর্ত্তি ও তত্ত্ব অতি মহিমময়। এখানে তিনি একদিকে দনুজদলনী, অন্যদিকে করুণারূপিণী; তিনি অতি ভীষণ, অথচ অতি সুন্দর; তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী। বেদ-বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ইনি অভিন্না।

তন্ত্রশাস্ত্র— শক্তি আরাধনার কল্পভাণ্ডার

শক্তিদেবীর মহিমা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে। ব্যাপক অর্থে তন্ত্র বলিতে যে-কোন সাধন-শাস্ত্র বুঝায়। তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজার নির্দ্দেশ আছে; মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মউপাসনার পদ্ধতি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ 'তন্ত্র' শক্তিপ্রধান শাস্ত্র। প্রকারভেদে শক্তির তত্ত্ব ও উপাসনা-পদ্ধতি বর্ণনা করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। তন্ত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। আগম, ডামর, যামল প্রভৃতিও তন্ত্র।

তন্ত্রের প্রধান উপাস্য মাতৃকা-শক্তি স্ত্রীমাত্রেই শক্তি। প্রকৃতি (primeval matter), বৈদিক স্ত্রীদেবতা সরস্বতী, রাত্রি, পৌরাণিক দেবতা উমা, লক্ষ্মী, রাধা; লৌকিক দেবতা ষষ্ঠী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী সকলেই শক্তির মূর্ত্তি। এক কথায় স্ত্রীলিঙ্গ-বোধক যাবতীয় পদার্থ এই শক্তির প্রতীক। সংখ্যাতীত তন্ত্রগ্রন্থে লক্ষ লক্ষ মহাশক্তির উল্লেখ রহিয়াছে: 'শত লক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে' (সিদ্ধ যামল)। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশমহাবিদ্যা—

> কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
> ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
> বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
> এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (চামুণ্ডাতন্ত্র)

তন্ত্র আর্য্য-প্রণীত শাস্ত্র, কিন্তু ইহার মধ্যে কি তত্ত্বে, কি সাধনায় আদিমতম সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তন্ত্রে বেদাচার দক্ষিণাচারের উল্লেখ থাকিলেও তান্ত্রিক দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতি লৌকিক ধারারই ধারক। তন্ত্রোক্ত বামাচার বেদ-সিদ্ধান্ত-বিরোধী। এই জন্যই তন্ত্রের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীদের মনোভাব তির্য্যক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই।

তন্ত্রের মধ্যে আর্য্য ও আর্য্যেতর ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আদিমতম জাতির মধ্যে মাতৃপূজার যে ধারা ছিল, যাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বেদে, দর্শনে, পুরাণে

তাহাদেরই একটি সুসংহত রূপ দেখা যায় তন্ত্রে। সমন্বয়ের রূপটিই তন্ত্রের স্বরূপ। তাই ইহাতে স্থূল ভৌতিক তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অর্থহীন মন্ত্র এবং গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক মন্ত্র; কবিত্ব ও দার্শনিকতা এবং আভিচারিক ষট্কর্ম্ম (শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও মারণ) বৈধ এবং অবৈধ আচার একাধারে সমীভূত হইয়াছে। তন্ত্রে একদিকে যেমন বলা হইয়াছে :

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
ম-কারং পঞ্চদেবেশি শীঘ্রং সিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

তেমনই আবার ইহাদের আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে :

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম॥ (বিজয়তন্ত্র)

উপাসনা পদ্ধতি যাহাই হউক, তন্ত্রগ্রন্থে মাতৃকাশক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। তন্ত্রের ধ্যান, জ্ঞান, স্তবস্তুতি, জপ, হোম, মন্ত্র, মণ্ডল সব কিছুর লক্ষ্য জগন্মাতা। মাতৃ-তান্ত্রিক জাতির মাতৃভাবাসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তন্ত্রশাস্ত্র। ইহা শক্তি-উপাসনার কল্পভাণ্ডার।

বৌদ্ধধর্ম্মে শক্তিবাদ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহামতি বুদ্ধদেব বিরাট সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। অহিংসাধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। Edwin Arnold তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'All honoured, Wisest, Best, most pitiful' (Light of Asia)—এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মেও একদিন মাতৃকাপূজার অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। হিন্দুতন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধদের মধ্যেও অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব আদৌ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার যাগযজ্ঞ, হিংসাত্মক কর্ম্ম ও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিল। দশশীল অবলম্বন করিয়া সংজীবন যাপনপূর্ব্বক 'দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং' (থেরী গাথা)—কি ভাবে করা যায়, ইহাই ছিল তাঁহার ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লইয়াই তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে সঙ্ঘে তখনকার দিনের সকল জাতি ব্রাহ্মণ-শূদ্র জাতিভেদ ভুলিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ধাত্রীমাতা 'মহাপজাপতী' গোতমীর

অনুরোধে বুদ্ধদেব সঙ্ঘে নারীরও প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন, তাহার ফলে 'মিগলুদ্দক'-দুহিতা (ব্যাধকন্যা) চাঁপা, 'কম্মারধীতা' (কর্ম্মকার দুহিতা) সুভা, পুরাণ-গণিকা উৎপলবর্ণার মত বহু নারী বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া 'থেরী' (স্থবিরা—জ্ঞানবৃদ্ধা) হইয়াছিলেন। বৈশালীর বৃজি-লিচ্ছবি বংশের (Vincent A Smith-এর মতে ইহারা মোঙ্গলীয়) অনেকে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন।

হীনযান ও মহাযান

সঙ্ঘে নারী ও মাতৃতান্ত্রিক জাতির প্রবেশাধিকার হওয়ায় কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ঘটে। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর পরেই ইহাতে তন্ত্রাচার ও যৌনমূলক যোগাচার প্রবিষ্ট হয় এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে নানা বিমিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিতে থাকে ইহার ফলে সঙ্ঘে দুইটি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়, একদল চাহিলেন, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র বুদ্ধ-বাণীর অনুসৃতি, অন্যদল চাহিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুমূর্ত্তিপূজা, তান্ত্রিকতা ইত্যাদির সমন্বয় ও স্বীকৃতি। কালক্রমে এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব তুমুল হইয়া উঠায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দুইটি স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাদের নাম হয়—হীনযান ও মহাযান হীনযান সম্প্রদায় সংরক্ষণশীল। বুদ্ধদেবের আচার-আচরণ, বাণী—এইগুলিকে তাহারা যথাযথ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেবের বাণী ও নির্দ্দেশে পূর্ণ পালিভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক' (সুত্ত, বিনয, অভিধম্ম) উঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায় উদারমতাবলম্বী বলিয়াই হিন্দুদের অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মেও বিবিধ দেবদেবীর পূজা, তন্ত্রাচার প্রভৃতি স্বীকার করিয়া লন। তাহার ফলে বুদ্ধ, বুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসাবে তারা, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ ও তাঁহাদের বিভিন্ন শক্তি দেব ও দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি হিসাবে এই মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত বজ্রযানীদের মধ্যে বহু তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়। এই তন্ত্রগুলি হিন্দুতন্ত্রের মতই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং পূজার মন্ত্র, যন্ত্র (মণ্ডল), জপ ও হোমের নির্দ্দেশ পূর্ণ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বৌদ্ধতন্ত্র রচনার প্রধান কেন্দ্র বাঙলাদেশ। বঙ্গীয় পালরাজাদের সময়টিই এই তন্ত্রাচার ও তন্ত্ররচনার সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ধারণা করা হয়।

বৌদ্ধদের মধ্যে যে কত তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে বৌদ্ধতন্ত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, বা ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য যে 'সাধনমালা', 'নিষ্পন্ন যোগাবলী' সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে অসংখ্য

শক্তিদেবীর উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধপণ্ডিত নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তিদেব, কমলশীল প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ তন্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, রচনা করিয়া ও তাহাদের টীকা লিখিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দার মধ্যে এই শাস্ত্রের প্রভূত সমৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি তিব্বতে, চীনে, এমন কি মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই সকল দেশ হইতে এখনও নূতন নূতন তন্ত্রগ্রন্থ ও দেবীমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে।

বৌদ্ধসহজিয়া ঃ দোহা ও চর্য্যায় তান্ত্রিকতার প্রভাব

কালক্রমে বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্গত মন্ত্রযানশাখা বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযানে বিভক্ত হয়। বজ্রযানীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে শক্তির মন্ত্র, মণ্ডল, জপ ও হোমের প্রচলন হইযাছিল। ইহার বিরুদ্ধে 'সহজযান' নামে এক শাখা এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সহজযানীরা তান্ত্রিক পূজা-অর্চনা অপেক্ষা দার্শনিকতা ও তান্ত্রিক যোগাচারের উপর জোর দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সাধনাকে নবতর রূপ দান করেন। ইহারা বৌদ্ধ সহজিযা নামে পরিচিত। উপচার ও মন্ত্রবহুল পূজা হইতে তাঁহারা অদ্বয় জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া, যৌনসম্পর্কমূলক 'যৌগিক' প্রক্রিয়ায় করুণা ও শূন্যতার যোগে 'মহাসুখ' লাভ করাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিতেন।

সহজযান বজ্রযানেরই একটি রূপান্তরিত স্তরমাত্র। ইহাতে দেবদেবীর কথা নাই, মন্ত্র-মণ্ডলাদিও ইঁহাদের নিকট তুচ্ছ, হৃদয়ের ধর্ম্মই প্রধান; কিন্তু ইহাতেও শাক্তের দেহতত্ত্ব, নাড়ী ও চক্রের (কমল) পরিকল্পনা, মূল শক্তিরূপে চণ্ডালী বা ডোমনীর (কুলকুণ্ডলিনীর অনুরূপ) স্বীকৃতি রহিয়াছে। এই দিক হইতে শাক্ততন্ত্রের প্রভাব সহজযানীদের ধর্ম্মে ও সাধনায় সুস্পষ্ট।

সরহবজ্র, কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রমুখ সহজিয়া বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রাদেশিক অপভ্রংশে দোহাবলী এবং প্রাচীনতম বাঙলা ভাষায় চর্য্যা পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে নানাদিক হইতে শক্তিসাধনার প্রভাব বিদ্যমান। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'If we analyse and examine the ideas of the Buddhist Sahajiyas we shall find that, as an offshoot of Tantric Buddhism, it embodies the heterodoxy of Buddhism in general mixed up with the spirit of Tantricism (Obscure Religious Cults, P. 89)

বাঙলা সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব

বাঙলা সাহিত্যের উপরে মাতৃভাবাসক্তির প্রভাব অপ্রমেয়। বাঙালী মা-পাগল জাতি, তাহার 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান'। বহুযুগ ধরিয়া এদেশে মাতৃ-তান্ত্রিক জাতিরাই বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। তাই বাঙলা দেশের ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে এবং সাহিত্যে মাতৃভাবের এত প্রভাব।

বাঙলা সাহিত্যের সূচনা হইযাছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গীতাবলী লইয়া। এইগুলি চর্য্যাগীতিকা নামে প্রসিদ্ধ। এই গানগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আবরণে যে তান্ত্রিক যোগসাধনার নানা কথা আছে, তাহা আমরা বলিযাছি। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধরণের গীত রচনার ধারা লুপ্ত হইযা যায়। সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্জাগরণের ফলে, তান্ত্রিক বৌদ্ধের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং বৌদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত মিশিযা যাইতে থাকেন। মুসলমান আক্রমণে তাঁহারা আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। অনেক বৌদ্ধ বিনষ্ট হন, অনেকে প্রাণভযে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, অনেকে হিন্দুদের মধ্যে আশ্রয গ্রহণ করেন, অনেকে আবার নেপাল-তিব্বতের দিকেও পলায়ন করেন। এই সংঘাতে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে, এবং বৌদ্ধগ্রন্থগুলিও এ দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করে।

মঙ্গলকাব্য

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বাঙলা সাহিত্যে নব নব শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটিতে থাকে। মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দুর জীবনে নিদারুণ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়। নির্ব্বিচার অত্যাচারে বিপন্ন ধন, মান, জীবন। আঘাতটা বেশী আসে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপর। নিরুপায় হইয়া তখন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, ডোম, চণ্ডাল, শূদ্রাদির সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ছিলেন লৌকিক সংস্কৃতির ধারক; তাহার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণও ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। মুসলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে লৌকিক বৌদ্ধ সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলন সাধিত হয়। তাহাতে অনেক লৌকিক ও বৌদ্ধ দেব-দেবী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বীকৃতি লাভ করে। এই দেব-দেবীই তথাকথিত মঙ্গল দেব-দেবী। তাঁহাদের মাহিমা ও পূজা-প্রচারের কাহিনী লইয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই 'মঙ্গলকাব্য'। এই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে প্রধান—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মাতৃকাদেবী ও লৌকিক লোকমাতৃকা পৌরাণিক মহিমায় ভূষিত হইয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের 'মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডী' পৌরাণিক খুল্লনা-পূজিতা মঙ্গলচণ্ডী অরণ্যদেবতাবিশেষ এবং গজ-গ্রাসিনী 'কমলে কামিনী' বৌদ্ধ-দেবতা। মনসাদেবীর মধ্যে ত্রিবিধ-সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের 'চণ্ডীদেবী' তন্ত্রোক্ত কালী, কোথায়ও বা দুর্গা। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির মধ্যে পৌরাণিক প্রভাবই বেশি। বেদাচারী ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক পশুভাবের সাধনাকে আশ্রয় করিয়া মাতৃপূজার যে বেদাচারসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, মঙ্গলকাব্যের দেবীপূজা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারই অনুরূপ, তবে 'চৌতিশা স্তবগুলির মধ্যে তন্ত্রোক্ত স্তব-কবচের প্রভাব আছে। দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে যোগের কথা আছে। মহাদেব নীলাম্বরকে যে 'মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান' শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কুণ্ডলিনী যোগ। "হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি'—বাক্যটি 'হংস'-যোগের দিক হইতে গভীর তাৎপর্য বোধক। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও মনসার বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রে তান্ত্রিক যোগের কথা বলা হইয়াছে :

কেন ত্রিভুবন নাথ আপনা বিস্মর।
মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ॥
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট।
আসুক পরমহংস ভ্রমুক সুবাট ॥[১]

শিবায়ন ও কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) কাব্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার সাধনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। বামাচার শক্তিসাধনায় স্থূলশক্তিকে লইয়া সাধন করার রীতি আছে। শিবায়ন কাব্যের হরপার্ব্বতীর বিচিত্র দাম্পত্য মিলনের মধ্যে সেই গূঢ়তর রহস্যের সঙ্কেত রহিয়াছে; বিশেষ করিয়া কোচপল্লীতে শিবের গতায়াত এবং কোচরমণীর রূপে রূপমুগ্ধতা অনুরূপ সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে। তবে রূপকাবরণ এবং দেবীর গৃহস্থালীর বিবিধ বর্ণনার মধ্যে এই সাধন-রহস্য তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে 'কামরূপা' মাতৃকাদেবীর আর্য্যপূর্ব্ব পরিকল্পনার প্রভাব স্পষ্টতর। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে খিলহরিবংশোক্ত ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর ছাপ পড়িয়াছে। ঊষার সহিত অনিরুদ্ধের অবৈধ গোপন মিলন পার্ব্বতীর বরে ও কৌশলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। বিহার-রতা হরপার্ব্বতীকে দেখিয়া ঊষার মনে মিলনেচ্ছা জাগ্রত হইলে, পার্ব্বতী বর দিয়াছিলেন,

ঊষেত্বং শীঘ্রমপ্যেবং ভর্ত্রা সহ রমিষ্যসি।
যথা দেবো ময়া সার্দ্ধং শঙ্করঃ শত্রুনাশনঃ ॥ (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব)

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ডাঃ সুকুমার সেন।

'কালিকামঙ্গল' কাব্যেও দেখা যায়, সুন্দর কালিকাদেবীর নিকট বর লাভ করিতেছেন :

ঘোরতর নিশিশেষ ধরি কালি নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন ॥
ভাব কেন ওবে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে ॥ (রামপ্রসাদ)

বামাচারসম্মত শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতির প্রভাবও কালিকামঙ্গল কাব্যে আছে। এই কাব্যে মশানে 'চৌতিশা' স্তবে সুন্দরের দেবীর আরাধনার কথা আছে। সুন্দরের এই সাধনা যে শ্মশানে বীরাচারী তান্ত্রিকের শবসাধনা, রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গলে' তাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত শবসাধনার যাবতীয় কথা এখানে বাঙলা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

অনুবাদ-সাহিত্য : রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত

'অনুবাদ-সাহিত্য' প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলমান সম্রাটগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশের শিল্প সাহিত্যের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুপণ্ডিতগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পুরাণাদি শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই অনুবাদ-সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত হইতে যে কাব্যগুলি অনূদিত (ভাবানুবাদ) হইয়াছিল, তাহাতেও প্রসঙ্গক্রমে শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসে যোগাদ্যার বন্দনা, দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গলে গোপগণের হরগৌরীপূজা ও রুক্মিণীর চণ্ডীকাপূজার বর্ণনা আছে। দুর্গামঙ্গল নামধেয় কাব্যগুলি শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুবাদ। এ সব স্থলে মাতৃপূজার পৌরাণিক পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে শক্তি-সাধনার প্রভাব

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর স্থান অতি উচ্চে। লৌকিক প্রেম-প্রণয়ের ভিত্তিতে এমন আবেগপূর্ণ, কবিত্বময় ধর্মসঙ্গীত বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'What gave me boldness when I was young was my

early acquaintance with the old Vaishnava poems of Bengal, full of the freedom of metre and courage of expression'[১]—ছন্দের এমন ঝঙ্কার, হৃদয়ভাবের এমন অকুণ্ঠ প্রকাশ বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে চির অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যেও শক্তি-সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীতে শক্তি সাধনার অমোঘ প্রভাব বিদ্যমান। গোড়া হইতেই এদেশে দুই প্রকারের বৈষ্ণব কবিতার ধারা প্রচলিত ছিল: একটি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রিত বৈষ্ণব-পদাবলী, অপরটি তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলী। জয়দেব-পূর্ব্ব সংস্কৃত এবং প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলী হইতে এই উভয় ধারার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বে ও সাধনায় শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব বহুপূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব 'পাঞ্চরাত্রে' শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা শাক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ। 'গৌতমীয় তন্ত্র' বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বীজমন্ত্রাদির সাধন সম্পর্কে দীক্ষা, পূজা, ন্যাস, প্রাণায়ামাদির যে-সকল নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে সকলই শাক্ত তন্ত্রানুসারী। 'রাধাতন্ত্র' নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে, তাহাতে শক্তিসহায়ে কাত্যায়না দেবীর উপাসনার কথা বিবৃত হইয়াছে। দেবী বাসুদেবকে বলিতেছেন, তোমার পূজা, জপ, পরিশ্রম—সবই বৃথা, কারণ, শক্তির যোগ ব্যতীত পূজা নিষ্ফল, কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভের আশা নাই,

> কুলাচারং বিনা পুত্র ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
> শক্তিহীনস্য তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক ॥ (রাধাতন্ত্র, ২য় পটল)

তিনি আরও কহিলেন, ভোগ ছাড়া যোগ হয় না, অতএব তুমি শক্তিসহায়ে যোগ সাধনা কর। মথুরা ও ব্রজমণ্ডল দেবীর কেশপীঠ, তথায় কাত্যায়নী দেবী বিরাজমানা, সেখানে পদ্মিনীর সহিত কুলাচার পদ্ধতিতে সাধনা কর, সিদ্ধি সুনিশ্চিত। এই পদ্মিনীই রাধা, ইনিই কৃষ্ণের মনোমোহিনী। রাধাতন্ত্রের মতে, শ্রীকৃষ্ণ 'কুলাচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পদ্মিনী-সঙ্গমাগতঃ'। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রকৃতপক্ষে শক্তিসহায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহাবিদ্যার উপাসনা। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' হইতে 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুরাণে রাধাকৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে গো-গোপী-গোবিন্দময় গোলোকের নিখুঁত বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এই পুরাণের প্রভাব কম নয়। ইহার 'প্রকৃতি'-খণ্ডে যে রাধিকো-

১ The Religion of an Artist—Tagore.

পাখ্যান সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন, নানাপ্রকার তন্ত্র, পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিলাম, এইবার রাধিকোপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া শিবের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, 'পঞ্চবক্ত্রশ্চ ভগবান্ শুষ্ক-কণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ'—কারণ আগমারম্ভে অতি গুহ্য এই রহস্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 'রাসেশ্বরী রাধিকয়া সংযুক্ত' শ্রীকৃষ্ণের গোলোকের নিত্যরাসের রহস্য স্বকীয়া শক্তিদের অজ্ঞাত। এই পুরাণে রাধা-উপাসনার বিবরণ আছে, তাহাতে রাধাপূজায় আসব নিবেদনের মন্ত্র দেখা যায়। মন্ত্রটি এইরূপ

আসবং রত্ন পাত্রস্থং সুস্বাদু সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ (প্রকৃতি, ৫৫ খঃ)

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, প্রাক্‌চৈতন্য যুগে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে নানাদিক হইতে শক্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব অবিসংবাদিতরূপে শাক্ত প্রভাবপুষ্ট। ডাঃ সুশীলকুমার দে মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কামগায়ত্রী গ্রহণ ও শ্রীমতীকে শক্তিরূপে কল্পনার মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান (দ্রষ্টব্য—Early History of the Vaishnava Faith and Movement) ; ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও তাঁহার সুবিখ্যাত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করিয়াছেন, "রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে ; সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত বিভিন্নভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই ক্রমপরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই রাধাবাদ।" শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে,

হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি বরীয়সী।
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥ (রাধা প্রকরণ)

বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী, তত্ত্ব এই সকল প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই রচিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় 'রাধামাধবয়োঃ···রহঃকেলয়ঃ।' এই কাব্যের প্রারম্ভে 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' শ্লোকটিতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে যেন রাধাতন্ত্রের ভাব ও সুর ধ্বনিত হইয়াছে। একটি পদে স্পষ্টতঃ তান্ত্রিক যোগের উল্লেখ রহিয়াছে,

অহোনিশি যোগ ধেয়াই।
মন পবন গগনে রহাই ॥ (বিরহ খণ্ড)

চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীতে 'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত!' মহাভাবময়ী রাধার জয়জয়কার। কবিরাজ গোবিন্দদাসের 'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল' পদটীতে শ্রীমতী রাধিকার অভিসার-শিক্ষার যে ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেন তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াযোগেরই একটি শব্দ-চিত্র।

বৈষ্ণব সহজিয়া

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার মধ্যে শাক্ত কুলাচারের প্রভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মিলন-রূপকে রস ও রতির যে যোগের কথা রহিয়াছে, তাহা শক্তিসাধকের পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনীর যোগ হইতে অভিন্ন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "The psycho-physiological yogic processes, frequently refered to in the lyrical songs of the Vaishnava Sahajiyas and also in the innumberable short and long texts, embodying the doctrines of the cult, are fundamentally the same as are found in the Hindu Tantras as well as in the Buddhist Tantras and the Buddhist songs and Dohas.' (Obscure Religious Cults, p. 135)

সেনরাজাদের আমলেই এই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথমত সেনরাজারাও হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের মোহময় আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' হইতে জানা যায়, বল্লাল সেন প্রথমে তান্ত্রিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মনে হয়, সেন-রাজাগণ যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কুলাচারসম্মত বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ইহাই পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলী ও গ্রন্থাদির মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী জয়দেব', 'লছিমাচরণ'-ধ্যানী বিদ্যাপতি, রামী-সর্ব্বস্ব চণ্ডীদাস কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস, 'ভোগপুরন্দর' হোসেন শাহ এবং তাঁহার সভাকবি যশোরাজ খানের মধ্যেও শক্তি-সহায়ে সাধন-প্রথার প্রভাব কম নয়।

রাগাত্মিক পদাবলীর মধ্যে দেহতত্ত্ব, মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বদ্বারা দেহের গঠন, দেহমধ্যে ষট্‌চক্রের অবস্থান, কুণ্ডলিনী, পরম শিব—এক কথায় তান্ত্রিক যোগসাধনার সব কথাই আছে।

শাক্তপদাবলী

বাঙলা দেশে প্রচলিত আউল-বাউল গানগুলির মধ্যেও শক্তিসাধনার প্রভাব পড়িয়াছে। এইভাবে শক্তিসাধনার নানা ধারা বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যভাবের শক্তিসাধনার কথা তখনও পর্য্যন্ত কাব্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার সংঘাত। এই সংঘাতে শক্তিসাধনার দিব্যভাব লইয়া অপূর্ব্ব সুন্দর শাক্তপদাবলী রচিত হইয়াছে।

শক্তিবাদের ইতিহাস ও ভারতীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যে তাহার প্রভাব অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বিবৃত হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, এদেশে শক্তিসাধনার ধারাটি সুপ্রাচীন। এদেশে, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে, আর্য্যাধিকার বিস্তৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই শিব-শক্তির সাধনা প্রচলিত ছিল। এই বিশিষ্ট সাধনার আচার-অনুষ্ঠান যতই নিন্দিত হউক, মানব-প্রকৃতির উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। এই জন্যই এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম্মে তান্ত্রিকতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সাহিত্যও ইহার প্রভাব-বিমুক্ত হয় নাই। বিশেষ করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শক্তিবাদের প্রভাব অপরিসীম। এদেশের শ্যামা-সঙ্গীতগুলিও শক্তিসাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ লইয়াই রচিত।

॥ চার ॥

শাক্তপদাবলীর সম্ভাব্য উৎস

ভব-অঙ্গনা ষোড়শী চিরযৌবনা, 'প্রফুল্ল পঙ্কজাননা', তাঁহার আদি নাই, অন্তও নাই; মনে হয় তিনি যেন 'বৃন্তহীন কুসুম'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর প্রকট সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাকেও তেমনই 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু তাহা নয়। সঙ্গীতগুলির একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বিভিন্ন উৎস হইতে বস্তু ও ভাব আহরণ করিয়া শাক্তসঙ্গীত অষ্টাদশ শতকে সচেতন ও কলগীতি-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন, এই শতাব্দীর ক্রমবর্দ্ধমান শাক্তচেতনা এবং প্রচলিত শাক্ত সাহিত্যগুলিই শ্যামা-সঙ্গীতের উৎস; ঐ চেতনা ও সাহিত্যের উৎস আবার প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র: Its origin must be traced back to the recrudescence and ultimate domination of the sakti cult and sakta form of literature in the eighteenth century, which in its turn may be traced its origin in general to the earlier Tantric form of worship. বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রই যে বাঙলার শাক্ত কাব্যগুলির অন্যতম উৎস, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শক্তিবাদের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতে দেখা গিয়াছে, তন্ত্ররূপ সাধনশাস্ত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেও শক্তি সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। বেদ, দর্শন ও পুরাণে মাতৃকা দেবীর তত্ত্ব ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি-সাধনার ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি তন্ত্রের নিজস্ব হইলেও তন্ত্রে দেবীর লীলা বর্ণনা করা হয় নাই। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রকে শাক্তপদাবলীর মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করিলেও, বেদ, দর্শন ও পুরাণের প্রসঙ্গও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শাক্ত সঙ্গীতের কাহিনী পুরাণ হইতেই গৃহীত।

তন্ত্র ও পুরাণের ধ্যান ও স্তোত্র লইয়া পরবর্ত্তীকালে অনেক ধর্ম্মমূলক স্তোত্রও রচিত হইয়াছিল, হিন্দুতন্ত্রের অনেক মূর্ত্তি এবং দেবীর সাধন-প্রণালী বৌদ্ধতন্ত্রেও গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে যে গানগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও শক্তি-সাধনার ইঙ্গিত বর্ত্তমান। শক্তি-সাধনার এই সকল ধারা, দেবীর লীলা ও রূপ, রূপান্তরিত হইয়া বাঙলা ভাষায় রচিত শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। শাক্তপদাবলীর মূল ইহাদের মধ্যেও নিহিত রহিয়াছে।

উপরন্তু লৌকিক ও পারিবারিক ভাব লইয়া বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে যে প্রকীর্ণ কবিতাবলী রচিত হইয়া আসিতেছিল, যাহাদের ভাব বহুমুখী ও বিচিত্র, শাক্তপদাবলীর ভাব-দেহ নির্ম্মাণে তাহাদের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, শাক্ত-সঙ্গীতের ঘরোয়া ভাব, মায়ের অপার স্নেহ, সন্তানের মান-অভিমান ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভাবগুলি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সমাহৃত। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ধর্ম্মভাবটুকু ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর যাবতীয় লৌকিক ভাবের উৎস-কেন্দ্র এই সকল প্রকীর্ণ কবিতা। বাঙলা পদাবলী সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই দুইটি বিশিষ্ট ধারা, একই উৎসমুখ হইতে লৌকিক ভাব আহরণ করিয়া দ্বিবেণী ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাদের পার্থক্য কেবল সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনোপায়ের মধ্যে; লৌকিক ভাবের নেপথ্য-বিধান উভয়েই এক সাজঘর হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

অতএব শাক্তপদাবলীর উৎস হিসাবে (১) বেদ-দর্শন-পুরাণ (২) তন্ত্রশাস্ত্র (৩) সংস্কৃতে রচিত ধর্ম্মমূলক স্তোত্র ও কবিতা (৪) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলী (৫) বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া চর্য্যাপদাবলী ও (৬) প্রাচীন বাঙলার মঙ্গলকাব্য—প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ এবং প্রকীর্ণ কবিতাবলীই মুখ্য উৎস, অন্যগুলি গৌণ।

বেদ ঃ দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত (১০।১০।১২৫), রাত্রিসূক্ত (১০।১০।১২৭), সামবেদের রাত্রিসূক্ত (৩।৮।২) কে শক্তিবাদের প্রধান উৎসরূপে গণ্য করা হয়। শাক্ত সঙ্গীত-গুলির মধ্যে ইহাদের পরোক্ষ প্রভাব বর্ত্তমান। দেবীসূক্তের 'রাষ্ট্রী', 'চিকিতুষী', 'প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্' পরমাত্মা শক্তির বিশ্বব্যাপিনী বিরাট রূপ, বৈদিক 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' পুরুষের মতই বিশ্বাতিগ ও বিশ্বানুগ। শাক্তপদাবলীর 'ধরে রে সহস্রবাহু সহস্র প্রহরণ, সহস্র চরণে করে অলস্য বিচরণ' (গোবিন্দ চৌধুরী), 'ওঙ্কার মূরতি' জগজ্জননীর রূপ নির্ম্মাণের সহায়ক হইয়াছে। রাত্রিসূক্তে 'আয়তী অমর্ত্যা' রাত্রির যে দ্যোতনশীল রূপের কল্পনা করা হইয়াছে, যে রূপের ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়—'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ', তাহার সহিত বঙ্গীয় সাধক কবির কালীমূর্ত্তির 'ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণিমরকতকান্তি ছটা' (রামপ্রসাদ), অথবা 'রূপ সে তিমির রাশি অথচ তিমির নাশি' (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর) প্রভৃতি বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায়।

বেদান্তের 'মায়া' এবং সাংখ্য দর্শনের প্রধান, বাস্তব 'প্রকৃতি'-দ্বারা তন্ত্র ও শাক্ত

সঙ্গীতের মাতৃদেবীর তত্ত্ব-মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব বহু পদে বর্ত্তমান। বিশেষ করিয়া এই প্রসঙ্গে রসিকচন্দ্র রায়ের 'কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব প্রসবিনী' পদটি উল্লেখযোগ্য।

পুরাণ ঃ দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণগুলিতে দেবী সম্পর্কে যে সকল বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়, শাক্ত সঙ্গীতের কাহিনী-দেহ তাহাদের দ্বারাই নির্ম্মিত। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, উমারূপে হিমরাজ-গৃহে তাঁহার জন্ম, ইন্দ্রের বজ্রভয়ে মৈনাক পর্ব্বতের সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ, বিভূতিভূষণ গঙ্গাধর নীলকণ্ঠ সিদ্ধিপায়ী শিবের নির্গুণ বৈভব, অন্নপূর্ণারূপে দেবীর কাশী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু পৌরাণিক বৃত্তান্ত শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। বিশেষ করিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্'—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ এবং দেবীর 'সৌম্যেভ্যস্থতিসুন্দরী' মূর্তি, তাঁহার 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা' শাক্ত সাধকগণের রুদ্রসুন্দর মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কনে সাহায্য করিয়াছে। এই পুরাণেই দেখা যায় কৌশিকী দেবীর ক্রোধোদ্রেক হওয়ায়, তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে সহসা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীর আবির্ভাব হইল ঃ

> ভ্রূকুটিকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদদ্রুতম।
> কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
> বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
> দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
> অতিবিস্তার বদনা জিহ্বাললনভীষণা।
> নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥ (উঃ চঃ, ৭ম অধ্যায়)

শাক্তপদাবলীর বহুপদে করালা চামুণ্ডার রূপবর্ণনায় এই মূর্ত্তিটির প্রভাব পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া পুরাণের বিবিধ স্তব এবং বিশেষ করিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর নারায়ণী-স্তুতিগুলির প্রভাব প্রায় প্রতি পদেই বর্ত্তমান।

তন্ত্রশাস্ত্র ঃ শক্তিপূজার বিশ্বকোষ

শাক্ত পদাবলীর ভাব, উপাস্য ও উপাসনা-তত্ত্বের প্রধান উৎস শক্তিপূজার বিশ্বকোষ তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রে বিভিন্ন দেবী-মূর্ত্তির ধ্যান, পূজা ও স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

তন্ত্র ক্রিয়া-প্রধান শাস্ত্র হইলেও দেবীর ধ্যান ও স্তবগুলির মধ্যে কবিত্বও আছে। শাক্তপদকর্ত্তাগণ 'জগজ্জননীর রূপ'-কল্পনায় হুবহু তন্ত্রোক্ত ধ্যানগুলি অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদসহ কয়েকটি মহাবিদ্যার মূল ধ্যান উদ্ধৃত হইল।[১]

কালী

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্ক-মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিক চোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভি শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিদাম্॥

—দক্ষিণা কালিকাদেবী করালবদনা, চতুর্ভুজা, ভীষণাকৃতি ও আলুলায়িতকেশা। দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা, বামভাগের অধঃকরে সদ্যছিন্ন মুণ্ড, ঊর্দ্ধকরে খড়্গ এবং দক্ষিণভাগের অধঃকরে অভয় ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। উঁহার গলে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে। তাঁহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে

১ তন্ত্রসার (বসুমতী সংস্করণ) হইতে গৃহীত

বিদ্যমান। ইহাতে দেবীর আকৃতি আরও ভীষণ, দশনপংক্তি আত বিভীষণ। স্তন-যুগল স্থূল ও উচ্চ এবং শবনির্মিত কাঞ্চী কটিদেশে শোভমান। কালিকা দেবী হাস্যবদনা, ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বিগলিত রক্তধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জল। দেবীর শব্দ অতিশয় গম্ভীর। ইনি শ্মশানবাসিনী। নেত্রদ্বয় নবোদ্ভাসিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জল, দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত, কেশপাশ দক্ষিণব্যাপি ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী শিবোপরি অবস্থিতা। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ঘোররূপে চীৎকার করিতেছে। তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত রত্যাসক্তা, দেবীর মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও হাস্য-বিকশিত।

(এই ধ্যানের সহিত মহাতাবর্চাদ মহারাজের 'কে ও একাকিনী, কাহার রমণী শশীশোভা জিনি মসীবরণী' পদটি তুলনীয়)

তারা

প্রত্যালীঢপদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরী ভীমা ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমা বরপ্রদাম্॥
খড়্গাকর্ত্তৃসমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াম।
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণি যুগান্বিতাম॥
পিঙ্গোগ্রৈক জটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয় ভূষিতাম্॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম।
অক্ষোভ্যো দেবী মূর্দ্ধন্যস্ত্রিমূর্ত্তি নাগরূপধৃক॥

—দেবী প্রত্যালীঢপদা,[১] ভীমাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডরচিত মালা ও কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ইনি নবযুবতীরূপা ও পঞ্চমুদ্রা (শ্বেতাস্থিনির্ম্মিত চারটি

১ 'আলীঢ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দক্ষিণ', কিন্তু কোন কোন তন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'আলীঢং বামপাদস্তু প্রত্যালীঢন্তু দক্ষিণম্' (গুপ্তসাধনতন্ত্র); যেহেতু 'আলীঢপাদা সা দেবী প্রত্যালীঢা ক্ষণে ক্ষণে'—সেইজন্য গুরূপদেশ অনুসারে 'আলীঢ' ও 'প্রত্যালীঢ' শব্দের অর্থ করিতে হয়, অভিধানিক অর্থ এস্থলে অগ্রাহ্য।

পট্টিশ ও নরকপাল) দ্বারা বিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্কররূপা ও বরপ্রদানশীলা। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কর্ত্তরিকা, বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও উৎপল। ইঁহার শিরোদেশে পিঙ্গলবর্ণ জটা, কপালে নাগরূপী অক্ষোভ্য ঋষি। নবোদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দেহপ্রভা, তিনটি চক্ষু ইঁহার ভূষণস্বরূপা। দেবী প্রজ্জলিতা চিতা-মধ্যে দণ্ডায়মানা, ইঁহার দন্তপংক্তি অতি ভয়ঙ্কর। তিনি স্বীয় ভাবাবেশে হাস্যবদনা, স্ত্রীগন্ধাচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেতপদ্মোপরি অবস্থিতা।

(এই ধ্যানের সহিত শিবচন্দ্র রায় বিরচিত 'নীলবরণী নবীনা রমণী। নাগিনী জড়িত জটাবিভূষণী' পদটি তুলনীয়।)

মহাতাব চাঁদ মহারাজ রচিত ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, ভদ্রকালী এবং শিবচন্দ্র সরকার বর্ণিত ভুবনেশ্বরীর রূপ তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুবাদ।

ধ্যান ব্যতীত তন্ত্রের শক্তিপূজাপদ্ধতি, ভূতশুদ্ধি, মানসপূজা, কুণ্ডলিনীযোগ— এককথায় উপাস্য ও উপাসনাতত্ত্বের যাবতীয় বিষয় শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাষা-ছন্দে রূপ ধরিয়াছে। তন্ত্রসার লইয়াই শাক্তপদাবলীর দেহ গঠিত, তন্ত্রতত্ত্বই এই দেহের প্রাণ।

বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রে শক্তিদেবী সম্পর্কে যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া সংস্কৃতে বহু কাব্য ও খণ্ড খণ্ড স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের নান্দী শ্লোকে বা অন্যত্র দেবীর রূপবর্ণনা দুর্লভ নয়। এই সকল রচনাও পরোক্ষভাবে শাক্তপদাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটক, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক, শঙ্করাচার্য্যের রচনাবলী, বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক', আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের 'দেবীশতক' প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মালতী-মাধব নাটক

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন ভবভূতি তাঁহার মালতী-মাধব নাটকে (৫ম অঙ্ক) তাণ্ডবনৃত্য-পরায়ণা করালী চামুণ্ডার এক অত্যদ্ভুত বর্ণনা দিয়াছেন : দেবীর নৃত্যে কম্পমান পৃথিবী, চন্দ্র যেন শতধা বিচূর্ণ। চূর্ণিত চন্দ্রমণ্ডলক্ষরিত সুধা পান করিয়া নরমুণ্ডগুলি অট্টহাস্য করিতেছে। অধিকন্তু,—

জলদনলপিশঙ্গ নেত্রচ্ছটাচ্ছন্ন ভীমোত্তমাঙ্গ ভ্রমিপ্রস্তুতা-
লাতচক্রে ক্রিয়াস্যূত দিগ্‌ভাগমুত্তুঙ্গ খট্বাঙ্গ কোটিধ্বজো ভূতি-
বিক্ষিপ্ত তারাগণম্‌।

—দেবীর নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, মস্তকবিঘূর্ণনে অগ্নিময় অলাত-চক্রে দিগ্বিভাগ গ্রথিত। উত্তুঙ্গ খড়্গের আঘাতে নক্ষত্রগুলি যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বর্ণনাটির সহিত কবিবর রবীন্দ্রনাথের, 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।'—পদটির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এখানেও কালিকার প্রচণ্ড নৃত্যবেগে ত্রস্ত সূর্য্যসোম, কম্পিত ত্রিভুবন, দেবীর কালো অঙ্গে রাঙ্গা রক্তের প্রবাহ।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে জীবের জন্ম, মোহ, বিবেকোদ্‌যোগ বৈরাগ্যোৎপত্তি এবং জীবন্মুক্তির কথা রূপক নাটকের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকে দেখা যায়, সঙ্গরহিত পুরুষের সহিত মায়ার সংস্পর্শে মনের উৎপত্তি হইয়াছে, মনের দুই স্ত্রী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি-জায়া হইতে মহামোহ এবং নিবৃত্তি জায়া হইতে বিবেকের জন্ম হয়ঃ 'তস্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বে ধর্ম্মপত্নৌ, তয়োঃ প্রবৃত্ত্যামুৎপন্নং মহামোহ প্রধানমেককুলং নিবৃত্ত্যামুৎপন্নং দ্বিতীয়ং বিবেক প্রধানমিতি।' (১ম অঙ্ক)। এই বিবেকের উপনিষৎ-পত্নী হইতে 'বিদ্যা' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'—ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহারাই মহামোহের কুল ধ্বংস করেন।

এই নাটকটি শাক্ত সঙ্গীতাবলীর উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া, রামপ্রসাদের—'আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী কল্পতরুতলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥' পদটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সারাংশ লইয়াই রচিত।

শঙ্করাচার্য্য

ধর্ম্মমূলক স্তোত্রাবলীর মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের রচনাবলীর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে শাক্তপদাবলীর উপর বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙলাদেশের যে-কোন নিষ্ঠাবান গৃহস্থের ঘরে শঙ্করাচার্য্য-রচিত স্তোত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করা হয়।

'শঙ্করাচার্য্য' যদিও ছিলেন যোগী, জ্ঞানী তথাপি তাঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ। 'A lyric poet of much fervour and no mean accomplishment

must be recognised in the philosopher Sankara'[১]—এ উক্তি অতীব সত্য। তাঁহার কবিত্ব মনোহারী, রচনা মধুক্ষরা। সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়া তিনি সংসারের নশ্বরতা ও ভোগদেহের বীভৎসতার ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই মোহমুদ্গর—'মূঢ় জহিহি ধনাগম তৃষ্ণাং' আশ্চর্য্য কবিত্বপূর্ণ।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী হইলেও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কতকগুলি ভক্তিমূলক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। এগুলিও শ্রুতিমধুর; শব্দঝঙ্কারে ও ছন্দোমাধুর্য্যে অনুপম। তাঁহার 'সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ' অথবা 'ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো'—প্রভৃতি পদ আত্মনিবেদনের কাতরতায় এবং কবিত্বের স্পর্শে সমুজ্জ্বল।

কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্য শক্তি মানিতেন না। তাঁহার সময়ে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া তান্ত্রিকতার যে ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে তিনি দমন করেন। শঙ্করাচার্য্যের তান্ত্রিক-দলন স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু পরে তিনি শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার উচ্চতর আদর্শও তাঁহার দৃষ্টি-বহির্ভূত ছিল না। সুপ্রাচীন 'প্রপঞ্চসারতন্ত্র' খানিকে কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে করেন। তান্ত্রিক শক্তিতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি নির্ম্মাণে এই তন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। ইহাতে 'পরাপ্রকৃতি'র যে স্তবটি আছে, তাহাতে সমুন্নত শক্তিতত্ত্বের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। স্তোত্রটির প্রারম্ভিক শ্লোক এইরূপ:

প্রসীদ প্রপঞ্চ স্বরূপে প্রধানে,
প্রকৃত্যাত্মিকে প্রাণিণাং প্রাণসংজ্ঞে।
প্রণোতু প্রভো প্রারভে প্রাঞ্জলিস্থাং
প্রকৃত্যাহপ্রতর্ক্যে প্রকাম-প্রবৃত্তে॥

এখানে দেবীকে প্রপঞ্চস্বরূপ (স্থূল পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বের কারণ), প্রধান (বিশ্বোদয়ী), প্রকৃত্যাত্মিকা ('She, by whom all actions, that is, creation (Sristi) maintenance (Sthiti) and destruction (Laya) are done'—Avalon), অপ্রতর্ক্য (অচিন্ত্য) রূপে প্রণতি নিবেদন করা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র,' 'আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী' ভক্তিভাবে ও কবিত্বে অনুপম। কবি রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্য্যলহরী' স্তোত্রটিকে Shelleyর 'Ode to Intellectual Beauty' কবিতাটির সহিত তুলনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই কাব্যের প্রারম্ভিক শ্লোক:

১ A Hist. of Sans. Lit,—p. 218—Keith.

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥

এই শ্লোকটিকে শক্তিতত্ত্বের নির্য্যাস বলা যাইতে পারে। শাক্ত পদকর্ত্তাগণ বহুস্থলে ইহার ভাবদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন: পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নন্দী ও জয়ার কথোপকথনের মধ্যে এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাওযা যায়:

নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল?
জয়া বলে, মা যে আমার শক্তি হরে নিল,
ই-কাব থাকলো না যে।

শাক্তপদাবলীর 'ভক্তের আকৃতি' পর্য্যায়েব কবিতাবলীতে সংসারের দুঃখক্লান্ত, নিপীড়িত, প্রবৃত্তি-তাড়িত সন্তানের যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাব অনেকগুলি সুর শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গাব', 'দ্বাদশ পঞ্জরিকাস্তোত্র' হইতে গৃহীত। শঙ্করাচার্য্য যেখানে বলেন, 'কুপুত্রো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি', শাক্ত কবি সেখানে বলেন, 'কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো' (রামপ্রসাদ)। বিষয়-বিরক্ত শঙ্করের মতই শাক্ত-সাধকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এ সংসার অসার, মানুষ কৃমি-কীটেব মত, তাহার আশার শেষ নাই, ভোগপিপাসার অন্ত নাই। কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, শঙ্করাচার্য্য যেখানে ব্রহ্মকে সত্য এবং মাযাকে মিথ্যা জানিয়া—'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥'—এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেখানে শক্তির সাধক কবিগণ 'মহামাযা'কে চিন্ময়ী, ব্রহ্মময়ী জানিয়া, দ্বৈতবোধ বিসর্জ্জন না দিয়া, মাতৃচরণেই আশ্রয় চাহিয়াছেন। 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে'—ইহাই ভক্তের ঐকান্তিক কামনা।

গোবর্দ্ধন আচার্য্যের আর্য্যসপ্তশতী

গোবর্দ্ধন আচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী'র নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য্য গোবর্দ্ধন লৌকিক নায়ক-নায়িকার প্রেমাশ্রয়ে আর্য্যাসপ্তশতীর কতকগুলি শ্লোকে চণ্ডীর ব্যাজস্তুতি রচনা করিযাছেন। শাক্তপদাবলীর অনেকগুলি লৌকিক ভাবের অঙ্কুর এই গ্রন্থে নিহিত আছে। মনে হয়, শিবায়ন ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রগুলিরও মূল 'আর্য্যাসপ্তশতী'। গোবর্দ্ধন আচার্য্যের:

(১) কণ্ঠচিতোঽপি হুংকৃতিমাত্র নিরস্তঃ পদন্তিকে পতিতঃ।
যস্যাশ্চন্দ্রশিখঃ স্মরভল্লনিভো জয়তি সা চণ্ডী॥ (২১ নং পদ)

(২) যা নীয়তে সপত্ন্যা প্রবিশ্য যা বর্জ্জিতা ভুজঙ্গেন।
যমুনায়া ইব তস্যা সখি মলিনং জীবনং মন্যে ॥ (৪৬৩ নং পদ)

প্রভৃতি পদের সহিত, 'মা কি শুধুই শিবের সতী? যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥' (রামপ্রসাদ), অথবা সপত্নী ও ভুজঙ্গের জ্বালায় 'হেমাঙ্গী হইযাছে কালী-বরণ' প্রভৃতি সঙ্গীতের সাদৃশ্য বর্তমান।

প্রকীর্ণ কবিতাবলী ঃ

শাক্ত পদাবলীর অন্যতম উৎস সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলী। এই কবিতাগুলি নাটক, কাব্য ও স্তোত্রাবলীর মধ্যে ছড়ানো ছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার খণ্ড খণ্ড রচনা হিসাবে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের অনেক কবি বৃহৎকাব্য রচনা না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড শ্লোক রচনা করিতেন। এই শ্লোকগুলির মধ্যে জীবনের বহু বিচিত্র সুর বিধৃত রহিয়াছে। নায়কের কথা, নায়িকার কথা—বিরহের কথা, মিলনের কথা—সুখের কথা, দুঃখের কথায় এই শ্লোকগুলি পূর্ণ। প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ইহাতে মুখ্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের অপরাপর আকৃতিও বাদ পড়ে নাই। সরল গ্রাম্য জীবনের আশা কামনা, লৌকিক ঘরোয়া জীবনের আনন্দ-বেদনার অনেক নিগূঢ় সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়। এক কথায় এদেশীয় জীবনযাত্রার সুনীতি ও দুর্নীতি, ধর্ম্মবোধ ও পাপবোধ, মাধুর্য্য ও কারুণ্যের প্রাণময় চিত্র এই প্রকীর্ণ কবিতাবলীর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর মধ্যে লৌকিক ভাবের যে পরিমণ্ডল রহিয়াছে, তাহা এই প্রকীর্ণ কবিতা হইতেই সমাহৃত। রাধাপ্রেমের অতি সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, প্রেমিক প্রেমিকার মান-অভিমান ও নায়ক-নায়িকার সংলাপ বর্ণনায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ যেমন এই কবিতাবলীর দ্বারস্থ হইয়াছেন, শাক্ত কবিগণও তেমনই মেনকার খেদোক্তি, সন্তানের অভিমান, মায়ের উপর তাহার একান্ত নির্ভরতা বর্ণনা করিতে গিয়া ইহা হইতেই ভাব আহরণ করিয়াছেন। উভয়েরই উত্তমর্ণ এক।

প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। অজ্ঞাতনামা কবির 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়', শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'—এই জাতীয় বিখ্যাত সংগ্রহ গ্রন্থ। 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে' বৈষ্ণব প্রেমের প্রাচীন খবর পাওয়া যায়। ইহার বিরহিণী ব্রজ্যার একটী শ্লোকে নায়িকা বলিতেছে,

'মা মুঞ্চাগ্নিমুচঃ করান্ হিমকরং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থীয়তাং।
নিদ্রে মুদ্রয় লোচনে রজনি হে দীর্ঘাতিদীর্ঘোভব ॥'

নবমী রজনীকে দীর্ঘায়ত করিবার জন্য শাক্তপদাবলীতে মা মেনকার যে আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' বৈষ্ণব শ্লোকের সহিত হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রও আছে। শিবের দারিদ্র্য-দুঃখের বর্ণনাগুলির প্রভাব শাক্তপদাবলীতে কম নয়।

'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ছন্দোনিবন্ধে প্রসঙ্গতঃ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—

বালোকুমারো ছয় মুণ্ডধারী।
উবাঅহীনা মুই এক্ক ণারী ॥
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী।
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥

—পদটির মধ্যে গৌরীর গার্হস্থ্য দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। গৌরী বলিতেছেন, ছোট ছেলেটির ছয় মুখ (অর্থাৎ সে ছয় মুখে খায়), আমি উপায়হীনা নারী। স্বামী ভিখারী সারাদিন বিষ খায়, আমার উপায় কি হইবে?

শাক্তপদাবলীতে মা মেনকা নারদের মুখে যে কৈলাস-সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহার ভাব ও ভাষা এই চিত্র হইতে ভিন্ন নয়ঃ

শুনেছি নারদের ঠাঁই গায়ে মাখে ভস্ম ছাই
ভূষণ ভীষণ তার গলে ফণীহার।
একথা কহিব কায় সুধা ত্যজি বিষ খায়
কহ দেখি, এ কোন্ বিচার? (কমলাকান্ত)

'সৎপদ্য রত্নাবলীর' নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাও প্রকীর্ণ কবিতাবলীর একটি আধুনিক সঙ্কলন। কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি হয়তো আধুনিক, কিন্তু কতকগুলি সুপ্রাচীন, 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' বা 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' সমকালীন। ইহাতে দেবী-বিষয়ক যে সংস্কৃত কবিতাগুলি আছে, তাহাতে শাক্তপদাবলীর ভক্তের অনুযোগ, অভিমান ও নির্ভরতার ঐকান্তিক সুরের আভাস পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছিঃ

(১) ত্বামাশ্রিতোঽপি করুণানিধিমন্নপূর্ণাং
ত্রৈলোক্যনাথগৃহিণীং গিরিরাজকন্যাং।

যাচে নিজোদরদরী ভরণার্থমন্যং
হ্রীণাসি নাত্র জননীতি পর বিচিত্রম্ ॥ (সঃ পঃ রঃ—১৩৩)

—তুমি করুণানিধি অন্নপূর্ণা, ত্রিলোকনাথ-গৃহিণী, গিরিরাজের কন্যা। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় করিয়া শিব ভিক্ষা করেন, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না?

ইহার সহিত শাক্তপদাবলীর এই উক্তিটির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

অন্নপূর্ণা নাম শুনি, ভিক্ষা করেন শূলপাণি
পেটের জ্বালায় গরল খেলেন, দিগ্‌বাস বসন বিনা। (মহেন্দ্রনাথ, প্রেমিক)

(২) কা তে কৃপা, ময়ি কৃপা যদি নাস্তি মাত-
দীনবন্ধুরিতি নাম বৃথা বিধৎসে।
মাতা সমস্ত জগতামিতি কিং বৃথাখ্যা
কুত্রাস্তি পুত্রবিমুখা জননী জগৎসু ॥ (সঃ পঃ রঃ—১৪০নং)

—তুমি কৃপাময়ী; আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা না হয়, তাহা হইলে কেমন তোমার কৃপা? তোমার দীনবন্ধু নামও বৃথা। তোমার জগন্মাতা নামও কি বৃথা? জগতে কোথায়ও তো জননী পুত্রের প্রতি বিমুখ হন না।

এই অভিযোগের সহিত শাক্তপদাবলীর অভিযোগের মিল রহিয়াছে। কিন্তু অভিযোগ সত্ত্বেও ভক্তের প্রতীতিঃ

দুর্গা দুর্গেতি বাণী প্রভবতি সহসা যস্য বক্তে্র কদাচিৎ।
কিং কুমস্তস্য ভাং ং প্রমথগণপতি সাবধানস্তদর্থে॥ (সঃ পঃ রঃ ১৩২)

তাই ভক্ত নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া বলেন,

ত্বং নিগ্রহং যদ্যপি পামরেঽস্মিং
তথাপি তন্নাম সদা ব্রবীমি।
মাত্রাপরাধেন নিরাকৃতোঽপি
মামেতি শব্দং স শিশু করোতি॥ (সৎপদ্যরত্নাবলী)

কবিও ঠিক এই সুরেই বলেন,

রামপ্রসাদে এই ভণে দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে
তবু রব মায়ের চরণে।

বৌদ্ধতন্ত্র

বৌদ্ধতন্ত্রেও অসংখ্য দেব-দেবীর পূজামন্ত্র ও ধ্যান রচিত হইয়াছিল। অবশ্য হিন্দু-তন্ত্রের অনুকরণেই বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ দেব-দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

কালক্রমে হিন্দুতন্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধতন্ত্রের বেশি প্রসার ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্রের সেই সমৃদ্ধির যুগে, কতকগুলি নূতন দেবদেবী হিন্দুধর্মেও প্রবেশ লাভ করেন। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, 'Hindu goddesses like Mahachintara, Chinnamasta, Kali etc. were originally Buddhists '[১]

শাক্তপদাবলীতে বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রভাব কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ নয়। এখানকার দেবমূর্ত্তির যাবতীয় কল্পনা, পূজা, ধ্যান হিন্দুতন্ত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে একদিন হিন্দুতন্ত্রও কিয়ৎ পরিমাণে বৌদ্ধতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, অনেক হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হাত পড়িয়াছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে। রাজচ্ছত্রছায়ায় পুষ্টি লাভ করায় ইহাদের প্রভাব যে হিন্দুদের উপর বিস্তৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। (এ সম্পর্কে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য)

বৌদ্ধ একজটা দেবীমূর্ত্তির সহিত হিন্দু 'তারা' মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ডাকিনীর মূর্ত্তি অনেকটা হিন্দু চামুণ্ডার অনুরূপ, ধ্যানেও সাদৃশ্য দেখা যায়, যেমন,

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা তু ত্রিনেত্রা এক বক্ত্রিকা।
দংষ্ট্রারৌদ্র করালীঢ পঞ্চমুদ্রাভিধারিণী॥
শবারূঢা মুক্তকেশা প্রত্যালীঢ পদান্বিতা।
কপালমালিনী ঘোরা দক্ষিণে ডমরু কর্ত্তৃকা॥
বামে কপালখট্বাঙ্গ স্ফুরৎসংহারবিগ্রহী।[২]

বৌদ্ধতন্ত্রের মণ্ডলোদ্বোধক মহাগীত ঃ

বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে মণ্ডল বা চক্রকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি সময়োপোযোগী মহাগীত গান করা হইত। গানগুলির ছন্দ ও সুর অতি মধুর। গানগুলির ভাষা অপভ্রংশ, গীতিমাধুর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ঃ

পরমান্দিজণ্ড মহাসুহ ভাই।
বিহরহ জুইনি চক্কু সহাই॥
অরিবিবি মোহপণ্ড লোঅ ন জাই।
সহজ স্নুন্দরী লই মহাসুহ ঠাই॥[৩]

১. Intro to Sadhan Mala—vol II Dr B Bhattacharjee
২। ডাকার্ণব, তৃতীয় পটল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত) ৩। ডাকার্ণব, ত্রয়োবিংশ পটল।

বৌদ্ধ গান ও দোহা

বজ্রযানী বৌদ্ধগণের রচিত বৌদ্ধতন্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধ সহজিয়া রচিত দোহা ও চর্য্যা পদাবলীর সহিত শাক্তপদাবলীর ভাব ও রূপসাদৃশ্য বেশি। শুষ্ক পাণ্ডিত্য, জপ-হোম-মন্ত্র-মণ্ডলের ব্যাপকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব লইয়াই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের দোহা ও গীতাবলী রচিত হইয়াছিল, শাক্তপদাবলীতেও এই প্রতিবাদের ভাবটি সুস্পষ্ট। এই দিক হইতে শাক্তপদাবলী যেন চর্য্যাগীতিকারই পরিণত রূপ, শাক্ত সাধক যেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের উত্তর সাধক। ভাবের দিক হইতে, সাধনার দিক হইতে, গীতাবলীর রূপের দিক হইতে, এমন কি রূপক-কল্পনার দিক হইতে বৌদ্ধ গান ও দোহার সহিত শাক্তপদাবলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য যেখানে বলেন,

> একু দেব অঙ্গম দীসই।
> অপণু ইচ্ছেঁ ফুড পডিহাসই॥[১]

একই দেবতা বিভিন্ন আগমে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন, নিজের ইচ্ছায় তিনি নানারূপে প্রতিভাসিত হন। শাক্তপদকর্ত্তা সেখানে বলেন,

> প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
> মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥

সিদ্ধাচার্য্যগণ তীর্থিক যোগিগণের তীর্থযাত্রাদি বহিঃকর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন মোহভ্রান্ত জীব ইষ্টলাভের আশা অনর্থক তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু তীর্থ বাহিরে নাই আছে এই দেহে :

> এথু সে সুরসরি জমুণা
> এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
> এথু পআগ বণারসি
> এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥[২]

—এইখানেই সুর-সরিৎ যমুনা, এইখানেই গঙ্গাসাগর, এই দেহেই প্রয়াগ বারাণসী, এইখানেই চন্দ্রসূর্য্য। শাক্তকবিও অনুরূপ সুরেই বলেন,

> তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন, উচাটন করো না রে।
> ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
>
> (রামপ্রসাদ)

১। সরহপাদের দোহা।

চর্য্যা পদাবলী ঃ

চর্য্যাপদে সাধক বলিতেছেন,

কাঅ নাবড়ি খান্টি মন কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল॥
চিঅ থির করি ধরহুরে ণাহী।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥[১]

—দেহ নৌকা, খাঁটি মনকে দাঁড় করিয়া সদ্‌গুরুবচনরূপ হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা চালাও, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া সম্ভব নয়। শাক্ত সাধক সেখানে বলিতেছেন,

মনপবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে॥ (কমলাকান্ত)

অতএব দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধগান ও দোহার সাধন-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গীর সহিত শাক্তপদাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়স্থলেই সাধকগণ সাধনার আচরণীয় কর্ম্ম হিসাবে যোগ-পদ্ধতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধগানের 'ডোম্বী,' 'চণ্ডালী'—শাক্তসঙ্গীতের কুণ্ডলিনী; বৌদ্ধগানের 'শূন্যতা' শাক্তসঙ্গীতের পরমশিব, বৌদ্ধগানের 'সহজানন্দ,' শাক্তসঙ্গীতের পরমানন্দ,—'আনন্দসাগর উথলে'।

সত্য বটে, চর্য্যাগানগুলি বহুদিন পূর্ব্বেই বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া নেপালে, তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, গ্রন্থ হিসাবে চর্য্যাপদ বঙ্গদেশে ছিল না। কিন্তু চর্য্যাপদের ভাব এদেশের লোকের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। অন্তঃসলিলা হইয়া যে ভাব বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙালীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযুক্ত পরিবেশে সেই ভাবধারা হিন্দুভাবে পরিপুষ্ট হইয়া শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে রূপ ধরিয়াছে। এদেশের ধর্ম্মে কর্ম্মে অন্তর্লীন বৌদ্ধভাবকে আজ আর স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী তো বিমিশ্র উপাদানেই গঠিত। কালপ্রবাহে পরিস্রুত হইয়া অজ্ঞাতসারে অথচ একান্ত স্বাভাবিকভাবেই যে বৌদ্ধভাব শাক্ত পদাবলীতে সঞ্চারিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

১। সরহবজ্রের চর্য্যা (চর্য্যা নং ৩৮)

বৈষ্ণবপদাবলী ঃ

শাক্তপদাবলীর অন্যতম উৎস হিসাবে অনেকেই বৈষ্ণবপদাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গানগুলি সম্পর্কেই এই জল্পনা। শাক্তপদাবলীর উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কোন দিক হইতেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না, বরং বৈষ্ণব পদাবলীর কতকগুলি বিভাগে শাক্ত ভাবের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। আমরা এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করিব। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন কবির উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব আছে; সে প্রভাব একান্ত গৌণ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

মঙ্গলকাব্য ঃ

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শিব ও শাক্ত-বিষয়ক মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শাক্তপদাবলীর অঙ্কুর নিহিত আছে। শিবায়ন ও চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যের হরপার্ব্বতীর গার্হস্থ্য দারিদ্র্যের চিত্র, বিবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কার মিশ্রিত হইয়া, শাক্তপদাবলীতে জননী মেনকার অন্তর্বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তপদাবলীর দেব-দুর্লভ লৌকিক ভাবগুলি মধ্যযুগের শিব-শক্তি-বিষয়ক কাব্য হইতেই সমাহৃত। মঙ্গলকাব্যে গৌরীর বিবাহকালে বৃদ্ধ শিবের ভস্মলিপ্ত, জটাধারী, ফণীভূষণ, বাঘাম্বর-পরিহিত মূর্ত্তি দেখিয়া মা মেনকার হৃদয়ে যে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হইয়াছিল, শাক্তপদাবলীতে তাহাই নয়ন-ধারায় পরিণত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে,

> মেনকা ঢালিলা দধি হরের চরণে।
> অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে ॥
> অস্থি ভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর।
> হইয়া বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর ॥
> কান্দযে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
> ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে ॥
> হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ।
> বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা করে বধ ॥[১]

এই ক্ষোভ শাক্তপদাবলীতে মেনকার অশ্রু-কাতর অনুযোগে পরিণত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কাব্যাদিতে 'মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা'; অথবা 'কামিনী কমলে অবতার'—এইরূপ দেবী-মূর্ত্তির বিবিধ বর্ণনা আছে। কালিকামঙ্গল কাব্যে চামুণ্ডার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে :

কাতি কর্পর হাতে মুণ্ডমালা গলে।
শোভা করে সবোবর শ্রবণ মণ্ডলে॥
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান অতি শুষ্ক দেহা।
নিরবধি লহ লহ করে তার জিহ্বা॥
চৌদিকে বেষ্টিত শিবা কবযে গর্জ্জন।
চাঁদ চকোব আঁখি শবে আরোহণ॥[১]

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও 'ভৈরবী ভীষণা ভীমা কেহ ভয়ঙ্কবী' প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তিব বর্ণনা আছে। শাক্তপদাবলীর 'জগজ্জননীর রূপ' নির্ম্মাণে এই বর্ণনাগুলির পবোক্ষ প্রভাব পডিযাছে। তন্ত্র হইতে যাঁহারা মাতৃকাব ধ্যান অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল কাব্য অজ্ঞাত ছিল না।

মঙ্গল কাব্যগুলিতে কতকগুলি সুন্দর বন্দনা গান আছে। 'ঠাকুরাণী বন্দনা' অংশেব এই গানগুলিতে শাক্তপদাবলীর মাতৃস্তোত্রের আভাস পাওয়া যায়। যেমন,

জয় বন্দ্য ভবানি ভব দুঃখ বিনাশিনি
সিংহবাহিনা মহামায়া।
কার্ত্তিকগণের মাতা গিরিরাজ গিরিসুতা
ঈশ্বব-ঘরণী অর্দ্ধকায়া॥
দক্ষিণ চরণমূল রক্তপদ্ম সমতুল
সমলগ্নে সিংহে আরোহণ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধে বামাঙ্গুষ্ঠে লাগিছে মহিষ পৃষ্ঠে
দ্বিজ বংশীদাসের চরণ॥ (দ্বিজ বংশীদাস)

মঙ্গল কাব্যের 'চৌতিশা' স্তবগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রে 'দেবী বর্ণময়ী প্রোক্তা' বলিয়া উক্তি আছে। 'অ হইতে ক্ষ' পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ মাতৃকাবর্ণ। এই বর্ণগুলিকে আদ্যক্ষর করিয়া স্তব রচনার পদ্ধতি তন্ত্রেও দেখা যায়, তাহাতে দেবী আশু তুষ্ট হন। মঙ্গলকাব্যেও এই ধরণের স্তব রচনা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যেমন,

কালী কপালিনী কান্তা কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কন্দমুখী কত জ্ঞান কলা॥

১। কালিকামঙ্গল, বলবাম কবিশেখব।

খেদ খণ্ডন কার খলে কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস ॥
গিরিজা গণেশ-মাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিলে গোপকুলে অবতার ॥…
ঘোররূপা ঘোরতপা ভীষণ-ঘোষণা।
ঘন ঘন কৈলে রণে ঘণ্টার বাজনা ॥[১]

এই প্রকারের নামাবলী-মূলক গান শাক্তপদাবলীতেও অনেক আছে। ব্রজকিশোর রায় ও তৎপুত্র দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের মাতৃ-নামাবলী প্রসিদ্ধ। এইরূপ নাম-স্তোত্র রচনার মূলে 'চৌতিশা' স্তবগুলির প্রভাব-কল্পনা অবান্তর নয়। শাক্তপদাবলীতে জননীর প্রতি স্নেহার্থী সন্তানের অনুযোগের সুরটি প্রধান, মঙ্গল কাব্যের ভক্তের আবেদনে বা গোহারিতে তাহারও ক্ষীণতম আভাস পাওয়া যায়,—

কান্দে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়া ॥…
উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক ॥
সাতপুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জালপাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে ॥[১]

মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উপপ্লবের ফলে মাতৃকা-চরণে শরণ গ্রহণ করার যে সংবেদন দেখা যায়, শাক্তপদাবলীতেও তাহা বর্ত্তমান। বিপন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার আকৃতি লইয়াই মঙ্গল দেবদেবীর কল্পনা ও তাঁহাদের চরণে আশ্রয়লাভের কামনা জাগ্রত হইয়াছিল। শাক্ত সঙ্গীত-সৃষ্টির প্রেরণামূলও সেই অত্যাচার, বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা। তবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তের আকৃতি, কেবল পার্থিব সঙ্কট হইতে মুক্তির আকৃতি, তাঁহাদের ইচ্ছা ঐহিক ঋদ্ধি লাভের ইচ্ছা। পৌরাণিক 'রূপং দেহি জয়ং দেহি,' 'ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে'—এই প্রার্থনাই মঙ্গল-কাব্যের ভক্তের প্রার্থনা। শাক্তপদাবলীর প্রার্থনা মুমুক্ষু ভক্তের প্রার্থনা: 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।' পূজা-প্রচারের আগ্রহে দেবী-মহিমার অপপ্রচার যেমন মঙ্গলকাব্যে আছে, শাক্তপদাবলীতে তাহা নাই। শাক্ত-পদাবলীর দেবীর পূজা-প্রচারের প্রয়োজন নাই, পূজ্যারূপেই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। এই জন্য মঙ্গলকাব্যে যেমন মুহুর্মুহু তিনি ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন,

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

শাক্তপদাবলীতে তেমনই তিনি অলক্ষ্যচারিণী হইয়া থাকিয়াছেন। শাক্তপদাবলীতে দেবী যোগগম্যা: 'তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন।' কেবল আগমনী ও বিজয়ার গানে তিনি প্রত্যক্ষ কন্যা।

শাক্তসঙ্গীতের অনুরূপ সঙ্গীত

মঙ্গল-কাব্য কাহিনী-কাব্য। ইহাদের মধ্যে শক্তি-বিষয়ক যে সকল পদ আছে, তাহা শাক্তপদাবলীর গানের মত নয়। শাক্তপদাবলী বিশেষ করিয়া গানের জন্যই রচিত; ইহাদের ভাব ও রূপ সংহত। প্রাদেশিক ভাষায় এমন কি বাঙলা ভাষাতেও এইরূপ গান পাওয়া যাইতেছে। বিখ্যাত গায়ক বৈজু বাওয়া ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দীনের সভাসদ। তিনি বিবিধ বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতও পাওয়া যায়, যথা:

জৈ কালা কল্যাণী খপ্রধারিণী
গিরিজা ঘনশ্যামা চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্রধারিণী।
জগজ্জননী জ্বালামুখী আদি
জ্যোত্ অনন্তা দেবী অন্নপূর্ণা আনন্দীতবণতারিণী ॥
যোগিনী জয় রক্ষাকারিণী।
বিন্ধ্য-বাসিনী ললিতা বহুচরা ভবানী
অসুরদলনী মহিষাসুর-মারণী।
হিমগিরি হিঙ্গুলাজ রাণী কাশ্মীরী সারদা কামরূপ-
কামাখ্যা-কুলজা বৈজু ভক্ত-সুখকারিণী ॥[১]

সম্রাট আকবরের রাজ-সভার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক মিঞা তানসেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে শাক্তগীতিও আছে:

আনন্দে জগবন্দে ত্রিপুরাসুন্দরী
মাত ভবানী দয়ানী দয়া রাখিযো সোধে বাণী।
ধন্য ধন্য শঙ্করী শিবানী।
সর্ব্বকলাময়ী দয়া কর মুণ্ডমালিনী ॥
তু মা সর্ব্বসংহারিণী শুম্ভনিশুম্ভ বিদারিণী
রক্তবীজ মারণী আদ্যাশক্তি রক্তোৎপলনিবাসিনী ॥
ধ্যায়াও তে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-দিক্‌পাল সনকাদি ঋষিগণ
তানসেন গাওয়ে তব গুণ বেদ-বাখানী ॥[১]

১। সঙ্গীত-সারসংগ্রহ (দ্বিতীয় ভাগ)

॥ সাত ॥

শাক্তপদাবলীর বিষয়-বিভাগ

শাক্তপদাবলীর বিষয়-বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৭) সঙ্কলন গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করা হইল। আলোচ্য 'শাক্তপদাবলী'র কলনখানিতে সমগ্র বিষয়বস্তুকে কয়েকটি শীর্ষনামে বিভক্ত করা হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড বে বিচার করিলে নামগুলির সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না।

'বাল্যলীলা'য় জগজ্জননীর বাল্যচপলতা, অপরূপ রূপ, ও তৎসহ মায়ের বাৎসল্য ঘাটিত হইয়াছে। 'আগমনী' গানগুলির মধ্যে কন্যার আগমন উপলক্ষ্য করিয়া ননীর স্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, ব্যাকুলতা, [illegible] প্রতি মেনকার অনুযোগ, আকাজ্ক্ষা [illegible] ন্যার আগমনে [illegible] আনন্দ-তন্ময়তা বর্ণিত হইয়াছে। 'বিজয়া' পদাবলীতে কন্যার [illegible]-যাত্রার প্রসঙ্গ লইয়া মায়ের আশঙ্কা, ভাবী ও ভবন্ বিরহের 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল চ্ছেদ ক্রন্দন' ধ্বনিত হইয়াছে।

'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ে জগন্মাতার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ, তাঁহার ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থার [illegible] বর্ণনা করা হইয়াছে। নামকরণটি সার্থক। কিন্তু 'মা কি ও কেমন' শীর্ষ-নামের র্থকতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যেও জগজ্জননীর স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ এবং াহার তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। একই শক্তি যে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লীলা করিয়া কেন, তাহা 'জগজ্জননীর রূপ' পদাবলীর পর্যায়েই পড়ে।

'ভক্তের আকূতি' শীর্ষনামের স্বতন্ত্র প্রয়োজন আছে। ভক্তের আশা-কামনার ধায় ইহা পূর্ণ। শাক্ত সাধক কি চায়, কেন সেই চাওয়া সফল হয় না, তাহার কথা নুপুঙ্খরূপে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পদাবলীর মধ্যে বদ্ধ জীবের মুক্তি-াকাঙ্ক্ষা বড় করুণ-সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। [illegible] প্রতি অনুযোগ ও তাঁহার উপর কান্ত নির্ভরতার আবেদনটিও হৃদয়গ্রাহী। শরণাগতির আকাঙ্ক্ষাই 'ভক্তের আকূতি'র ধান সুর। ইহা সাধনার অন্যতম সোপান, এই সোপান অতিক্রম করিয়া সাধনা-র্গে অগ্রসর হইতে হয়। 'ভক্তের আকূতি' নামকরণটি সুনির্বাচিত এবং ভক্তের চিত্র অভিলাষের রূপায়ণ হিসাবে ইহা সার্থক।

'মনোদীক্ষা' পর্যায়ের কবিতাবলী তান্ত্রিক দীক্ষা-প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। দীক্ষা ক্তকে সাধন-ক্রিয়ায় অধিকার প্রদান করে। কিন্তু এই দীক্ষা কাহার? দেহের'

না মনের? শক্তি-সাধকগণের মতে মনোদীক্ষাই প্রধান প্রয়োজন। ভক্তিই বল, আর সাধনাই বলি, সকলেরই কর্তা মন। মনই জীবকে বদ্ধ করে, ইহাই আবার তাহাকে মুক্তিলাভে সহায়তা করে। এই চঞ্চল মনকে বুঝাইয়া মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করাই দীক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। 'মনোদীক্ষা' অংশে, মনের উদ্দেশ্যে সেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

'ইচ্ছাময়ী মা', 'লীলাময়ী মা', 'করুণাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা' নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে জগজ্জননীর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ক্রিয়া ও অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলি প্রকৃত পক্ষে 'জগজ্জননীর রূপ' পর্য্যায়ের উপাবভাগ মাত্র, কারণ গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)।

'মাতৃ-পূজা'য় মায়ের প্রকৃত পূজা কি, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে; ইহা সাধন-অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। 'সাধন-শক্তি'র মধ্যে শক্তি-সাধকের সিদ্ধি ও বিভূতির কথা আছে, এই বিভূতি বা শক্তি করায়ত্ত করাই সাধকের লক্ষ্য। 'নাম-মহিমা' ও 'চরণ-তীর্থ' শীর্ষনামের মধ্যেই বর্ণনীয় বিষয়ের আভাস আছে, এগুলি "ভক্তের আকূতি' পর্য্যায়েই পড়ে। কোন কোন পদ 'মনোদীক্ষা'রও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এতগুলি স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত হইলেও বস্তুতঃ সংখ্যাহীন শ্যামাসঙ্গীতের মূলভাব বা বিষয় অনেকগুলি নয়। একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন কবির ভাষায় বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে, একই কবি একই ভাবের একাধিক পদ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে একাধিক কবি একই ধরনের পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা পর্য্যন্ত এক। এই এক বিষয়াত্মক বাতিক (monomania) অবশ্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেরই বিশিষ্টতা। শাক্তপদাবলীও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি দুর্লভ নয়। এই জন্য অনেক উপবিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষনামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শাক্তপদাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। আলোচ্য সঙ্কলন-গ্রন্থখানিতেও দেখা যায়, ভাবের দিক হইতে পদগুলি একরূপ হইলেও, একই ধরনের পদ ভিন্ন শীর্ষনামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'জগজ্জননীর রূপ' অংশে কবি গাহিলেন,

'আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে
কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে।

আবার 'মা কি ও কেমন' পর্য্যায়েও একই ভাবের পদ পাওয়া যাইতেছে,—

'কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।'

'ইচ্ছাময়ী মা' অংশে কবি গাহিতেছেন, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি', 'কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী'। আবার 'মা কি ও কেমন' অংশেও তাহারই পুনরাবৃত্তি :—

ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর অতুল ধনের অধিকারী।
কারে করেছ পথের কাঙাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী ॥

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ শাক্তপদাবলী হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 'চরণ-তীর্থ' পদাবলীর কয়েকটি পদ যেমন 'মনোদীক্ষার' অন্তর্ভুক্ত করিলে ক্ষতি হয় না, আবার 'নাম-মহিমার' পদও 'ভক্তের আকূতি'র পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ, শাক্তপদাবলীতে একই মাতৃকা-শক্তির বিচিত্র লীলা, সেই শক্তির তত্ত্ব এবং তাঁহার সাধন-পদ্ধতির কথাই নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে, নানা রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সকল গানকে পৃথক পৃথক রস অনুযায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাধক অথবা কবিগণ রচনা করেন নাই। ভক্তের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই ভাব লইয়াই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। অনেকগুলি সূক্ষ্মবিভাগ না করিয়া স্থূলভাবে শাক্ত-পদাবলীর বিষয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করিলে ভাল হয় : (১) লীলাপর্ব্ব, (২) উপাস্যতত্ত্ব, ও (৩) উপাসনাতত্ত্ব। শাক্তপদাবলীর অসংখ্য পদ এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত।

শাক্তপদাবলীর স্থূল বস্তু-বিভাগ

লীলাপর্ব্ব : কাব্য ও পুরাণের বহু স্থলে জগজ্জননীর লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই লীলাগুলির মধ্যে হিমালয় ও মেনকার গৃহে উমারূপে দেবীর যে লীলা, তাহা সুন্দর মানবীয়ভাবে পূর্ণ। লীলাংশ লইয়া অনেক কবি পদ রচনা করিয়াছেন। 'বাল্য-লীলা', 'আগমনী ও 'বিজয়া'র গানগুলি লীলা-পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত।

উপাস্যতত্ত্ব : শাক্ত সাধকের উপাস্য শক্তিদেবী ; এই শক্তিই দৈত্যবধের জন্য ও সাধকের সুবিধার জন্য গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। শাক্ত সঙ্গীতের বহু পদে এই উপাস্যের তত্ত্ব, রূপ ও গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে—এইগুলি উপাস্য-তত্ত্ব-মূলক গান। 'জগজ্জননীর রূপ', 'মা কি ও কেমন', 'ইচ্ছাময়ী মা', 'লীলাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'করুণাময়ী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা'—শীর্ষনামাঙ্কিত পদগুলি উপাস্য-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

উপাসনাতত্ত্ব : শাক্ত-সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ গান সাধন-তত্ত্বের গান। এই গানগুলিতে শক্তি-আরাধনার ক্রম ও উপায় বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি জগতের

নিয়ন্ত্রীশক্তি, যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, যাঁহার কৃপা ভক্তের কাম্য, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে কি প্রকারে? সাধন-ক্রিয়াই শক্তি-সাধকের প্রধান অবলম্বন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন উপাস্যের প্রতি সুতীব্র শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয়ে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, মায়ের প্রতি একান্ত নির্ভরতার ভাব জাগ্রত হয়। 'ভক্তের আকৃতি'ই ভক্তকে 'নাম-মহিমা'য় উদ্দীপ্ত করে, মায়ের 'চরণতীর্থে'র প্রতি অচলা মতি জন্মায়। এই সুতীব্র আগ্রহ হইলে আসে 'দীক্ষা'র কথা। দীক্ষা না হইলে শক্তি সাধনার অধিকার জন্মে না। দিব্যমন্ত্রীর দীক্ষা সাধারণতঃ মনোদীক্ষা। এই 'মনোদীক্ষা'র কথা অনেকগুলি সঙ্গীতে প্রকাশ করা হইয়াছে। দীক্ষার পরে মাতৃপূজার অধিকারলাভ হয়। 'মাতৃপূজা'য় পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ সাধনা হইতেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে শক্তি অর্জ্জন করেন, তাহাই 'সাধন-শক্তি'। অতএব আলোচ্য শাক্তপদাবলীর ভক্তের আকৃতি, [illegible], [illegible], [illegible], মাতৃপূজা ও সাধন-শক্তি পর্য্যায়ের গান [illegible]সনা-তত্ত্ব বিষয়ক।

অবশ্য শাক্তপদাবলীর অধিকাংশ পদেই লীলা ও তত্ত্বের কথা ওতপ্রোত। লী- অংশও সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ব-বিবহিত নয়। 'আগমনী' অংশেও উমা যে চৈতন্যরূপিণী, তিনিই যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বন্দিতা জগজ্জননী, তাহার আভাস আছে, আবার তত্ত্ব অংশেও লীলা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শাক্তপদাবলী লীলা ও তত্ত্বের যুগনদ্ধ সঙ্গীত মূর্ত্তি। কেবল আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এইরূপ স্থূল বিষয়-বিভাগ স্বীকার করিয়া লইতেছি।

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

উপাস্যতত্ত্ব

।। এক ।।

শক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথা

শাক্তপদাবলীর বহু কবিতায় শাক্তের উপাস্য দেবীর তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দার্শনিক মতবাদ প্রচার করা ইহাদের উদ্দেশ্য না হইলেও শাক্ত সঙ্গীত শক্তিতত্ত্বের নির্যাস লইয়াই রচিত। বিশেষ করিয়া 'ব্রহ্মময়ী মা,' 'মা কি ও কেমন,' 'ইচ্ছাময়ী মা,' 'লীলাময়ী মা,' 'করুণাময়ী মা,' 'কালভয়হারিণী মা' ও 'জগজ্জননীর রূপ' নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে শক্তি দেবীর স্বরূপ, গুণ ও স্থূল রূপ—এক কথায় শাক্তের উপাস্যতত্ত্বের যাবতীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাব্য হিসাবে তাদের রস-বিচার আমরা পরে করিব, তত্ত্বের প্রকাশ ইহাতে কিরূপ হইয়াছে, তাহার আলোচনা প্রথমে করা যাইতেছে।

বেদে, দর্শনে ও পুরাণে শক্তিতত্ত্বের আভাস :

বেদে, দর্শনে, পুরাণেও শক্তিতত্ত্বের আভাস আছে; কিন্তু শক্তিতত্ত্বের মূল উৎস আগম-নিগম শাক্ত আগম গ্রন্থ। এগুলি তন্ত্রশাস্ত্র নামে পরিচিত। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত বৈদিক সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র কেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বলিয়া যে দেবতার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ হবি নিবেদন করিয়াছেন, তিনি পুরুষ। নারী এই পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী, অপ্রধান। পুরুষই পরম কারণ, তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা, প্রজাপতি। উপনিষদের 'ব্রহ্মপুরুষ'—সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

বেদান্তসূত্রও ব্রহ্মপ্রতিপাদক। 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' করিতে গিয়া সূত্রকার প্রসঙ্গতঃ 'মায়া'র উল্লেখ করিয়াছেন। এই মায়া জড়, মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—জগৎ মিথ্যা। 'মায়য়া কল্পিতং জগৎ'—অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত মায়া ও জগতের কল্পনা ভ্রান্ত। ব্রহ্ম নিরুপাধি, নির্গুণ। মায়াকে আশ্রয় করিয়া তিনি সগুণ হন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা। অতএব বেদান্তে (অদ্বৈতসিদ্ধান্ত মতে) পুরুষই এক ও অদ্বিতীয়, 'মায়া' মিথ্যা কল্পনামাত্র।

কপিলমুনি প্রণীত সাংখ্য দর্শনে 'প্রকৃতি' এক স্বতন্ত্র সত্তা। পুরুষ ও প্রকৃতি দুই পৃথক তত্ত্ব। সাংখ্যে পুরুষ হইতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। পুরুষ এখানে সাক্ষী, উদাসীন, অকর্তা, তবে তিনি ভোক্তা। প্রকৃতিই এখানে 'প্রধান,' 'বাস্তব'। মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের তিনিই মূল এবং পরিচালিকা। তিনিই কর্ত্রী, সৃষ্টির নিয়ন্ত্রী। কিন্তু সাংখ্যে প্রকৃতির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইলেও, প্রকৃতি জড়শক্তিমাত্র। ইনি 'অচিৎ', এক অন্ধ শক্তি। তন্ত্রের 'চিন্মাত্র' মহাশক্তি হইতে ইনি পৃথক।

পুরাণে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিমা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তি। পুরাণের দেব-প্রকৃতি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হইলেও পুরাণে শক্তির ক্ষমতা অল্প নয়। স্ত্রী-কারণবাদী পুরাণে তো বটেই, পুরুষ-কারণবাদী পুরাণেও প্রকৃতিই পুরুষ-শক্তি। দেবীই বিষ্ণুমায় (বৈষ্ণবী শক্তি), ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মার শক্তি) এবং মাহেশ্বরী (মহেশ্বরের শক্তি)। তবে, পুরুষ-প্রধান পুরাণে পুরুষেরই স্রষ্টৃত্ব ও কর্তৃত্ব, শক্তি তাঁহার অনুগামী। সৃষ্টির বিষয়ে এই পুরুষ-প্রাধান্যই পুরুষ-কারণবাদী বেদ, ব্রাহ্মণ বেদান্ত এবং পুরাণের শেষ সিদ্ধান্ত: In the majority of legends, Prajapati is indeed the only creator, from whom the world and beings derive their origin[১]

কিন্তু শাক্তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহার বিপরীত। তন্ত্রে মাতৃকাশক্তিরই প্রাধান্য। বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন স্থলে কিংবা পুরাণে মাতৃকাদেবীর অপ্রতিহত প্রভাব দেখা যায়। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে (১০।১০।১২৫) দেবীই সকল সৃষ্টির মূল, তিনিই রাষ্ট্রী (ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী)। স্ত্রী-কারণবাদী উপনিষদে (ত্রিপুরোপনিষৎ) তিনি 'বিশ্বচর্ষণি'— বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী। মাতৃ-প্রধান পুরাণগুলিতেও (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, দেবী-ভাগবত) শক্তিদেবীর সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল স্থলে দেবীই পরম কারণ, 'মহামায়া মলভৃতা' (কালিকা পুরাণ, ৭৪ অঃ)।

স্বরূপতঃ পরাশক্তিই যে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী, এ সিদ্ধান্তও পুরাণে পাওয়া যায়। হিমালয়ের কন্যারূপে যখন তিনি হিমগৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন পিতা হিমরাজ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি? দেবী কহিলেন,

অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসংবিৎ পর-ব্রহ্মৈক নামকম্॥[২]

১। A Hist. of Indian Lit Vol I—Winternitz
২। দেবী ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ

—হে গিরিরাজ, সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম। চিৎ-সংবিৎ স্বরূপ পর-ব্রহ্ম আমারই নাম।

দেবী যেমন ব্রহ্মরূপিণী, তেমনই আবার তিনি বহুরূপধারিণী—'তস্যাঃ প্রপঞ্চরূপৈস্তু বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি'। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায়, ভগবতীর বহু শক্তির বিকাশ দেখিয়া শুম্ভাসুর বলিতেছে, হে বলদর্পিতা দুর্গা, তুমি অন্য শক্তির সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহাতে আর কৃতিত্ব কি? 'মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ'—হে দুর্গে, তুমি গর্ব্ব করিও না। দেবী তখন উত্তর করিয়াছিলেন,

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ॥[১]

—এ জগতে আমি একা মাত্র বিরাজিতা, আমা ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? এই কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল, সমস্ত শক্তিরূপা বিভূতি—ব্রাহ্মী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা—দেবীর দেহে বিলীন হইয়া গেলেন।

তন্ত্রের শক্তি-তত্ত্ব

মাতৃকাশক্তির এই পরম কারণত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব লইয়াই তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিদেবীই 'আদ্যা', 'অদ্বিতীয়া', 'অক্ষরা', 'পুরাণী',। তিনিই সচ্চিদানন্দরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী, 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ-সিদ্ধা' (রুদ্রযামল, ৪৭ পটল), তিনিই সগুণ ঈশ্বরী—'সা শক্তিস্বরূপা সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র), তিনিই মহাবিদ্যা—'মহাবিদ্যাং মহামায়া মহাযোগেশ্বরী পরাং' (কালীতন্ত্র, ১ম পটল); তিনিই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। শাক্তমতে শক্তিরই একাধিপত্য, তিনি মহাসম্রাজ্ঞী: The Great Sakti, the Great Mother, the Goddess, who inspite of her countless names (Durga, Kali, Chanda etc.) is only one, the one Highest Queen (Parameswari)[২]

নিখিল জগতের মূলে এক অচিন্ত্য শক্তির লীলা দেখিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছিলেন, An infinite and eternal Energy from which proceeds everything: তান্ত্রিক সাধকও বলেন, বিশ্বভুবনে ও বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তির লীলা চলিতেছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস হইতেই বিশ্বের যাবতীয়

১। শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০ অধ্যায়।

২। A Hist. of Indian Lit Vol I—Winternitz.

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির বিকাশ : জড়ে ও জীবনে এই শক্তির লীলা। এই শক্তিই তাপ ও আলো, এই শক্তিই নাদ বা শব্দ, অবস্থাভেদে ইহাই স্থিতিশীল ও গতিশীল (Static & Dynamic), এক কথায় সৃষ্টির যাহা কিছু, সবই তিনি।

মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥[১]

এই মহাশক্তি এক অব্যক্ত পরা অবস্থা হইতে কি ভাবে স্থূল বিশ্বে অবতীর্ণ হইতেছেন, কি ভাবে চিদ্‌ঘন আনন্দস্বরূপ ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বহির্বিশ্বে প্রকট হইতেছেন, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। শাক্তমতে যে ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা এই মহাশক্তিরই বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশতত্ত্ব—'একৈব শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী, বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদিতত্ত্বরূপিণী।' শক্তির এই প্রকাশের বিশ্লেষণ বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায় কাশ্মীরী শৈবদর্শনের মধ্যে। তাহাতে এই ছত্রিশটি তত্ত্ব শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন ভাগে বিভক্ত (১) পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, (২) সাতটি শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব—মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা (অবিদ্যা), রাগ ও পুরুষ এবং (৩) চব্বিশটি অশুদ্ধ তত্ত্ব'—প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার মন, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ শব্দ, স্পর্শ), দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা ও ত্বক এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম্)।

বাঙলাদেশে যে তন্ত্রগ্রন্থ ও তান্ত্রিক নিবন্ধগুলি প্রচলিত আছে (যেমন—কুলার্ণবতন্ত্র মহানির্বাণতন্ত্র, তন্ত্রসার, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী ইত্যাদি), তাহাতে শক্তিতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। এদেশে দর্শনের আলোচনা অপেক্ষা ক্রিয়া (সাধনা) এবং চর্য্যার (আচার-আচরণ) উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়ামূলক (Practical) এবং ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সাধারণ লোকের জন্য—যাহারা 'স্বল্পায়ুর্মন্দ-মতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ' (মহানির্বাণতন্ত্র)। তাহাদের নিকট দার্শনিক আলোচনা হইতে ক্রিয়াই প্রধান। মনে হয়, শক্তিতত্ত্বের এইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতগণের যোজনা। আদৌ ইহাতে সূক্ষ্ম কোন দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না।

১। মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস।

তথাপি এদেশে প্রচলিত সাধন-ক্রিয়ার মধ্যেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সুসূক্ষ্ম নিগূঢ় শক্তিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। সামগ্রিক ভাবে শক্তির প্রকাশকে বুঝিতে হইলে উহা জানা আবশ্যক। তাই নিম্নে সংক্ষেপে শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইল।

শিব ও শক্তি (শিব-শক্তি) ঃ

সৃষ্টির মধ্যে স্থূলরূপে প্রকট যে শক্তি অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়াদির অগম্য, বোধাতীত। শক্তি একই আধারে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক (Transcendent and Immanent), নিরাকারা ও সাকারা ('সাকারাঽপি নিরাকারা'—মহানির্ব্বাণতন্ত্র)। এইখানেই শক্তিতত্ত্বের অভিনবত্ব ও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত। বেদান্তে বা সাংখ্যে 'মায়া' কিংবা প্রকৃতির নির্বিশেষ রূপ নাই। বেদান্তে যে নিষ্কল ব্রহ্ম বা পরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি নিষ্ক্রিয। সাংখ্যের পুরুষও নির্বিকার, তাঁহার ইচ্ছা, ক্রিয়া কিছুই নাই। তন্ত্রেও যে পরম শিবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বিকাররহিত, সাক্ষী—'বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ' (প্রয়োগসার)। কিন্তু তন্ত্রমতে শিব পরম শান্ত, পরিস্পন্দহীন হইলেও অতি সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল। এই অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন বা ক্রিয়া স্থূলবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব যে আছে, তাহার প্রমাণ সৃষ্টির মধ্যে এই শক্তিস্পন্দনের প্রকাশ। শাক্তমতে—'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। শক্তি ছাড়া শিব নাই, শিব ছাড়া শক্তি নাই। 'চন্দ্র-চন্দ্রিকয়ো যথা', তেমনই শিব-শক্তি অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। শিবাবস্থায় শক্তি শিবের সহিত 'অবিনাভাবে' যুক্ত থাকেন, যেন তিলের মধ্যে তেল। তখন এই শক্তিও শিবের মত স্পন্দহীন, পরম শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব, বিকাররহিত—'অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিঃ' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। এ অবস্থায় শিবের সহিত শক্তির কোন প্রভেদ নাই। শাক্তের শক্তিতত্ত্বের ইহাই আদিস্তর। ইহাই তন্ত্রের অদ্বৈত তত্ত্ব। অদ্বৈত অর্থাৎ 'শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈত'। এই তত্ত্ব নিত্য অক্ষয়, অক্ষর ; ইহা নির্বিকল্প, নিরুপাধি , ইহা বর্ণাতীত, বর্ণনাতীত—'ন গুণেষু ন ভূতেষু বিশেষেণ ব্যবস্থিতা' (প্রপঞ্চসারতন্ত্র)। ইহা 'তত্ত্বসংজ্ঞা' মাত্র। ইহা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়—আবার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই। এই নিত্য বস্তুটি যে কিরূপ, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার সাধ্যও কাহারও নাই অর্থাৎ তাহা 'অপ্রতর্ক্য'—Beyond all human conception and discussion (Arthur Avalon). মহাশক্তির এই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি অবস্থাই তাঁহার ব্রহ্মময়ী অবস্থা অর্থাৎ পরমশিবের অবস্থা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব অতি সহজ ভাষায় তন্ত্রের এই দুরূহ, দুরধিগম্য তত্ত্বটিকে বুঝাইতেন, তিনি বলিতেন, 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না; সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্য রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।'[১]

অদ্বৈত সত্তার সহিত অভেদে যুক্ত এই শক্তি হইতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টির উন্মেষ। শক্তির কার্যকরী ক্ষমতা থাকিলেও পরা অবস্থায় 'পরা শক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা' (বায়বীয় সংহিতা)—তখন শক্তি শিবের অন্তর্লীন। তখন সৃষ্টি নাই, শক্তির সঞ্চরণ নাই। এ অবস্থায় শিব ও শক্তি যেন নিত্য লীলারত, আনন্দমগনা—'শক্তিঃ শক্তিমৎ-সামরস্যাত্মা', 'নিত্যা নন্দাভিধানম্'। বাইরে পরম শান্ত, নিস্পন্দ, নির্বিকল্প, নির্বিশেষ।

প্রসুপ্তা, অন্তর্লীন শক্তির জাগরণ হেতু শান্ত চিদ্‌ঘন সত্তা অতি সূক্ষ্মভাবে পরিস্পন্দিত হয়। তন্ত্রমতে সৃষ্টির যাবতীয় প্রকাশ শক্তির। শিব শান্ত, শক্তিই তাঁহার ক্রিয়া ও প্রকাশ; 'Tantras apparently lay emphasis upon the dynamic principle, Sakti, which is integrally connected with Siva...Sakti is the moving principle and Siva is calm.'[২] এইজন্য তন্ত্রে এই শক্তিকে বলা হয় মহাশক্তি—'আদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। তন্ত্রোক্ত যাবতীয় তত্ত্ব এই শক্তি হইতেই উদ্ভূত।

নাদ ও বিন্দু :

মহাশক্তি যখন স্থির, নিষ্কম্প—তখন সৃষ্টি নাই, তখন পরম শিবের অবস্থা শান্ত, নিষ্ক্রিয়, মৃতবৎ, জড়পদার্থের অনুরূপ। শক্তির প্রথম স্ফুরণে শান্ত শিব অতি সূক্ষ্মভাবে স্পন্দিত হন, তখন যেন তিনি নিজের মধ্যেই নিজের চৈতন্যরূপ দেখেন। ইহা পরম শান্ত সত্তার 'পূর্ণাহন্তা' অবস্থা, শক্তির প্রাথমিক অতি সূক্ষ্ম উন্মেষ। ইহা নির্বিশেষের প্রথম সবিশেষত্ব। বাইরে প্রকাশহীন, অন্তরে স্বাত্মানন্দে বিভোর। শক্তি-বিশিষ্ট শিবের শক্তির প্রথম প্রকাশ বলিয়া ইহাকে বলা হয় শক্তিতত্ত্ব।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
২। Eastern Lights—Dr. Mohendranath Sircar.

এই শক্তি হইতে অতি সূক্ষ্ম 'পরানাদ'-এর উৎপত্তি হয়। ইহা স্বল্প পরিস্পন্দিত; নাদ স্পন্দনাত্মক। তাই নাদ প্রভাস্বর (Light) এবং ধ্বনি (Sound); স্পন্দনই দীপ্তি, স্পন্দনই ধ্বনি। সুসূক্ষ্ম জ্যোতি বা ধ্বনির আকারেই শক্তির অতি প্রাথমিক বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটে। কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে শক্তি হইতে 'বিন্দু'র উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য্য লক্ষণ দেশিকার 'শারদাতিলক' গ্রন্থে, শক্তিতত্ত্বের পরেই নাদের কথা বলা হইয়াছে। নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি। তিনি বলিয়াছেন, সচ্চিদানন্দবিভব স-কল পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি ঃ—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ ॥[১]

এই নাদ অতি সূক্ষ্ম, ইহাতে স্থূল কোন সৃষ্টিই নাই। ইহা অপ্রাকৃত, অব্যক্ত—সূক্ষ্ম, শুদ্ধ, নির্মল—অ-শ্রুত এক ছন্দ-স্পন্দন। সূক্ষ্ম ধ্বন্যাত্মক এই নাদের ঘনীভূত অবস্থা 'বিন্দু'। শক্তি যেন 'বিচিকীর্ষু' হইয়া বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়ঃ 'বিচিকীর্ষুর্ঘনীভূতা ক্বচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্।'[২] ইহা স্থূল বিন্দু নয়, অব্যক্ত মহাবিন্দু। ইহাতে শক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল হইলেও এ অবস্থাতেও প্রাকৃত সৃষ্টি নাই। প্রাকৃত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ইহা এক অপ্রাকৃত সৃষ্টির অবস্থা, যেন 'সৃজতি আত্মানমাত্মনা'। কিন্তু বিন্দু স্থূল প্রকাশ না হইলেও স্থূল সৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ। বিন্দুকে 'হংস'ও বলা হয়ঃ 'হং' শিবরূপী পুরুষ, 'সঃ' শক্তি। হংসরূপী বিন্দু যেন রমণানন্দে বিভোর শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা, কিন্তু পরা অবস্থা হইতে অনেকটা সঙ্কুচিত এবং সৃষ্টির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। 'অবিনাভাবলক্ষণা' এবং 'চিদ্রূপিণী শক্তি এখানে 'বিবর্তেচ্ছা সমন্বিতা'।

এই বিন্দু ত্রিধা বিভক্ত হইয়া স্থূল বিন্দু, নাদ ও বীজে রূপান্তরিত হয়। এই বিন্দু শিবাত্মক, নাদে শক্তির সঞ্চার অধিক এবং বীজ উভয়াত্মক। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম স্পন্দনে অভিব্যক্ত শিব-শক্ত্যাত্মক পরা বিন্দু 'কাল' সান্নিধ্যে বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ বিন্দু, নাদ ও বীজ হয়। শাক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই 'কাল'ও নিত্য, ইহা শিবেরই রূপভেদ মাত্র। এই কালের সন্নিধানে পরাবিন্দু হইতে স্থূল বীজের উৎপত্তি।

১। শারদাতিলক প্রথম পটল।
২। প্রপঞ্চসারতন্ত্র, প্রথম পটল।

শব্দব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী ঃ

বিন্দু বিদীর্ণ হইবার সময় যে অব্যক্ত রব উত্থিত হয়, তাহাকে 'শব্দ ব্রহ্ম' বলে। শব্দ-ব্রহ্ম স্থূল সৃষ্টিতে প্রকট বিন্দু, নাদ ও বীজেরই প্রতীক—ইহা বিন্দু-বীজ-নাদাত্মক। স্থূল সৃষ্টির মধ্যে শব্দব্রহ্ম রূপেই শক্তির প্রকাশ ঘটে। ইহাই শব্দার্থের প্রকাশক। এই শব্দব্রহ্ম কুলকুণ্ডলিনীরূপে জীবদেহে অবস্থান করেন।

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোহভবৎ ॥
তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিণাং দেহমধ্যগম্ ॥
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ ॥[১]

কুণ্ডলিনী মহাশক্তি হইতে অভিন্না। শক্তির সঙ্কুচিত রূপটিই কুণ্ডলিনীর রূপ। এইজন্য ইহা জটপাকানো অর্থাৎ কুণ্ডলীভূত। ইহা সার্দ্ধত্রিবৃত্তাবৃতি ও ভুজগাকার। সুষুম্না নাড়ীর অঙ্গভূত ছিদ্রে, দেহস্থ আধারকমলে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন পূর্বক ইনি অবস্থান করেন। ইনি প্রসুপ্তা। এই অবস্থায় তাঁহার যে শ্বাসোচ্ছ্বাস, তাহাই জীবের জীবনপ্রবাহ—'শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্যতে' (ষট্‌চক্রনিরূপণ)। প্রসুপ্ত অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে মত্ত অলির মত যে অস্ফুট সুমধুর গুঞ্জন উত্থিত হয়, তাহাই বর্ণাত্মক কাব্য। কুণ্ডলিনী 'পরংব্রহ্মরূপিণী', ইনি 'নিত্যানন্দ পীযূষধারাধরা', ইনি একদিকে 'অঘটনঘটন পটীয়সী' 'অতি কুশলা'—শিব ও জীবকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখেন, তেমনই আবার ইনি অন্যদিকে জ্ঞানরূপা—'নিত্য প্রবোধোদয়া'। এই কুণ্ডলিনী দেহস্থ পদ্মের দলে দলে ছন্দে ছন্দে বিরাজমানা। ইনিই নাদের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী রূপে প্রকাশিতা হন। অপরূপ ইহার রূপমাধুর্য অদ্ভুত শক্তি। সাধক যোগী স্বদেহে ইঁহাকেই ধ্যান করেন, আধারকমলে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক সহস্রার কমলে পরম শিবের সহিত মেলন করেন। ইহাই তান্ত্রিক যোগ এবং এই যোগে সিদ্ধ হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি।

সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা ঃ

বিন্দুরূপিণী শক্তি হইতে 'সদাশিব' তত্ত্বের উৎপত্তি। পরম শিবের যে মায়াচ্ছাদিত রূপ, তাহাই সদাশিব। 'জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ'—ইহা 'পূর্ণাহন্তা'র 'ইদন্তা' রূপে প্রকাশ। সদাশিব হইতে 'ঈশ্বর' অর্থাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা।

১। শারদাতিলক, ১।১১,১৪

প্রাকৃত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ইঁহাদের অবস্থান—জ্ঞানবোধে প্রদীপ্ত। ইঁহাদের ক্রিয়া, শক্তি সমস্ত কিছুই শুদ্ধ নির্মল ও অনির্বচনীয় ছন্দে স্পন্দিত। এই ঈশ্বর হইতে 'বিদ্যা'তত্ত্বের আবির্ভাব। এই বিদ্যা অন্তর্মুখী, ইহার ছন্দ অপ্রাকৃত ছন্দ—কিন্তু ইহা হইতেই আবার শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্বগুলির প্রকাশ। তন্ত্রে এই 'বিদ্যা'তত্ত্ব যেন সন্ধ্যার গোধূলি, আলো-আঁধার, ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধি। কারণ শক্তির এই ভূমিকা হইতেই 'মায়া'-তত্ত্বের আরম্ভ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই বিদ্যা শুদ্ধা বিদ্যা।

মায়া ঃ

মায়াতে শক্তির সঙ্কোচ। ইহা শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্বের আদি কারণ। এই মায়ার ভূমিকা হইতেই পঞ্চকঞ্চুক বা আবরণ—কাল, নিয়তি, কলা, অবিদ্যা ও রাগ। 'পুরুষ' সঙ্কুচিত শক্তির শেষ শুদ্ধাশুদ্ধ রূপ। ইহার পরেই প্রাকৃত সৃষ্টির কারণ 'প্রকৃতি'র স্থান। প্রকৃতি স্থূল সৃষ্টির প্রসূতি। অশুদ্ধ তত্ত্বগুলির উৎপত্তি হয় প্রকৃতি হইতে।

প্রকৃতি ঃ

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেখানে প্রকৃতি অন্ধ এবং জড়শক্তি, প্রপঞ্চসৃষ্টির মূলীভূত কারণ। সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণের সাম্যাবস্থা হইতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিই স্থূল জগতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বরূপে প্রকট হন। প্রকৃতির প্রথম বিকার 'মহৎ' বা বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে 'অহঙ্কার'। অহঙ্কার হইতে মন, পঞ্চতন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ ভূতের সমষ্টি চরাচর[1] জগৎ। সৃষ্টির ক্রম সাংখ্যে ও তন্ত্রে একই প্রকার। ক্রম এক প্রকার হইলেও, সাংখ্যের প্রকৃতি ও তন্ত্রের প্রকৃতিতে প্রভেদ আছে। সাংখ্যে প্রকৃতির ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু তন্ত্রে প্রকৃতির 'পরা' অবস্থা আছে। পরা প্রকৃতি—'পরা পরাণাং পরমা'। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি 'অচিৎ', অন্ধ এক জড়শক্তি—কিন্তু তন্ত্রে প্রকৃতিও চিতিশক্তি—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নম এতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তিই নিজ ইচ্ছাবলে প্রকৃতিতত্ত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রকৃতি এখানে 'চিদ্‌রূপা'—মহাশক্তিরই একটি সঙ্কুচিত রূপ, যেন বিক্ষেপিত আবৃত চৈতন্য। তাই বলা হয়, 'প্রকৃতি শক্তিজৃম্ভিতা'।

১। 'পঞ্চ ভূতাত্মকং সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ' (শারদতিলক)। চর—স্বেদাণ্ডজরায়ুজ জীব, অচর—গিরি-বৃক্ষাদি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এক মহাশক্তিই বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হইতেছেন। ইনিই পরাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী—'প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমান্'। ইনিই সূক্ষ্ম সবিশেষ ঈশ্বর বা বিদ্যাতত্ত্ব, ইনিই আবার বহির্মুখী মায়া বা প্রকৃতি। শক্তি সর্ব্বাত্মিকা, সকল বস্তু নিয়মনকারিণী। 'পঞ্চদশী'তে বলা হইয়াছে, আনন্দময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ইনি সর্ব্বভূতে নিগূঢ়া হইয়া রহিয়াছেন :

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎসর্ব্ববস্তু নিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু ভূতেষু॥

এই শক্তি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেই স্থূলতমা। ইনি চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি সমস্ত তেজোময় পদার্থের ইনিই উপাদান ও পরিচালিকা।

অণোরণীয়সী স্থূলা স্থূব্যাপ্তচরাচরা।
আদিত্যেন্দ্বগ্নি তেজোময় যদ্ যত্তত্তন্ময়ী বিভুঃ॥ (প্রপঞ্চসারতন্ত্র)

॥ দুই ॥

ব্রহ্মময়ী মা

শাক্তাগমসম্মত শক্তিতত্ত্বের বিবিধ সিদ্ধান্ত লইয়া শাক্তপদাবলীর উপাস্যতত্ত্বমূলক সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। শক্তির যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, তাহাই পরাতত্ত্ব, এই অবস্থায় কালীই ব্রহ্ম, তিনিই 'ব্রহ্মময়ী মা'। তখন তিনি রূপহীন, নামহীন, নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী হইয়াও তিনি তখন নির্গুণ। মায়ের এই তত্ত্ব স্থূলবুদ্ধির অগম্য। 'ব্রহ্মময়ী মা', 'মা কি ও কেমন' অধ্যায়ের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে ব্রহ্মময়ী মায়ের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পরাশক্তির যে অবস্থা অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, বোধাতীত— তাহাকেই শক্তি-সাধক কবিগণ 'ব্রহ্মময়ী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শাক্তপদাবলীর কবিগণের মনেও এই প্রশ্নটি উদিত হইয়াছিল, দৃশ্যমান জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে মায়ের রূপটি কেমন ছিল?

রূপাদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে কেমন দৃষ্টি
তখন কটা হাতে, কি বেশেতে, কার ধ্যানেতে থাকতে কোথায়?
পৃথিবী হয়নি যখন, চন্দ্র-সূর্য্য ছিল না মন,
তখন ঘোর অন্ধকারভূতে, কি ভাবে, কে দেখতো তোমায়?
(তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী)

এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে সাধক কবিগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মময়ী মায়ের স্বরূপ।

তখন সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, ঘোর অন্ধকারে সে এক মহানির্ব্বাণের অবস্থা। সে মহাতমিস্রার দেশে দিবস নাই, রজনী নাই, সন্ধ্যাও নাই। কেবল,

অনন্ত আঁধার-কোলে মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি। (অজ্ঞাতনামা কবি)

সেই নিবিড় অন্ধকারে, পরমা শান্তির মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন কেবল ব্রহ্মময়ী মা। তিনি 'আদিভূতা সনাতনী', তিনি অরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার। কিন্তু তিনি চিন্ময়ী— 'চিৎ অভিমুখী', আনন্দরূপা আনন্দময়ী। অরূপ হইলেও তিনি অপরূপ, মহাতমসার মধ্যে তিনি জ্যোতিষ্মতী: 'নিবিড় আঁধারে চমকে অরূপরাশি'। ইহা যেন এক মহাসমাধির অবস্থা।

এ অবস্থায় তিনি অদ্বৈত হইলেও শিব-বিশিষ্টাদ্বৈত। শক্তিতন্ত্রের অদ্বৈতবাদ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে এইখানে স্বতন্ত্র। সর্ব্ব অবস্থাতেই 'আত্মারামের আত্মা

কালী'। নির্ব্বিকার, নিরাকার অবস্থাতেও পরাশক্তি পরমশিবের সাহত সংযুক্ত, যেন 'শক্তি-শক্তিমৎ-সামবস্থাত্মা'। এখানে ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু মায়ের 'আপ্তভাবে গুপ্তলীলা' চলিতে থাকে। পরম শিবের সহিত পরাশক্তির যুগনদ্ধ মিথুন ভাবই এই গুপ্তলীলা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন'।[১] এই তত্ত্ব শিব-শক্ত্যাত্মক বলিয়া ইহাকে 'হংস'ও বলা হয়; 'হং'-পুরুষরূপী শিব, 'সঃ' পরাপ্রকৃতি। যেন স্বামী আর স্ত্রী: শিবের সহিত শক্তি, হংস-হংসীর মত নিত্য লীলা করিয়া চলিয়াছেন। শাক্তপদাবলীর কবিগণ ব্রহ্মময়ী মায়ের এই নিত্য লীলাকে বর্ণনা করিয়া বলেন,

'কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ' (রামপ্রসাদ)

অথবা, 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী' (কমলাকান্ত)

শিব-শক্তির এই বোধাতীত সমযোগ, এই রমণানন্দই দৈব ও প্রাকৃত সৃষ্টির মূল। ব্রহ্মময়ী মা বিশ্বোত্তীর্ণ হইলেও বিশ্বাত্মক: 'মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড', অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত। মায়ের লীলাবশেই নির্গুণ সগুণ হয়, নির্ব্বিকার বিকার প্রাপ্ত হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হন, তিনিই আবার তাঁহাদের ভার্য্যারূপে প্রণয়ের খেলা খেলেন। এই লীলায় সৃজন-পালন-লয় কার্য্য সংঘটিত হয়। ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তিরূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুর জ্ঞানশক্তিরূপে তিনি পালন করেন, আর শিবের ইচ্ছাশক্তিরূপে তিনি ধ্বংস করেন: 'সৃজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইয়ে' (রামলালদাস দত্ত)।

ব্রহ্মময়ী মায়ের বুদ্ধির অতীত এই লীলা, প্রপঞ্চ সৃষ্টির মধ্যেও অভিব্যক্ত। যিনি 'চিৎঅভিমুখী', সৃষ্টির অভিপ্রায়ে তিনিই 'চিৎবিমুখী' হন। গুণত্রয়ের অকার্য্যাবস্থায় যিনি ব্রহ্মময়ী, ক্রিয়াশীল অবস্থায় তিনিই প্রপঞ্চ সৃষ্টি। এ স্থলে তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। সাংখ্য মতে—'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ তন্মাত্রানি উভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি'।[২] শাক্ত-পদাবলীতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে:

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ।
২ সাংখ্য প্রবচন সূত্র, ১।৬১।

তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্য্যহেতু চিৎ-বিমুখী
চিদানন্দে পিছে-রাখি চিত্তানন্দে উন্মাদিনী।
ত্যজ্য করি নির্ব্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে
সৃষ্টি কর সবিকারে বিকাররূপিণী। (রসিকচন্দ্র রায়)

মহাশক্তির নির্ব্বিকার অবস্থাই মায়ের ব্রহ্মময়ী অবস্থা। তিনি যুগপৎ নির্গুণা ও সগুণা। জীবের দেহাভ্যন্তরেও তিনি আছেন। নাদ ও জ্যোতির মধ্য দিয়া অব্যক্ত শক্তির প্রকাশ হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী অতিসূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যোগিগণ এই নাদ ও জ্যোতিকে অনুসন্ধান করিযা থাকেন। পরাশক্তিই জীবদেহে শব্দব্রহ্ম বা কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করেন। সাধারণতঃ কুলকুণ্ডলিনী দেহস্থ মূলাধার চক্রে প্রসুপ্তা থাকেন ঃ জাগ্রত হইযা ইনি সুষুম্না নাড়ীর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে, মূলাধার হইতে সহস্রারের মধ্যবর্ত্তী চক্রে চক্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। চঞ্চল মন, চঞ্চল পবন (শ্বাসবায়ু) , মন-পবনের দোলায দোদুল্যমান পদ্ম, পদ্মাধিষ্ঠাত্রী জননী শ্যামা। সাধক কবি কবিত্ব করিয়া বলেন,—

হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গল নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্ম সনাতনী ও মা। (রামপ্রসাদ)

জীবের দেহে কুণ্ডলিনীই নাদরূপিণী পরাশক্তির প্রতীক। মূলাধার কমল-কর্ণিকায় ইনি ত্রিবৃত্তাকৃতি ভুজঙ্গরূপে ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করিযা অবস্থান করেন। তখন ইহার মুখে প্রমত্ত অলির মত অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হয়। এই কূজন-নাদ অব্যক্ত। দেহস্থ অন্যান্য পদ্মে এই নাদ ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়। তান্ত্রিকগণ এই নাদের চারিটি অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন—পরা,পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মূলাধারে সমুৎপন্ন নাদকে 'পরা নাদ, স্বাধিষ্ঠানের নাদকে 'পশ্যন্তী' নাদ, অনাহত চক্রের নাদকে 'মধ্যমা' এবং কণ্ঠদেশের বিশুদ্ধ চক্রের নাদকে 'বৈখরী' নাদ বলা হয়। কুণ্ডলিনীই যেন নাদরূপে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, ত্রিসপ্ত (একুশ) মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করিতেছেন, জীব-দেহে বসিয়া বিচিত্র তান-লয়-মান-সুরে চিত্তবিনোদন সঙ্গীত রচনা করিতেছেন। নাদরূপিণী ব্রহ্মময়ী মায়ের দেহগ্রামসঞ্চারিণী এই মূর্ত্তিকে কবি কাব্যবন্ধে প্রমূর্ত্ত করিয়া বলেন,—

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী॥

শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রযতন্ত্রে,
গুণভেদ মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী ॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড্‌দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তান লয মান সুরে ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥ (মহারাজ নন্দকুমার)

ব্রহ্মময়ী মাতৃতত্ত্বের দুরধিগম্যতা

যিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য—তাঁহাকে লইয়া কবিত্ব করিলেও ব্রহ্মময়ী মা যে স্বরূপতঃ অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বাচ্য—শাক্তপদাবলীর কবিগণ পুনঃ পুনঃ তাহার আভাস দিয়াছেন। মহাশক্তির সম্ভূতিকে স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধ দ্বারা ধারণা করা সম্ভব, কিন্তু তাঁহার নির্বিশেষ রূপ অতীন্দ্রিয়। ব্রহ্মময়ী মায়ের তত্ত্ব 'সহজ জ্ঞানের অগোচর'। ষড়্‌দর্শনের শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও নীরস বিচার-বিতর্ক দিয়া ইহাকে ধারণা করা যায় না: কবি বলেন,

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড্‌দর্শনে না পায দরশন ॥ (রামপ্রসাদ)

ইহা অতি সত্য কথা। এ তত্ত্ব নির্ণয করা দুঃসাধ্য, ইহা 'কাকীমুখ আচ্ছাদিনী'।[১] এ তত্ত্ব নিরূপণ করা অনেকটা বামন হইয়া চাঁদ ধরার মত। রামপ্রসাদ বলেন, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা 'দেঁতোর হাসি'। বস্তুত যাঁহার রূপ নাই, নাম নাই, গুণ নাই—যিনি একই দেহে মহাকাল ও মহাকালী, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত, নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপী—তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয করিবে কে? বুদ্ধির আলোক জ্বালিয়া সন্ধান নিতে গেলে, তাহা অবিদ্যার কুহক বিস্তার করে। তিনি 'ইতি ইতি', পরক্ষণেই আবার 'নেতি নেতি'। ভক্তের নিকট এ তত্ত্ব রহস্যময। ভক্ত শুধু এইটুকু বুঝিতে পারেন, 'দুরূহ এ তত্ত্ব, তবু সুধামাখা বলিহারী!' তবে যোগিগণ এই সূক্ষ্ম-তত্ত্বকে অনুধাবন করিতে পারেন: 'তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন।' কিন্তু মনন করিতে করিতে যখন যোগী ব্রহ্মময়ীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন জ্ঞেয় থাকে না, সাধক তখন বলিয়া উঠেন, 'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।' ব্রহ্মময়ী মায়ের জ্ঞান সাধককে অখণ্ড চৈতন্যে বিলীন করিয়া দেয়।

১। কাকীমুখ—কাকচঞ্চুবৎ আস্য: স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের ভাষা এ তত্ত্ব নির্ণয করিতে পারে না, তাই ইহা 'কাকীমুখ আচ্ছাদিনী।' (?)।

॥ তিন ॥

ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মা

মহামায়াতত্ত্ব

ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মায়ের কথা বুঝিতে হইলে, 'মহামায়া' তত্ত্বটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। মায়াতত্ত্বও শক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। শক্তি ও মহামায়া অভিন্না। তন্ত্রে পরম শিব শান্ত, নিষ্ক্রিয়, কেবল জ্ঞানঘন দীপ্তিমাত্র; এই শিবের সহিত অবিরোধে যুক্ত শক্তির ক্রিয়াতেই নির্গুণ শিব সগুণ হইয়া উঠেন। তন্ত্রমতে যাবতীয় ক্রিয়া শক্তির, তাই শক্তি মহাশক্তি। মহাশক্তি প্রসুপ্ত থাকেন বলিয়া শিব স্পন্দহীন হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় শিব যেন মোহগ্রস্ত, তাই ক্রিয়াহীন, মৃতবৎ। মহাশক্তির প্রভাবেই যেন শিবের জড়াবস্থা। তাই এ শক্তিকে বলা হয়, মহামায়া। 'মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া' (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী)—মহতী যে মায়া, তাহাই মহামায়া।

অদ্বৈতবেদান্তমতে মায়া আবরণশক্তি, ইহা জ্ঞানকে আবৃত করে। মায়ার সন্নিধানে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে আভাসিত হন, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে মায়া অপসারিত হয়, তখন আর তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না; অতএব মায়া ভ্রান্তি বা মিথ্যা। তন্ত্রমতে মায়া নিত্যা, পরাশক্তি চিৎশক্তি হইতে অভিন্না। ইঁহার মহতী শক্তি। ইনি শঙ্করাদি দেবতাদিগকে পর্য্যন্ত মোহগ্রস্ত করেন :—

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্য চ।
কিমন্যমপি দেবেশি! মোহয়েন্মরানপি ॥[১]

মহামায়া তাই অঘটনঘটনপটীয়সী। নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরের চিত্তকেও তিনি বলপূর্ব্বক মোহে নিক্ষেপ করেন :

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥[২]

উপরে 'জ্ঞানিনাং' শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে। তাহারাই যখন মোহাচ্ছন্ন, তখন সাধারণ জীবের তো কথাই নাই। জীব মায়ামোহে বিভ্রান্ত। জ্ঞানরহিত করিয়া মহামায়া জীবকে মমতা-গর্ত্তে নিক্ষেপ করেন। গর্ভে অবস্থানকালে জীবের যে জ্ঞান থাকে, মহামায়াই তাহাকে সংশয়গ্রস্ত করেন, জীবকে তিনিই আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করিয়া তোলেন :

১। যামল তন্ত্র। ২। মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥[১]

মহামায়ার আবার দুইটি রূপ আছে, তিনি একধারে অবিদ্যা ও বিদ্যা। অবিদ্যা দ্বারা তিনি জীবকে মোহগ্রস্ত করেন, আর বিদ্যারূপে তিনি জীবের মুক্তির হেতু হন। ভুক্তি ও মুক্তি, বন্ধ ও মোক্ষ—দুইয়েরই মূল মহামায়া :

সা বিদ্যা পরমামুক্তেৰ্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥[২]

মহামায়াকে 'ইচ্ছময়ী' বলা হয়, কারণ, বস্তুতঃ তিনি পরমসত্তার অঙ্গীভূত ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই নির্গুণ সগুণ হন, অনন্ত সান্ত হইয়া উঠেন, নির্ব্বিশেষ বিশেষের মধ্যে সীমায়িত হন, এক বহুরূপে আভাসিত হন—'বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।' পরাপ্রকৃতি নিজেও নির্গুণা ও নিরাকারা, কিন্তু নিজ ইচ্ছায় তিনিও বহুরূপে প্রকটিত হন, 'সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।'

মহামায়ার বিচিত্র ইচ্ছা হইতেই বিচিত্র লীলার প্রকাশ: তাই তিনি 'লীলাময়ী'। সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে মহামায়া যেন সুদক্ষ অভিনেত্রী। অভিনেত্রী যেমন এক হইয়াও নানারূপে অভিনয় করিয়া থাকেন, মহামায়াও তেমনিই কখনও নিরাকার ব্রহ্ম, কখনও আকারবিশিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁহাদের ভার্য্যা। নিজেই গুণময়ী হইয়া তিনি কখনও প্রকৃতি, কখনও পুরুষ হন।

যথা নটোরঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপঃ স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥
তথৈষা দেবকার্য্যার্থম্ অরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণাপি চ ॥[৩]

—নিজের মায়ায় মহামায়া এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন। মহামায়ার এ লীলাতত্ত্ব অচিন্তনীয়।

শাক্তপদাবলীর 'ইচ্ছাময়ী মা' ও 'লীলাময়ী মা' অংশে মহামায়ার এই নিগূঢ়, অচিন্তনীয় তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইচ্ছাময়ী মা

মহামায়া নিজ ইচ্ছাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বজগতে বিচিত্র লীলা করিয়া চলিয়াছেন, তাই তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে। তাঁহারই

১। কালিকাপুরাণ। ২। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। ৩। দেবী ভাগবত।

ইচ্ছায়, সূর্য্য, সোম, নক্ষত্র নিয়মবন্ধে আকাশে বিচরণ করে, শক্তিশালী হস্তী পঙ্কে বদ্ধ হয়, শক্তিহীন পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে: 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।' তিনি কাহাকেও ইন্দ্র-পদ প্রদান করেন, কাহাকেও অধোগামী করেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হয়। তাই ভক্ত বলেন,

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥ (রামদুলাল নন্দী)

মানুষ অহঙ্কারবশে ভাবে, আমি কর্ত্তা, কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। 'মানুষের ইচ্ছাতে কিছুই হয় না, 'ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় সব হয়।' তিনিই ইচ্ছা করিয়া বলহীনকে বলশালী করেন। দেবীসূক্তে তিনিই তো বলিয়াছিলেন, 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি'—আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি। তাঁহার ইচ্ছাই জীবের ইচ্ছা; তাঁহার ইচ্ছাতেই অতি হীন ব্যক্তি তাঁহার চরণ লাভ করে। কালকেতু ব্যাধ ও শ্রীমন্ত সওদাগরের দেবী-দর্শনরূপ সৌভাগ্য মহামায়ার ইচ্ছাতেই সম্ভব হইয়াছে।

"বন্ধন আর মুক্তি দুয়েরই কর্ত্তা তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হইলেই মুক্তি। তিনি ভববন্ধের বন্ধন-হারিণী তারিণী"—এই কথা বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে এই গানটি গাহিতেন:

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভবসংসার বাজারের মাঝে। (রামপ্রসাদ)

জীবের মন যেন মহামায়ার হাতের ঘুড়ি; মায়া-দড়ি বাঁধিযা আশা-বায়ুতে তিনি এই ঘুড়ি উড়াইতেছেন। ঘুড়ির নির্ম্মাণ-কৌশলটিও তাঁহারই, অদ্ভুত কারিগরি! 'বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি'—কাটিয়া যাইবার উপায় কি? 'স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন'। এ যেন কঠিন মোহ-পাশ। তবুও মহামায়ার ইচ্ছায়, 'ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে।' পরমহংসদেব বলিতেন, 'তিনি ইচ্ছাময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। জীবকে বন্ধন করিয়া খেলাইয়া তাঁহার যেমন আনন্দ, জীবের মুক্তিতেও তাঁহার তেমন আনন্দ। তাই 'ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।'

লীলাময়ী মা

ইচ্ছাময়ীর বিচিত্র ইচ্ছা যখন কর্ম্মে ও আচরণে প্রকাশ পায়, তখন তাহা হয় লীলা। তিনি লীলাময়ী, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁহার লীলা। বিশেষ করিয়া এই সংসার।

সংসার তাঁহার লীলাক্ষেত্র, সংসারী তাঁহার লীলার খেলনা। জীবকে সঙ্ সাজাইয়া তিনি চিরকাল লীলা করিয়া চলিয়াছেন। জীব-দেহের মধ্যেও সেই লীলা-রঙ্গের প্রকাশ:

শ্যামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে।
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে॥ (অজ্ঞাত)

দেহ যেন একটি কল (যন্ত্র)। লীলাময়ী মা অদৃশ্য থাকিয়া এই কল ঘুরাইতেছেন। মায়া-বশে কল ভাবে, সে নিজেই ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা মোহভ্রান্তি। কলে কালী আছেন জন্যই কলের আদর, নচেৎ কল বিকল, 'কেউ না যায় সেই কলের কাছে।'

মায়ের লীলা-রহস্য উদ্ঘাটন করিবে কে? তিনি নিজে নির্গুণা হইয়াও গুণময়ী হইতেছেন, নিজেই প্রকৃতি ও পুরুষ হইয়া লীলা করিতেছেন, সগুণে-নির্গুণে বিবাদ বাধাইয়া 'ঢ্যালা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢ্যালা।' এ অচিন্ত্য তত্ত্ব সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। ভুবন-ভেল্কি তাঁহারই সৃষ্টি,—'উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্।'

লীলাময়ীর কালী-লীলা আর এক বিরাট রহস্য। কালী স্বামীর বুকে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ মূর্ত্তি-রহস্য ভেদ করা দুঃসাধ্য। যাঁহার স্বামীঅন্ত প্রাণ, যিনি দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষজতনু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'পঞ্চতপা' হইয়া শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যিনি শিবকে সহস্রারে ধ্যান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার 'দাঁড়ায়ে পতির বক্ষঃস্থলে!' তাই ভক্তের মনে প্রশ্ন,

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে?
বুক পেতেছে ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে? (গিরিশ ঘোষ)

ইহার উত্তরও ভক্তের আছে। লীলাময়ী মহামায়ার আবার স্বামী কে? তিনি যে সকলের মা, বিশ্বজননী। শুধু তাই নয়, মহামায়া মহাকালেরও কলনকর্ত্রী। প্রাণিমাত্রকে কলন (সংহার) করেন বলিয়া শিব মহাকাল নামে বিখ্যাত, কিন্তু প্রলয়কালে, সেই মহাকালও মহাপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যান অর্থাৎ কালী মহাকালকে কলন করেন। সেই জন্যই তাঁহার নাম কালী, 'কাল সংগ্রহনাৎ কালী'। কালী কেবল শিবের সতী নহেন, তিনি শিবের নিয়ন্ত্রী, তাঁহার পরিচালিকা। শিবও মহামায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হন—'সৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্করম্।' তিনিই সর্ব্বদলের দলপতি; তিনি সকলের নমস্য। তাই তাঁহাকে 'কালের কাল করে প্রণতি।'

সাধকপ্রবর ভুলুয়া বাবা মহাশক্তির এই কালীতত্ত্বকে অপূর্ব্ব ভাষাছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন

দৃশ্যমান এ বিশাল বিশ্বপটে যত,
দৃশ্যকালে কালে লুপ্ত তরঙ্গের মত।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কালে প্রকাশিত,
অন্তে কালগর্ভে হবে বিলুপ্ত নিশ্চিত।
কালগর্ভে অবলম্বি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
চিন্ত, ঘটিতেছে কি অপূর্ব্ব অভিনয়।
শক্তি যাহা এই কালে **কালী** তার নাম,
বাক্‌মনের সীমাতীতা ব্রহ্মানন্দ ধাম।
কালের কালত্ব তাঁহে, কাল-বক্ষে তাই,
উদ্ভাসিতা কালাবাধ্যা নিরীক্ষিতে পাই।
প্রত্যক্ষ নিরীক্ষি, কাল সর্ব্বগ্রাসকার,
গ্রস্ত কাল তাঁহে, তাই **কালী** নাম তার॥[১]

মহামায়ার রূপ, গুণ, লীলা—সব কিছুই রহস্যময়, বাক্‌পথাতীত। তাঁহার 'আপ্ত ভাবে গুপ্তলীলা', প্রসাদ বলে, 'মায়ের লীলা সবলই জেনো ডাকাতি।' শুদ্ধমতি না হইলে, এ লীলা-রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। যোগ সিদ্ধি আসিলে হয়তো এ রহস্যের কিনারা হইতে পারে: যতদিন তাহা না হয়, ততদিন কেবল অন্ধ ধন্ধ হইয়া বলিতে হইবে:

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
কিরূপ কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥ (রামপ্রসাদ)

১। ভুলুয়া বাবা—শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী, ১ম ভাগ, ১ম দিন, ২য় পরিচ্ছেদ।

।। চার ।।

গুণময়ী মা

করুণাময়ী মা

দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে ভীষণতা আছে। তিনি করালবদনী, হাতে তাঁহার খড়্গ-খর্পর। কিন্তু যিনি তাঁহার স্বরূপ জানেন, তাঁহার কাছে তিনি 'কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগম।' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)। চিরজাগ্রত করুণা লইয়া, জননী যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন, বিশ্বজননীও তেমনই অপার করুণাদ্বারা বিশ্বপালন করিতেছেন। তাঁহার কারুণ্যামৃত ধারায় জগৎ প্লাবিত, তিনি করুণার মূল উৎস: 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেন সংস্থিতা' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। সেই উৎস হইতে সহস্র ধারায় করুণাধারা বহিয়া চলিয়াছে। মাতৃবক্ষে তিনিই স্তন্যসিন্ধু, অন্নে তিনি রসস্বরূপ, তিনিই তৃষ্ণার জল, বিশ্বের আশ্রয়ভূমি। তাঁহার স্নেহের অঙ্কে তিনি চরাচর ধারণ করিয়া আছেন, 'বিশ্বাশ্রয়া ধারয়সীতি বিশ্বম্' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। বরাভয় দিয়া জীবকে তিনি রক্ষা করিতেছেন।

জননী হস্তে অসি ধারণ করিয়া আছেন, এই অসি 'তনয়-শমন-ভয়নাশী।' এমন কি দনুজদলনীরূপে তিনি যে ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করেন, তাহার মধ্যেও তাঁহার অনন্ত করুণা প্রকট: 'বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)—শত্রুর প্রতিও তাঁহার এইরূপ দয়া। মহিষাসুর বধের পর দেবতাগণ বলিয়াছিলেন, আপনি দৃষ্টিমাত্রই অসুরকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, তথাপি যে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন, তাহার কারণ, আপনার অস্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়া সে স্বর্গে গমন করে: শত্রুর প্রতিও আপনার এরূপ উদার অনুগ্রহ:

> অসুরে করিতে মুক্ত তার কর-শিরোরক্ত
> ধর অঙ্গে তার শ্রেয় তরে।
> তাহে সেই ভাগ্যবান লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান
> অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন)

এমন কি জগজ্জননীর ভীমকান্তি এবং অট্টহাসির মধ্যেও কৃপামাধুরী প্রকাশ পায়।

তাঁহার মত করুণাময়ী আর কে? তিনি জীবকে দুঃখ দেন সত্য, কিন্তু এ দুঃখ জীবের কল্যাণের জন্য: 'সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে।' বিশ্বের শুভ, অশুভ, সুখ, সবই তাঁহার সৃষ্টি, সবই কল্যাণকর।

বস্তুতঃ তিনি 'দীন-তারিণী শরণাগতপালিনী।' জগতের জীব ঘোরনিদ্রাতে অচেতন; 'স্নেহবিহ্বল করুণা-ছলছল' আঁখি লইয়া তিনি সুষুপ্ত সন্তানের শিয়রে বসিয়া, বিশ্বমানবের জন্য জাগিয়া আছেন। সন্তানের প্রতি এতই তাঁহার মমত্ববোধ। তিনি প্রেমময়ী, করুণাময়ী, করুণারূপিণী। সন্তান দুঃখ পাইয়া তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তিনি 'আয়রে কোলে' বলিয়া সন্তানকে বুকে টানিয়া লন। কেবল একজন সন্তানের জন্য নয়, জগতের অগণিত সন্তানের জন্য তাহার এই করুণাঃ 'সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা' (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। এ অনন্ত করুণার কথা স্মরণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়ঃ

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি।
নিদ্রা নাই কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি!...
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব
করুণার নাহি পার, ওগো সন্তান-তোষিণি। (পুণ্ডরীক মুখো)

কালভয়হারিণী মা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যু এক চরম বিভীষিকাঃ 'নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ'—মৃত্যু নিত্য নিকটবর্ত্তী, অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসী। ধন, জন, যৌবন সবই নিমেষে কালগ্রাসে পতিত হয়—'হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্'। কাল সর্ব্বান্তক।

সকলেই এই কালের কবল হইতে রক্ষা পাইতে চায়ঃ মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব কিছুই মহাকালকে অতিক্রম করিবার জন্য। কবি ও দার্শনিক, মৃত্যুকে মহাজীবনের অর্দ্ধযতি মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন, বলেন, 'There is no death, what seems is but transition' (Meredith); মৃত্যুর মধ্য দিয়া শাশ্বত আত্মা দেহ পরিবর্ত্তন করে মাত্র।

শাক্ত সাধকগণ অন্যদিক হইতে মৃত্যুকে জয় করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন—মহাকাল জগৎসংহার-কারক, তিনি মৃত্যুরূপে সকল কিছু সংহার করেন। কিন্তু 'কালী' সেই মহাকালকেও সংহার করিতে সমর্থঃ

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥ (মহানিঃ, ৪র্থ উল্লাস)

অতএব মহাকালের কলনকর্ত্রী এই কালীর চরণে শরণ গ্রহণ করিলে, মৃত্যু মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেবী 'কালভয়হারিণী মা।'

তাই সাধক বলেন,—

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার।
কাল-নিবারিণী কালী হৃদয়ে জাগিছে।
পদতলে চিরকাল, পড়ে যার মহাকাল
কি করিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাছে? (পঞ্চানন বন্দ্যো)

শক্তি দেবী সৃষ্টির সার্ব্বভৌম সম্রাজ্ঞী, শমন তাহার প্রজামাত্র। তাঁহার নির্দ্দেশেই মৃত্যু পরিচালিত হয়, 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'। সুতরাং মায়ের আশ্রয়ে বাস করিলে আর শমনের ভয় কি? 'শ্যামা মায়ের খাস তালুকে' যে বসত করে, শমন তাঁহাকে কিছুই করিতে পারে না। ভক্ত তাই সগর্ব্বে বলেন,

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্মশানবাসী যার হৃদে বিরাজ করে।
যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি চিঠি দেখাব তখন
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে আস্তে আস্তে যাবে ফিরে। (নবীন চক্রবর্ত্তী)

সর্ব্বান্তক মহাকাল যদি সদলবলে আসিয়াও আক্রমণ করে, তাহা হইলেও ভক্তের ভীত হইবার কারণ নাই। ভক্তের হস্তে 'কালী নামের অসি,' 'তারা নামের ঢাল'— 'সাধ্য কি শমনে করতে পারে জোর?' কালী নামের কেল্লায় যে বসবাস করে, সে নির্ভয়। সে দুর্গ দুর্গম, তাহার চারিদিকে 'ভক্তির গাই' (খাত), প্রেমের প্রাচীর, দুর্গদ্বারে প্রহরী স্বয়ং দনুজদলনী তারা:

ভক্ত যদি কোনমতে পড়ে শক্ত বিপদেতে
মুক্তকেশী দ্রুতপদে, মুক্ত আসি করেন তারে।

এই তো গেল এক শ্রেণীর ভক্তের কথা। অন্য শ্রেণীর ভক্তের সিদ্ধান্ত অনেকটা মরমী কবিদের মত। মরমী কবিগণ মৃত্যুকে 'আনন্দ স্বরূপ' মনে করিয়া নির্ভয়ে মৃত্যুর আনন্দ মহোৎসবে যোগ দিতে চাহিয়াছেন। 'মৃত্যু দেখে ভয় কি রে তোর?' মৃত্যু তো অমৃত, আনন্দ। দৈহিক মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীব সেই আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ হয়। 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান' বলিয়া সেই নয়নাভিরাম কৃষ্ণ-কালো মৃত্যুকে তাঁহারা প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু অনন্ত মাধুরীপূর্ণ!

শাক্ত কবিগণও মৃত্যুকে আনন্দ-স্নান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'মা আমার আনন্দময়ী', তিনিই জন্ম-মৃত্যুর উৎস। দেহাবসানে ভক্ত সেই আনন্দময়ীর সহিত মিলিত হন। মৃত্যু ও শ্যামা এক, কাল ও কালী অভিন্ন। মৃত্যু কালো, শ্যামাও

কৃষ্ণবর্ণা, 'শ্যামা জলদবরণী'। অতএব মৃত্যুর অর্থ সেই জলদবরণীর সহিত এক হইয়া যাওয়া: তখন চক্ষুভরা শ্যামারূপ, নয়ন-তারা 'তারা'র প্রতি স্থির। সে এক অব্যক্ত আনন্দ-তন্ময় অবস্থা! সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অন্যের কাছে যাহা বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যু, ভক্তের দৃষ্টিতে তাহা আনন্দময় বিদেহ-মুক্তি। এই মুক্তিতে দেহ থাকেনা, অসার পদার্থ নশ্বর জগতেই পড়িয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত জীব 'আনন্দময়ী'র সহিত মিলিত হইয়া তখন নিত্যানন্দে বিভোর হন। তখন মৃত্যুকে কষ্টদায়ক, আনন্দহীন বলিয়াও মনে হয় না, মনে হয়, এই তো মধু, এই তো আনন্দ! অশ্রুমুখী, বিষন্ন পরিজনের উদ্দেশ্যে ভক্ত তখন বলেন,

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরানন্দে যাব কেনে!
তাঁর আনন্দসাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে॥ (কেদারনাথ রায়)

কালের সহিত কালীকে অভেদ ভাবিয়া, তাঁহার এই চিরমধুর, নয়ন-জুড়ানো, আনন্দময়ী রূপের কল্পনা অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ। 'কালভয়হারিণী জননী'র আনন্দময়ী মূর্ত্তি কেবল কালভয় হরণ করে না, 'নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা' (ষট্‌চক্রনিরূপণ) শ্রীপরমেশ্বরীর ক্রোড়ে পরমনির্ভরতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সুতীব্র প্রেরণা সঞ্চার করে।

শক্তিসাধনাদ্বারা মৃত্যুকে কি জয় করা সম্ভব?

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মায়ের নামে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সত্যই কি মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব? এ জগতে কত অবতার, কত সাধক, কত ভক্ত আসিলেন, কে অমর হইয়া রহিলেন? 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতা উত্তরকোশলা?' কথায় বলা হয়, অমর বিভীষণ, অমর অশ্বত্থামা; আজিও নাকি তাঁহারা অমর হইয়া আছেন। ইহা কি সত্য? মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, মৃত্যুকে জয় করা কি সম্ভব?

তান্ত্রিক যোগিগণ বলেন, যোগদ্বারা জীব মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে বলা হইয়াছে, যোগ-সাধনায় মানুষ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগসিদ্ধ বিভূতিসম্পন্ন পুরুষও দুর্লভ নয়। চিত্তকে দেহস্থ কোন কেন্দ্রে স্থির করিতে পারিলে, মৃত্যুকেও জয় করা অসম্ভব নয়। সিদ্ধযোগীর নিকট মৃত্যু বশীভূত। ইচ্ছানুযায়ী তাঁহারা দেহ ধারণ করিতে পারেন, ত্যাগ করিতে পারেন। এ সকল গল্পমাত্র নয়, সত্য। রঘুবংশের রাজারাও রাজ্যভোগের পর 'যোগেনান্তে তনুত্যজাম্'—যোগদ্বারা তনু ত্যাগ করিতেন।

ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সাধক যোগাভ্যাসদ্বারা যৌবনকে বিলম্বিত করিতে পারেন।

জেম্‌স হিল্‌টনের 'লস্ট হরাইজন' নামক উপন্যাসে দেখা যায়, তিব্বতীয় পর্ব্বত-মালার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন, আলোঝলমল একটি স্থান আছে, নাম তার 'শ্যাঙ্‌রিলা'; সেখানে জীবের জীবন-গতিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া তিব্বতীয় লামা (সিদ্ধ যোগী) অনন্ত যৌবনকে অটুট করিয়াছেন; সেই নীল চাঁদের উপত্যকায় যেন স্বর্গরাজ্য সংহৃত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই অসম্ভাব্য ঘটনা সম্ভব হইয়াছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর যোগ-প্রক্রিয়ায়। শ্যাঙ্‌রিলা সেই যোগের রাজ্য। সে রাজ্য আজ হারাইয়া গিয়াছে, মানুষ অমর-লোক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

যোগদ্বারা প্রাণ-শক্তিকে অটুট রাখা সম্ভব। শ্যাঙ্‌রিলায় সেই অলৌকিক শক্তির চর্চ্চা হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষ সে শক্তি হইতে বঞ্চিত ছিল না। আজ তাহা অবিশ্বাস্য মনে হইলেও, তাহা মিথ্যা নয়। তান্ত্রিক যোগিগণ ইহা বিশ্বাস করেন যে, যোগদ্বারা মানুষ অনাশয় হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে; অন্ততঃ তাঁহারা, যোগ প্রক্রিয়ায় মন ও দেহকে এমন অবস্থায় আনিতে পারেন, যে অবস্থায় সুখ-দুঃখ সমান। সে অবস্থায় কোন দুঃখই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যুও নয়। যোগী অবিচলিত, স্থির, স্থিতধী। ইহাই কৈবল্য, ইহাই অমরত্ব। মহারাজ নন্দকুমার এই যোগবলেই নির্ম্মম ফাঁসীর নির্দ্দেশকে অবিচলিত, অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, নির্ভয়ে ফাঁসী বরণ করিয়াছেন। শক্তির সাধক মাতৃচরণে চিত্ত স্থির রাখিয়া এমনিভাবেই মৃত্যুকে জয় করেন, এই দিক হইতেই মা কালভয়হারিণী। কালভয়হারিণী সেই মায়ের প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া তাই তো শক্তির সাধক কবি নির্ভয়ে উচ্চারণ করেন,

তুই যা রে, কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥
হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥ (রামপ্রসাদ)

॥ পাঁচ ॥

জগজ্জননীর রূপ

'জগজ্জননীর রূপ' পর্য্যায়ের কবিতাবলীর মধ্যে দেবীর কতকগুলি স্থূলরূপের বর্ণনা আছে। মাতৃপূজার সময় পূজক যে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং যে রূপে দেবীকে অভিধ্যান করেন, তাহা এই স্থূলরূপেরই ভাষা-চিত্র। ধ্যানের রূপই দেবীর মূর্ত্তি বা প্রতীক। তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবীর যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান আছে, শাক্তপদাবলীর 'জগজ্জননীর রূপ' তাহাদেরই অনুবাদ।

মূর্ত্তিকল্পনার হেতু

হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে অনেকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। 'পৌত্তলিক' বলিয়া হিন্দু জাতির অখ্যাতি আছে। অবশ্য যাঁহারা মূর্ত্তি-কল্পনার ও মূর্ত্তিপূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য অবগত নহেন, তাঁহারাই মূর্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তির কল্পনা কপোল-কল্পনা না। সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়াই চিন্তাশীল মনীষীর ধ্যানে মূর্ত্তি প্রমূর্ত্ত হইয়াছে। যুগযুগান্তের বহু ধ্যান, বহু মননের ফল দেবদেবীর মূর্ত্তি। ইহার জন্য সাধককে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছে। সাংসারিক ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, কঠিন তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া, তাঁহারা অরূপ-নিরাকার দেবতার বিশেষ বিশেষ রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। জীবনভর তপস্যার ফলে সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে নিবিড় অন্ধকারে, সুদূরলোকের অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট নীহারিকার মত জ্যোতি দেখা দিয়াছে; সেই জ্যোতি আরও সুকঠিন সাধনায়, দিব্যালঙ্কার, দিব্যাস্ত্র-শোভিত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দেবতার আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাই হিন্দুর দেব-মূর্ত্তি। ইহা সাধনার আবিষ্কার, দুরূহ তপশ্চর্য্যার অখণ্ড ফল। তন্ময়চিত্তে বীজমন্ত্র মনন করিতে করিতে সহসা মন্ত্রবর্ণ দেবমূর্ত্তিতে আকারিত হইয়াছে; তখনই সাধক বলিয়া উঠিয়াছেন:

'মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া, তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা।' (তারাপ্রদীপ)

বস্তুতঃ পরাপ্রকৃতি শক্তির তিনটি রূপ আছে: 'The forms of the mother of the universe are threefold. There is first the supreme (পর) form of which 'none know', next her subtle form as mantra or

sound and thirdly her gross form in the visible universe and in those embodied aspect or spiritual avataras in which she presents herself, for the benefit of the Sadhaka who can only worship her in such form' (Arthur Avalon)

✓ শক্তিদেবীর পরা ও সূক্ষ্ম নাদের অবস্থা 'ব্রহ্মময়ী মা' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'নাদ'-রূপ দেবীর সূক্ষ্ম প্রকাশ হয়। জীবদেহে ইনি কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থান করেন। এই নাদ বা ধ্বনির প্রতীক বর্ণ। দেবীর বীজমন্ত্র কয়েকটি ধ্বনি বা বর্ণের সমষ্টি। অতএব বীজমন্ত্র দেবী হইতে অভিন্ন। বীজমন্ত্রের মনন ফল ধ্যান, তাহা দেবীর ভাবা-মূর্তি। ভাবা-মূর্তির বহিঃপ্রকাশ দেবীর স্থূলরূপ বা প্রতিমা। মূর্তিকল্পনার ইহাই গূঢ় রহস্য। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ, বিন্দু হইতে যেমন সিন্ধুর উৎপত্তি তেমনই সূক্ষ্ম হইতে এই স্থূলরূপের বিকাশ।

কতকগুলি মাতৃমূর্তি পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। দেবতাগণ অনেকবার দৈত্যদারা উপদ্রুত হইয়াছেন তখন বিপন্ন ভক্তের উদ্ধারের জন্য এবং দৈত্য বিনাশের জন্য দেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন। প্রপন্ন ভক্তকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১অ.)

এইভাবে কতবার যে, কত বিভিন্ন মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। মহাশক্তির এই আবির্ভাবে যে গুণ ও ক্রিয়া প্রকট হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াও দেবীর অনেক রূপকল্পনা করা হইয়াছে: 'গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।'

সাধকগণের সুবিধার জন্যও দেবী অনেক মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। মানুষ যদিও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, তথাপি সাধারণ মানুষ সহসা সূক্ষ্মকে ধারণা করিতে পারে না। অনন্ত ভাব, অসীম জ্ঞান সাধারণ মানুষের অগম্য। এইজন্যই উপাসনার প্রথম দিকে প্রয়োজন একটি স্থূল রূপক বা প্রতীক। এই প্রতীককে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। জ্যোতির্বিদ্যা বা গণিতশাস্ত্র শিক্ষার যেমন ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূর্য্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) জ্ঞানের স্তরে যাইতে হয়, তেমনই স্থূল মূর্তিকে ভাবিতে ভাবিতে সূক্ষ্মরূপের প্রতীতি হয়। শাস্ত্রে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, স্থূলের উপাসনা না করিয়া সূক্ষ্মের ধারণা করা সম্ভবই হয় না:

অনভিধ্যায রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যঃ সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ ভবেৎ॥ (ভগবতী গীতা, ৪র্থ অঃ)

এ কারণেও যেমন নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মময়ীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তেমনই সাধকজনের কল্যাণের জন্যও, অরূপ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন :

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাহশরীরিণঃ।
উপাসকানাং, কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ (কুলার্ণবতন্ত্র)

দেবীর বিভিন্ন রূপ

সাধকের মননের ফল, দৈত্যবধের জন্য আবির্ভাব হেতু এবং সাধারণ ভক্তের সুবিধার জন্য এইভাবে দেবীর অসংখ্য রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে : 'দশলক্ষ মহাবিদ্যা স্তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে' (সিদ্ধ যামল)। রূপের সংখ্যা যেমন অসংখ্য, তাহাদের প্রকাশও তেমনই বিচিত্র। দেবী কখনও ভয়ংকরী, কখনও প্রশান্ত, কখনও স্মেরাননা মনোহরবেশ-ধারিণী। কখনও তিনি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা বা দশভুজা : তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র, বরাভয় ও মুদ্রা সবই বিশ্বকল্যাণের জন্য, বিশ্বরক্ষার্থং

চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজাষ্টভুজাস্তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥ (মহানির্বাণ তন্ত্র, ৭র্থ উল্লাস)

শক্তির সাধক ভক্তবৃন্দ, মায়ের শত সহস্র রূপের মধ্যে বিশেষ করিয়া দশমহাবিদ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন :

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতার্দশ মহাবিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাং।

তন্ত্রোক্ত ধ্যানের মূর্ত্তি ও শাক্তসঙ্গীতের জননী-মূর্ত্তি

শাক্তপদাবলীর জগজ্জননীর রূপাংশে এই দশটি মহাবিদ্যা, দেবীর মহিষাসুরমর্দ্দিনীরূপ এবং কালীর রূপভেদে দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, আদ্যা ও ভদ্রকালীর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ধ্যানগুলি তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু তন্ত্রে দেবীর ধ্যান যেমন কবিত্বপূর্ণ, শাক্তপদাবলীর জগজ্জননীর রূপবর্ণনা তেমন কবিত্বপূর্ণ নয়।

যদিও তন্ত্র সাধন শাস্ত্র, কবিত্ব প্রকাশের তুলনায় দেবীর পূজা, মন্ত্র, ন্যাস ইত্যাদির বর্ণনাই এখানে মুখ্য, তথাপি স্বীকার করিতে হয়, তন্ত্রের ধ্যান অপূর্ব্ব কবিত্ব-মণ্ডিত। বীজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের হৃদয়-পুণ্ডরীকে অথবা ব্রহ্মবেশ্মে অপূর্ব্ব জ্যোতীরূপা যে দেবী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের রূপসজ্জায় তাঁহারা তাঁহাকে মনোহর বাঙ্ময়-মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। আনন্দ-মুদিত অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই যেন ধ্যানের মন্ত্র কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতি-ব্রহ্মার সম্মুখে একদিন অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী গীর্ব্বাণীর সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি প্রকট হওয়ায় তিনি যেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই 'অহো রূপম্ অহো রূপম্' বলিয়া অভিভূত হইয়াছেন, তান্ত্রিক সাধকও সাধনলব্ধ দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া তেমনই অভিভূত হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই দেবীমূর্ত্তি বিশ্বসৌন্দর্য্যের সারসমুচ্চয় লইয়া প্রকট হইয়াছে। দেবতার রূপ দেখিয়া সাধক ব্রহ্মার মতই মুগ্ধ হইয়াছেন, বাল্মীকির মত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া অবাক হইয়া যেন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।'

তন্ত্রের ধ্যানমন্ত্র মুগ্ধ, তন্ময় সাধকের অন্তর উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ : এই জন্যই শিল্পকলা স্বভাবতঃই বর্ণনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ভীমবেশা ভয়ঙ্করী 'কালী'র ধ্যানই হউক, বৃদ্ধা ক্ষুৎপিপাসাতুরা ধূমাবতীর ধ্যানই হউক—হৃদয়-ভাবের অকৃত্রিম ছোঁয়ায় তাহা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। কে ভুলিতে পারিবে আদ্যাকালীর সেই মেঘাঙ্গী শশিশেখরার মূর্ত্তি, দক্ষিণাকালীর সেই 'কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা' ভীম-সুন্দর রূপ! ধূমাবতী বৃদ্ধা দন্তহীনা, যৌবনের সৌন্দর্য্য-হারা বিধবা; অতি রুক্ষ তাহার মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির বর্ণনা করিতে গিয়া সাধক তাহাতেও কবিত্বের ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছেন :

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥

ছিন্নমস্তা দেবী কী ভয়ঙ্করী! নিজেই নিজের মুণ্ড ছেদন করিয়াছেন, ছিন্নকণ্ঠনির্গত রুধিরধারার একধারা নিজেই পান করিতেছেন। সাধক কবি এই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তির মধ্যেও সৌন্দর্য্যের রাগ লাগাইয়া দিয়াছেন। যে পটভূমিকায় এই ভয়ঙ্করী রুদ্রাণী দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা যেন রুদ্র সুন্দরের এক অদ্ভুত সমন্বয়। অর্দ্ধ-বিকশিত এক শ্বেতপদ্ম, পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাকুসুম ও বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই মণ্ডলমধ্যে :

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥

প্রসারিত-মুখী° ভীমাং লেলিহানাগ্র জিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজ কণ্ঠ-বিনির্গতাম্॥

শ্বেতপদ্মের রক্তবর্ণ কর্ণিকায় মহাভয়ঙ্করী এই ছিন্নমস্তা, যেন শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত গগনে মহাপ্রলয়ঙ্কর এক ধূমকেতু। এ মূর্তি যে কোন দর্শকের চিত্তপটে চিরকাল স্থায়িভাবে মুদ্রিত থাকিবার মত ভীষণ অথচ সুন্দর মূর্তি।

ষোড়শী তো নিজেই বিশ্ব-বিমোহিনী নব-যৌবনোল্লাসিত সৌন্দর্য্য মূর্তি। সাধক কবি তাহাকে 'সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্য' রূপসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন। দেবীর পদ্মরাগমণির মত দেহচ্ছটা, 'কৃষ্ণ অলিকুলসঙ্কাশ' চূর্ণ কুন্তলাবলী, হরধনুর ন্যায় বঙ্কিম ভ্রূলতা; লোচন কখনও আনন্দে মুদিত, কখনও উল্লাসে লীলাচঞ্চল, সুস্পষ্ট নাসিকা, চন্দ্রের অমৃত মণ্ডলের ন্যায় গণ্ডমণ্ডল, বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, তাঁহার হাস্যের মাধুর্য্য যেন রস সাগরের মাধুর্য্যকে পরাভূত করে—'স্মিত মাধুর্য্যবিজিত মাধুর্য্য রস-সাগরাম্'। তাঁহার অনুপম কান্তি চন্দ্র কিরণে সমুজ্জ্বল, 'শীতাংশুশতসঙ্কাশ কান্তি সন্তানহাসিনী'। দেবী জগদাহ্লাদ-জননী, জগদ্রঞ্জনকারিণী, জগদাকর্ষণকরী। সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী ষোড়শী দেবীর এইরূপ সৌন্দর্য্য সুসমা।

শাক্তপদাবলীতে মাতৃকাশক্তির যে সকল রূপগুলি তন্ত্রের ধ্যান হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে, একমাত্র কালী রূপের বর্ণনা ব্যতীত সেগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে নাই। তন্ত্রের সাধকগণ 'রূপের তুলিকা দিয়া রসের মুরতি' অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় মহতাবচাঁদ মহারাজ, শিবচন্দ্র সরকার-অনূদিত জগজ্জননীর রূপবর্ণনা প্রভাহীন। পদাবলী-ধৃত 'তারা', 'ষোড়শী', 'ভুবনেশ্বরী', 'ভৈরবী,' 'ছিন্নমস্তা', 'ধূমাবতী', 'বগলা', 'মাতঙ্গী, 'কমলা' ও 'ভদ্রকালীর' রূপবর্ণন মূলের ন্যায় সরস ও সুন্দর হয় নাই। মূলতন্ত্রে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে, অলঙ্কার সজ্জায় ও সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্পর্শে প্রত্যেকটি মাতৃমূর্তি জীবন্ত ও বর্ণনা ব্যঞ্জনাময়—তাহাদের তুলনায় শাক্তপদাবলীর অনুবাদিত জগজ্জননীর রূপ প্রাণহীন চিত্র মাত্র। শাক্তপদাবলীর বর্ণনাতেও অলঙ্কার আছে, সে অলঙ্কার নিষ্প্রাণ অনুবাদে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে নাই।

তবে একটি কথা, জগজ্জননীর এই সকল রূপবর্ণনায় শাক্তপদাবলীর কবি সত্যের অপলাপ করেন নাই। ভাব-কল্পনা মিশাইয়া মূলের প্রকৃত রূপটিকে বিকৃত না করিয়া তাঁহারা ধ্যানের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। কবিত্বের দিক হইতে সরস ও ব্যঞ্জনাময় না হইলেও, মূলভাবের প্রতি আনুগত্য এই রূপবর্ণনাগুলির প্রধান বিশিষ্টতা। এই অনুবাদগুলির দ্বারা আর একটি উপকার সাধিত হইয়াছে। বহুদিন

পর্য্যন্ত যে ধ্যানগুলি তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণ তাহাদের আস্বাদন লাভ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

শাক্তপদাবলীর শ্যামামূর্ত্তি

কিন্তু শাক্তপদাবলীতে 'কালী' বা 'শ্যামা' মূর্ত্তির বর্ণনায় রূপ রসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তন্ত্রোক্ত ধ্যানের ব্যঞ্জনা তো ইহাতে আছেই, উপরন্তু ইহাতে যে মন্ময়ত্বের (Subjectivity) স্পর্শ আছে, তান্ত্রিক ধ্যানে তাহা নাই। ভাব মিশাইয়া সাধক কবিগণ শ্যামা মায়ের ভাবময় রূপ চিত্রিত কবিযাছেন। শ্যামামূর্ত্তির বর্ণনায় অনেক কবিই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বীয় মনেব মাধুরী মিশ্রিত কবিয়া মায়ের মনোময ছবি আঁকিয়াছেন। ইহা যেন চোখে দেখা, হৃদযে অনুভব করা এক অভিনব মূর্ত্তি!

প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে কবি রবীন্দ্রনাথেব 'উলঙ্গিনী নাচে বণরঙ্গে' পদটি। নৃত্যপরা চামুণ্ডার সে এক অদ্ভূত মূর্ত্তি! জননী উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার প্রমত্ত নৃত্যে চতুর্দ্দিক অন্ধকাব হইয়া গিয়াছে, সেই নিবিড অন্ধকারে বহ্নিশিখা-সদৃশ রাঙা রসনা; পতঙ্গদল মরিবাব জন্যই সেই রসনা রূপ বহ্নিশিখার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উদ্দাম নৃত্যবশে কৃষ্ণকেশবাজি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সূর্য-সোম সভযে আত্মগোপন করিতেছে। কৃষ্ণ-অঙ্গে বিগলিত রাঙা রক্তধারা, তাঁহার ভ্রূভঙ্গে কম্পিত ত্রিভুবন।

নিবিড অন্ধকারে প্রলয়-নৃত্যে বিভোরা উলঙ্গিনী শ্যামাব এই সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি, তাঁহার প্রচণ্ড গতির প্রত্যাঘাতে কম্পিত গ্রহ-উপগ্রহেব সন্ত্রস্ত চিত্র, শিল্পীর হস্তস্পর্শে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য ভক্ত নাট্যকার গিবিশচন্দ্র ঘোষেব 'মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়' অথবা 'বিষমোজ্জল জ্বালাবিভাসিত কপাল, খলখল করালহাসিনী' পদগুলি। দ্বিতীয় পদটিতে 'কাদম্বিনী-বরণী', 'লক্লক্ রুধির-লোলুপ দশনা',—রুধিরলিপ্ত প্রকট দশনা, অস্থিচর্ম্মসার, কঙ্কালমালিনী, নরকরকিঙ্কিণীবেষ্টিত কটি, 'আসবপানমগনা', 'শবাসনা' ভয়ঙ্করী শ্মশানবাসিনী কালীর এক সজীব বিগ্রহ চিত্রিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদের 'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে', ঈশ্বর গুপ্তের 'কে রে বামা, বারিদবরণী, তরুণী' এবং কমলাকান্তের 'নব জলধরকায়, কালোরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়' পদগুলিও ভাবের দিক হইতে ও বর্ণনার দিক হইতে অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে।

॥ ছয় ॥

মূর্ত্তিরহস্য

তন্ত্রাদিতে যে অসংখ্য দেবীমূর্ত্তির বর্ণনা রহিযাছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বভাবিক। হিন্দুব মূর্ত্তি খামখেয়ালী কল্পনা নয়। প্রত্যেকটি মূর্ত্তিই এক-একটি ভাবের প্রতীক। হিন্দু জাতি ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের কল্পিত মূর্ত্তিগুলিও ভাবার্থপূর্ণ: "ভাবপ্রবণ বলিযাই আভাসাত্মক। ব্যক্তের ভিতব দিয়া অব্যক্তের আভাস প্রদান করিবাব আকাঙ্ক্ষাই তাহাব প্রধান আকাঙ্ক্ষা।...মূর্ত্তিগুলি লৌকিক ও অলৌকিকের সমাবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়।"[১] এমন কি প্রত্যেকটি মূর্ত্তির বর্ণ, তাঁহার অঙ্গভঙ্গি, হস্তস্থিত প্রহরণ বিন্যাস, পদের আলীঢ়-প্রত্যালীঢ় অবস্থানটি পর্য্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ।

তন্ত্রগ্রন্থে কতকগুলি মূর্ত্তির রহস্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে, কতকগুলিব হয় নাই। তন্ত্রের মতে 'বিদ্যা' গোপনীয়া 'গুহ্যাদগুহ্যতমং গুহ্যমূহনীবং প্রযত্নতঃ'; এই জন্যই গুরু-শিষ্য ব্যতীত বিদ্যাগুপ্তি তন্ত্রের বিধান। বিশেষ করিয়া যে সকল বিদ্যা ও বিদ্যার সাধন রহস্যময়, তাহাদের ব্যাখ্যা তন্ত্রশাস্ত্রে নাই।

সংস্কৃত তন্ত্র ও পুরাণ ব্যতীত বাঙলা ভাষায় যে সকল শক্তি-বিষয়ক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলির মধ্যে মাতৃমূর্ত্তির কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'মহিষমর্দ্দিনী'র রূপ ও 'কমলে কামিনীর' রূপ বর্ণিত হইয়াছে। 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' কাব্যগুলিতে 'চামুণ্ডা বা কালিকা' এবং কালিকামঙ্গল কাব্যে 'কালী'র বর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা করিযাছেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ, শিবচন্দ্র সরকাব প্রমুখ কবি তন্ত্রোক্ত ধ্যানগুলির অনুবাদ করিয়াছেন। ধুলুক পরগণার বন্দ্যবংশজাত শ্রীনন্দকুমাব কবিরত্ন ১২৩৮ সনে 'কালীকৈবল্যদায়িনী' গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় বচনা কবেন, তাহাতেও দশমহাবিদ্যা রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই মূর্ত্তিগত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যা

তন্ত্র ও শাক্তপদাবলীর মূর্ত্তি-রহস্য ব্যাখ্যার কথা পরে বলিতেছি। দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি-রহস্যের কথা বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাখ্যা করেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ সাগরিকা, পঞ্চম উচ্ছ্বাস—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

তাঁহার 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যখানি নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য বিবর্ত্তনবাদের আলোকে তিনি কালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অবশ্য হিন্দুর 'দশাবতার'-স্তোত্রের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি রূপের মধ্যে যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন তন্ত্রে এই দশাবতারের সহিত দশমহাবিদ্যার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে :

কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী ।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃস্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ ॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহ স্যাদ্ বরাহশ্চৈব ভৈরবী ।
সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্ বামনো ভুবনেশ্বরী ॥
কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাদ দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী ।[১]

কিন্তু ইহাতে সভ্যতার ক্রম-বিকাশের কোন ইঙ্গিত, বা বিকাশ ধারার কোন পরিচয় নাই।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দশমহাবিদ্যা' রূপগুলির মধ্যে সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারাটি সুস্পষ্ট করিয়াছেন : 'হেমবাবু দেবীর দশমূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।'[২] তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, জীবলীলা দুঃখসর্ব্বস্ব নয়, ইহার মোচন আছে, জীব-জগৎ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। দশমহা-বিদ্যার দশটি রূপ তাহারই প্রতীক।

'কালী'রূপ সৃষ্টির প্রথম স্তরের রূপমূর্ত্তি। সেই অবস্থায় মহার্ণবে কেবলই ধ্বংসলীলা, জীবগণ পরস্পর পরস্পরকে হননোদ্যত। এই সংহার লীলার প্রতীক চামুণ্ডা কালী :

রুধির বদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা
বহ্নি-বরুণ-বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে।
জড় প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে
নৃমুণ্ড-মালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে ॥

ইহার পরে 'তারা' মূর্ত্তি, প্রথম মানব সভ্যতার প্রথম প্রকাশ। এইখানে জ্ঞানের প্রথম অঙ্কুর। জীব তখনও উদর-সর্ব্বস্ব, পরস্পর হানাহানিতে রত; মা তাই

১। মুণ্ডমালাতন্ত্র, শব্দকল্পদ্রুম ধৃত 'মহাবিদ্যা' শব্দ দ্রষ্টব্য।
২। দশ মহাবিদ্যা প্রবন্ধ—সমালোচনা সংগ্রহ (কঃ বিঃ) ।

'লম্বোদরা', 'মুমুণ্ডমালিনী'—কিন্তু তিনি উলঙ্গিনী নহেন, 'ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরা'। সংসার-চিতার মধ্যে দেবীর দ্বিপদে পদ্ম, উহা জ্ঞানের সূচক। তৃতীয় স্তরে দেবী 'ষোড়শী'। জীব তখন দাম্পত্য প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ, শৃঙ্গার সজ্জায় সজ্জিত 'শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী' প্রেম বিস্তার করিয়া জীবকে প্রণয়-পাশে বাঁধিতেছেন। তাহার পরে মায়ের 'ভুবনেশ্বরী' মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বমঙ্গলা মাতা। মুখে তাঁহার প্রশান্ত হাসি, হস্তে অভয়-বর। সন্তানকে স্নেহ দান করিয়া তিনি জীবকে স্নেহ-শিক্ষা দিতেছেন। ভুবনেশ্বরী বিশ্বব্যাপী অপত্যস্নেহের প্রতিমা। দেবীর 'ভৈরবী' মূর্ত্তি সভ্যতার পঞ্চম স্তরের প্রতীক; দেবী রক্তাম্বর-পরিহিতা, মাল্যে সুশোভিতা, তাঁহার হস্তে জ্ঞান ও অভয়, যেন তিনি জীব-হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার করিতেছেন—'ভক্তি-বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী।' ইহার পরে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে মানুষ স্ত্রীকে ভালবাসিত, পুত্রকে-ভালবাসিত, এখন সর্ব্বমানবের প্রতি তাহার প্রীতি বিস্তৃত হইয়াছে। দেবীর 'মাতঙ্গী' মূর্ত্তি তাহার প্রতীক:

প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্বজীব দুঃখ দলে।
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে

সভ্যতার সপ্তম স্তরের মূর্ত্তি 'ধূমাবতী'। ধূমাবতী বিধবা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা, শুভ্রচ্ছদা, বিমুক্তকেশী। মানুষও শ্রমক্লান্ত, ক্ষুধাকাতর, শ্রমের ফসলে সকলের আহার্য্য সংগৃহীত হয় না। দেবী হস্তস্থিত কুলার বাতাসে জীবের শ্রান্তি অপনোদন করিতেছেন। তাহার পরে সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে; দারিদ্র্যের সহিত মানুষের সংগ্রাম 'বগলা' মূর্ত্তির মধ্যে প্রকট। দেবী এখানে 'দারিদ্র্য-দলনী'। ইহার পরে মানুষের মধ্যে মদমত্ততা জাগিয়াছে, জাগিয়াছে পরস্পরকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি। সে অবস্থায় মানুষের স্বরূপ অনুদ্ঘাটিত থাকে নাই। প্রীতি-সম্পন্ন মানুষের স্বার্থান্ধ উৎকট বিকট মূর্ত্তি 'ছিন্নমস্তা' দেবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে মানুষ আত্মদান করিয়া জগতের কলুষ নিবারণ করিতে চাহিয়াছে, ছিন্নমস্তার নিজ করে নিজ মুণ্ড ছেদন সেই ভাবের প্রতীক। এই মূর্ত্তি একদিকে মদোন্মত্ত মানুষের নিকট নগ্নতার প্রকাশ, অন্যদিকে প্রেমিক মানুষের জগৎ-কল্যাণে আত্মদানের নিদর্শন। সভ্যতার শেষস্তরে দেবীর 'কমলা' মূর্ত্তি। এই স্তরে জীব দুঃখ-শোক-তাপ-মুক্ত, প্রশান্ত, একে অন্যের প্রতি মমতাযুক্ত। ইহা বদ্ধজীবের মুক্তাবস্থা; জীবের শেষ লক্ষ্য এই অবস্থা—ইহা 'সর্ব্বসুখসদ্ম'। মানুষ এখানে লীলা-বিভোর, দেবীও তাই 'লীলারসে নিমগন':

কিবা বেশ সুমোহন লীলারসে নিমগন
পরমা প্রকৃতি সতী সর্ব্বশেষ ভুবনে।...
পদ্মাসনা করে পদ্ম সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব-দুঃখ হরিছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অভিমত

'আন্তরীক্ষ কবি' হেমচন্দ্র যেমন বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তিতে দশমহাবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার আবার তেমনই মাতৃমূর্ত্তিগুলিকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "প্রথম দুই দশায় কালী ও তারা মূর্ত্তি আর্য্য-দস্যু বিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তস্নান করিত, এ সেই তখনকার মূর্ত্তি।...তাহার পর ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি...তখন ভারত রাজ্ঞী, ভারতে শান্তি।...তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব...ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থের এই সময়ে অত্যন্ত আড়ম্বর, যোগের জপের বড়ই আড়ম্বর...তান্ত্রিককালের ভারতের মূর্ত্তি...ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী। ষষ্টিদশায় তন্ত্রপ্লাবন। ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি। স্বার্থপরতা ও স্বার্থশূন্যতা, উভয় যোগে নিষ্পন্না ক্রোধের বাতুলতা, নৃশংসতা, শোণিতস্পৃহা, কুৎসিত কামপ্রবৃত্তি, নির্লজ্জতা—এইগুলি এ মূর্ত্তির সমবায়ী কারণ।...ভারতমাতার এক্ষণে ধূমাবতী অবস্থা...বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষা, শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়, সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে!...তাহার পর মাতা আবার 'বগলা' মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন, ভারতমাতা আবার রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। মা ইহার পর 'মহালক্ষ্মী' রূপে ভবে দেখা দিবেন:

সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরষে॥[১]

এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবি ও সাহিত্যিক নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তিরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও

১। দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধ, অক্ষয় চন্দ্র সরকার; প্রবন্ধকার কবিতার উদ্ধৃতি ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে লইয়াছেন।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মায়ের জগদ্ধাত্রী, কালী ও মহিষমর্দ্দিনী রূপগুলিকে দেশমাতৃকার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপের বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, ভাবীকালের দেশমাতৃকার দশভুজা মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

দেবীমূর্ত্তির শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাখ্যা

দেবীমূর্ত্তির এহেন ব্যাখ্যা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, কাল্পনিক। 'প্রাধানিক রহস্য' ও 'বৈকৃতিক রহস্য' বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হিসাবে মূর্ত্তিগুলি প্রকট হইয়াছিল। জীব-জগতের জ্ঞানে, কর্ম্মে, ঐশ্বর্য্যে সেই এক মহাশক্তিরই প্রকাশ। তিনিই শুদ্ধা সত্ত্বগুণময়া রূপে 'মহাসরস্বতী'; ইনিই বাণী, বেদগর্ভা, ধীশ্বরী; ইনিই বিশ্বের সৃজনী-শক্তি 'ব্রাহ্মী' (ব্রহ্মার শক্তি)। দশমহাবিদ্যার 'ভৈরবী' এই সৃজনী-শক্তি, জ্ঞান-দীপ্তির প্রতীক:

জপমালা এক করে জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ। (মহাতাবচাঁদ)

মহামায়ার বিপুল সম্ভূতির অন্যতম প্রকাশ 'মহালক্ষ্মী'; ইনি প্রধানা প্রকৃতির রাজসিক বিকার; জগতের কল্যাণ, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, ধৃতি ইঁহারই বিভূতি। তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের মত দেহবর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনের মত ভূষণ, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে ইনি অনুপম। 'সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা' রূপে তিনি এ য়িনী, 'ভুবনেশ্বরী' রূপে তিনিই জননী, দয়ার প্রকাশরূপে তিনি 'মাতঙ্গী', কল্যাণী শ্রীর প্রতীকরূপে তিনি 'কমলা'। সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ করেন বলিয়াই তিনি অপরূপ শোভাসম্পন্না: সৃষ্টির সামঞ্জস্য, প্রকৃতির মাধুরী, হৃদয়ের প্রীতি, বাৎসল্য, দয়া, স্নিগ্ধতা তাঁহার: 'She throws the spell of the intoxicating sweetness of the Divine : to be close to her is a profound happiness and to feel her within the heart is to make existence a rapture and a marvel ; grace and charm and tenderness flow out from her like light from the sun and whereever she fixes her wonderful gaze or lets fall the loveliness of her smile, the soul is seized and made captive and plunged into the depth of an unfathomable bliss.' (Mother—Sri Aurobindo).

মহাশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকাশ 'মহাকালী' রূপে:

সা ভিন্নাঞ্জন সঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিত বরাননা।
বিশাললোচনা নারী বভুব তনুমধ্যমা॥

খড়্গাপাত্র শিরঃ খেটৈরলঙ্কৃত চতুর্ভুজা।
কবন্ধ হারমুরসা বিভ্রানা শিরসা স্রজম্॥ (প্রাধানিক রহস্য)

দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা এই মহাকালীরই এক-একটি রূপ। ইনি বিরাট শক্তির প্রস্রবণ। ইঁহার নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হয়, 'সূর্য সোম লুকায় তরাসে', মহাকাল ইঁহার পদতলে পতিত হন, সকল বাধা, সকল বিপত্তি ইঁহার প্রচণ্ড নৃত্যচ্ছন্দে বিদূরিত হইয়া যায়: 'There is in her an overwhelming intensity, a mighty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle!' (Mother—Sri Aurobindo), ইনিই স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা কালী'—মহাভয়ঙ্করী, প্রলয় ও মৃত্যুর প্রতীক, ধ্বংসের এক অধিনায়িকা, লোলজিহ্বা, এলোকেশী। কিন্তু মরণ-যজ্ঞের এই অধিকর্ত্রী, কেবলই ভীমা-ভয়ঙ্করী নহেন, ইনি সুস্নিগ্ধ শ্যামল; তাঁহার রুদ্র হাসিতেও অমিয়া ঝরে, অঙ্গকান্তিতে ভুবন পূর্ণ হয়, 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি'। জীবরক্ষা হেতু তিনিই হাতে বরাভয় ধারণ করেন। তাঁহার করুণাঘন নয়ন হইতে অনন্ত করুণা বিশ্বজগৎ প্লাবিত করে, তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় অভয় চরণ ভক্তকে সকল বিপদে আশ্রয় দেয়, তাঁহাকে সর্ব্বার্থসিদ্ধি মোক্ষ প্রদান করে: 'শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।'

বস্তুতঃ কালীমূর্ত্তি যেন সকল বৈপরীত্যের আধার: বিষম গুণ ও ক্রিয়া, রূপ ও অরূপের এক অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয়। তাহার মূর্ত্তিতে, গুণে, ক্রিয়ায় অনন্ত বৈপরীত্যের সমাবেশ। তাঁহারই 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ', হাতে খড়্গ ও বরাভয়, বর্ণে সুস্নিগ্ধ শ্যামল ভয়ঙ্কর কৃষ্ণত্ব: 'Her Love is as intense as her warth' (Sree Aurobindo); 'মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ', তিনি তাহারই প্রতীক, মরণে তিনিই অমৃতস্বরূপ: তিনিই 'Fierce and terrible along with the beautiful and the delightful'; ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, ভোগ ও মোক্ষ, মরণ ও জীবন, দুঃখ ও আনন্দ তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই দান। এই জন্যই ভক্তজনের অতি প্রিয় এই 'কালীমূর্ত্তি'। পশু, বীর, দিব্য সকল ভাবের সাধকের প্রিয়তমা জননমূর্ত্তি 'কালী'; বিশেষ করিয়া বীর সাধকের। স্বামী বিবেকানন্দ কহিতেন, 'আমি মায়ের ঘোর রূপের উপাসক।' জগতের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র তাঁহার দৃষ্টিতে নির্ম্মম জগতের যে রূপ উদঘাটন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনি 'মৃত্যুরূপা কালী'কেই দেখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুরূপা, তিনিই আবার অতি সুন্দরী; তাই স্বামীজী বলিতেন.

Lo ! how all are sacred by the terrific
None seek Elokeshi whose form is death...
Thou dreaded Kali, The all-destroyer
Thou alone art True.

তন্ত্রমতে কালীমূর্ত্তির ব্যাখ্যা

তন্ত্রাদিতে 'কালী' রূপেরই প্রাধান্য, সগুণ প্রকাশ-শক্তির মধ্যে কালীই 'আদ্যা'। কালী নামটিরও অর্থ তন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইযাছে—

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কাল সংগ্রহণাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্য কালীতি গীয়তে॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥[১]

প্রাণীমাত্রকে সংহার করেন বলিযা যিনি মহাকাল, তাঁহাকে তুমি কলন কর (সংহার কর), এইজন্য তোমার নাম আদ্যা, পরা, কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর, এই জন্য তুমি কালী। সর্ব্বকালত্ব ও সর্ব্বাদিত্বহেতু তুমি আদ্যা কালী। মহাপ্রলযের পর পুনর্ব্বার স্বরূপ অবলম্বন করিযা তমোরূপে আকারহীন অবস্থায বাক্য-মনের অগোচর হইযা তুমি একাই বর্ত্তমান থাক।

এখানে 'কালী' নাম, এবং তাঁহার তমঃ-কৃষ্ণবর্ণের কারণ অনুমান করা যাইতেছে। প্রলয়কালে যখন কিছুই থাকে না, তখন থাকে শুধু মহাশূন্য তমস্; এই তমস্ পরাপ্রকৃতি কালী। প্রলয়কালে এই তমস্ বা কালীতেই সৃষ্টি প্রলীন হইয়া যায, এই জন্য তিনিই আদ্যা, তিনিই পরা॥

গুণ ও ক্রিয়া অনুসারেই দেবীর রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে—'গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্'। এক কালীমূর্ত্তির রহস্য বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। কালী কৃষ্ণবর্ণা, 'মেঘাঙ্গী'; শ্বেত-পীতাদি সমস্ত বর্ণই কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই কারণেই নির্গুণা, নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। কালীর ললাটে 'চন্দ্রকলা', 'অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে'—

১। মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্থ উল্লাস, ৩১, ৩২, ৩৩।

কারণ তিনি নিত্যা, অব্যয়, চির অমৃতের আধার ; অমৃতত্ব হেতুই তাঁহার ললাটে সুধাকর চন্দ্র :

নিত্যায়া কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥

মায়ের তিনটি নয়ন, 'কালী ত্রিনয়নী' ; এই নয়নত্রয় চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি। ইহাদের দ্বারা তিনি নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন :

শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকা জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥

তিনি সমুদয় প্রাণীকে গ্রাস করেন, কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন, প্রাণীর রুধিরধারায় বদন সিক্ত থাকে, তাই 'শ্যামা দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধিরধারা করালবদনী।' তিনিই আবার সময়ে সময়ে জীবকে রক্ষা করেন, নিজ নিজ কার্য্যে জীবগণকে প্রেরণ করেন—এই জন্যই তাহার হস্তে 'বরশ্চাভয়মীরিতম্'। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অবস্থান করিতেছেন, তাই তিনি 'রক্তপদ্মাসনস্থিতা'। তিনি চিন্ময়ী, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপিণী, তাই মোহময়ী সুরা পান করিয়া তিনি ক্রীড়ারত কালকে লক্ষ্য করিতেছেন—এইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে।[১]

এই ব্যাখ্যার সহিত 'মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং' আদ্যাকালিকার ধ্যান ও রূপমূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, কালীমূর্ত্তি কত গূঢ় ভাবের প্রতীক ; স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মনে করেন, সাংখ্যে যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মূলাশ্রয়েই তন্ত্রের কালিকামূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। "প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখাদিশূন্য ; ইনি অকর্ত্তা, কোন কার্য্যই করেন না, সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে সেইদিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সন্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত। তজ্জন্য পুরুষ দেবীর ক্রিয়াধার রূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীদেবীর মূর্ত্তি মহাদেবের উপর সংস্থাপিত।"[২]

কালীমূর্ত্তির মত প্রত্যেক মূর্ত্তিই এক-একটি মহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল

১। দ্রষ্টব্য মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ত্রয়োদশ উল্লাস, ৫, ১২
২। তান্ত্রিক গুরু, যুক্তিকল্প, পৃঃ ৪, ৫

মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে করিতে সেই মহাভাব সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়; তখন সাধক রূপের অন্তরালে অরূপকে, সান্তের মধ্যে অনন্তকে, গুণের মধ্যে নির্গুণকে উপলব্ধি করিতে পারেন; মূর্ত্তি-কল্পনা ও মূর্ত্তি-পূজার ইহাই নিগূঢ় রহস্য।

শাক্তপদাবলীর ব্যাখ্যা

শাক্তপদাবলীর কবিগণ পুনঃ পুনঃ এই রহস্যের প্রতি লেখনী-সঙ্কেত করিয়াছেন; তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, জগৎ-কারণ-রূপিণী মহাশক্তি স্বরূপতঃ অচিন্ত্য, অব্যক্ত। তিনি একাধারে সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সাকার ও নিরাকার। তাঁহাকে 'কঃ বেদিতুমর্হতি'—কে জানিতে পারে? তাহা একটি মহাভাব, সে মহাভাব কোন স্থূল ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। জ্ঞানী সাধক জ্ঞানের আলোকে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তিনি বুঝিতে পারেন, এই মাটির মূর্ত্তি, মৃন্ময়ীমূর্ত্তিমাত্র নহেন, মাটিতে তাহা গড়া যায় না,

> মাটির মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,
> মা বেটী কি তেমন মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥ (রামপ্রসাদ)

তিনি যে অনন্তরূপিণী; বিরাট বিশ্বই তাঁহার রূপ, 'সে রূপেতে ভুবন আলো।' রূপের বিভায় দৃশ্যমান রূপ-জ্যোতি পরিম্লান হইয়া যায়; জগতের রূপ তাঁহার প্রত্যঙ্গে খেলা করে, 'সূর্য্য তাঁহার নখে নখে।' বৈদিক সহস্রশীর্ষ পুরুষের মত তিনি বিশ্বরূপিণী:

> ধরে রে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ
> সহস্র চরণে করে অজস্র চরণ
> সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়
> সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে! (গোবিন্দ চৌধুরী)

যিনি স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম; যিনি বিরাট, তিনি বিরাট হইতেও বিরাট, অচিন্ত্য। তিনি যে অরূপ ব্রহ্মময়ী। ইনি 'যোগীর যোগে পরমতত্ত্ব', নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার অরূপরাশি বিচ্ছুরিত হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে তিনি 'আধারাদি ষট্চক্রে' বিচরণ করেন, যোগীর সমাধি-মন্দিরে তিনি 'একা, অদ্বিতীয়া': 'তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গুহাবাসী।' সাধক কবি এই কথাটি বুঝাইতে গিয়াই বলিয়া উঠেন,

> ওঙ্কার মূরতি রে মন, জান না কি উহারে
> ওই তো করেছে বিশ্ব রচনা। (গোবিন্দ চৌধুরী)

কায়া ধরিয়া যিনি স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকট হন, যিনি এক হইয়াও বহুরূপে অবতার গ্রহণ করেন, যিনি শ্যাম ও শ্যামা, রাধা ও কালী, যিনি আবার হরি, হর, ব্রহ্মা—তিনিই পরাপ্রকৃতি

মহামায়া, 'ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঙ্কারে'। মহামায়ার এই স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়।

শাক্তপদাবলীর শক্তির সাধক কবিগণ মায়ের এই স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে অনন্ত বৈপরীত্যের সমন্বিত রূপ-মূর্ত্তি, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, ধ্বংস-যজ্ঞের অভিনয়ে কালীই বিশ্বজগতে কল্যাণ বহন করিয়া আনিতেছেন, নির্ম্মম আঘাতে মোহবন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি নৃত্যের ছন্দে সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, চিত্তে মুক্তির আলো-সম্পাত করিতেছেন। আপাত দৃষ্টিতে 'কালী' কৃষ্ণবর্ণা, দিগম্বরী, উদ্যত-অশনি, ভয়ঙ্করী—কিন্তু সাধক বলেন, 'কে বলে কালী কাল আশীবিষ-ভূষণ ?' কে বলে তাঁহার, 'নাহি বাস দিগ্‌বাস, শবশিব-আসন',—

কে বলে আ মরি ! তোমায় দিগম্বরী
শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী !' (কাঙাল হরিনাথ)

তাঁহারা জানেন, 'অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামাবরণী'; 'অসীম অম্বর সম্বরিতে নারে, তাইতে নাম ধরেছ দিগম্বরী'; তিনি 'উদ্যত-অশনি' কিন্তু তাহা অসুর সংহারের জন্য—'কৃপাহীনের জন্যই কৃপাণ'; 'সভয়ে অভয়া' তিনি। তিনি ভয়ঙ্করী,—একথাও মিথ্যা,

জ্ঞাননেত্রে আমি চেয়ে দেখি তুমি
সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সুন্দরী।

তিনি 'অপরূপ রূপের সিন্ধু'; অর্দ্ধ-ইন্দু তাঁহার শিরঃশোভা, বিদ্যুতের মত চঞ্চল নয়ন, বিদ্যুতের মত শুভ্র দন্তপংক্তি, বিদ্যুতের মত চপল গতি, বিদ্যুদাভার মতই দেহকান্তি। তাঁহার বদনে অমৃত, স্নেহে অমৃতধারা, মুখে 'অমিয়াসম' পিকভাষ।

কে বলে তাঁহার পদতলে শব ? এই শব স্বয়ং শিব, ভক্তের শেষ লক্ষ্য—পরমা সিদ্ধি, তাই মায়ের 'চরণেতেই সব': তাঁহার 'শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষপদ'। ইনিই আবার যোগীর যোগগম্যা—'মণিময়পুরবাসিনী'। ইনিই জ্ঞানীর 'ব্রহ্মময়ী'—'ওঙ্কার-মূরতি', ইনিই ভক্তের স্নেহময়ী জননী, আনন্দময়ী মা, করুণাময়ী সন্তানপালিকা।

মূর্ত্তির এই সূক্ষ্ম রহস্য একমাত্র ভক্ত, যোগী, জ্ঞানীই বুঝিতে পারেন। এই মূর্ত্তি মাটির মূর্ত্তি নয়, ধাতু-পাষাণের মূর্ত্তি নয়, নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ মূর্ত্তি নয়—ইহা মহাভাবের প্রতীক। অন্যের কাছে যাহা মৃন্ময়ী, সাধকের কাছে তাহা চিন্ময়ী; বহিরঙ্গের কাছে যিনি ভয়ঙ্করী, ভক্তের কাছে তিনিই পরমাসুন্দরী, 'অশিবনাশিনী কালী।' এইজন্যই মৃন্ময়ী মূর্ত্তির কথা বলিতে গিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'মাটি কেন গো ! চিন্ময়ী প্রতিমা !'

॥ সাত ॥

জগজ্জননীর রূপকল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব

দশমহাবিদ্যার যে রূপগুলি হিন্দুতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাদের উল্লেখ শাক্তপদাবলীতেও আছে, তাহাদের সবগুলি হিন্দুর কল্পনা কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। শাক্তপদাবলীর জগজ্জনীর স্থূল মূর্ত্তিগুলি যে হিন্দুতন্ত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; শাক্তপদাবলীর সাধকগণ কেহই বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন না। কি মূর্ত্তি-কল্পনায়, কি দেবতার্চ্চনায় তাঁহারা সর্ব্বথা হিন্দুভাবাপন্ন। হিন্দু তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিই তাঁহারা পূজা করিতেন, হিন্দুতন্ত্রের সাধন-পদ্ধতিই তাঁহারা অনুসরণ করিতেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, হিন্দুতন্ত্র কি ভাবে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মনে করেন, বেশির ভাগ হিন্দু তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাবে রচিত হইয়াছে: 'The developments on Tantra made by the Buddhsits and the extraordinary plastic art they developed, did not fail again to create an impression on the minds of the Hiudus and they readily incorporated many ideas, doctrines and gods, originally concieved by the Buddhists in their religion and literature···The bulk of literature which goes by the name of the Hindu Tantras, arose almost inmediately after the Budhist ideas had established themselves.'[১]

অবশ্য বাঙলাদেশে এমন একটি যুগ গিয়াছে, যখন বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাব এদেশে যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। পালরাজাদের সময়ে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি দিক্‌পাল পণ্ডিত তন্ত্রের চর্চ্চা ও সাধনা করিয়াছেন। হিন্দু তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ কাপালিক একদিন এদেশে অতি ঘনিষ্টভাবে পাশাপাশি বসবাস করিয়াছেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাব এবং তাঁহাদের কয়েকটি দেবদেবী হিন্দু-তন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাঙলার বাশুলী (বিশালাক্ষী), মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে পূজা পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, কত হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, বাঙলাদেশের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। বৌদ্ধ বা আর্য্যেতর

১। Indro. to Sadhanmala—vol II.

কয়েকটি দেব-দেবী প্রাণান্তপাত সংগ্রামের পর হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্টহইলেও, হিন্দুর দশমহাবিদ্যার' প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধতন্ত্র হইতে হিন্দুতন্ত্রে আসিযাছে, এ উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য নয়।

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সাধনমালা'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'Hindu goddesses like Mahachintara, Chinnamasta, Kali etc. were originally Buddhists' : তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, 'তারার ধ্যান ও সাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত আছে এবং দুইটি ধ্যান মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তান্ত্রিকেবা মহাচীনতারার উপাসনা ও মূর্ত্তি-কল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিযাছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।…॥বজ্রযোগিনী॥ রত্নসম্ভব কুলের এই দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয়…ইহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দুদেবী ছিন্নমস্তার মত। বোধ হয় বৌদ্ধবজ্রযোগিনী হিন্দু ছিন্নমস্তাতে পরিণত হইযাছিলেন এবং তাহাবও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।' (বৌদ্ধদের দেবদেবী)

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কমলাকে 'কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাৎ' বলা হইযাছে।

অতএব ইঁহাদের মতে, কালী, তাবা, ছিন্নমস্তা এবং কমলা মূর্ত্তি ও তাঁহাদেব উপাসনা হিন্দুগণ বৌদ্ধ তন্ত্র হইতেই গ্রহণ কবিবাছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক, 'তারা' ও ছিন্নমস্তা' দেবীর ধ্যান, মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতিব মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের হাত পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিযা এই সকল দেবতা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

'কালী' কোনক্রমেই বৌদ্ধদেবতা নহেন। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'তারা' বৌদ্ধদের প্রধান দেবী। গোবর্দ্ধন আচায্যেব 'আয্যা সপ্তশতী' গ্রন্থে 'তারা' যে শ্রুতি-বিরোধী, জিন-সিদ্ধান্তস্থিতি (অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবতা), সে সম্পর্কে এই দ্ব্যর্থক শ্লোকটি পাওয়া যায় :

অতিপূজিত তাবেয়ং দৃষ্টিঃ শ্রুতিলঙ্ঘনক্ষমা সুতনুঃ।
জিন-সিদ্ধান্ত-স্থিতিরিব সবাসনাং কং ন মোহয়তি॥

অতএব 'তাবা' যে বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। হিন্দুতন্ত্রে 'তারা'-মূর্ত্তির কল্পনায়—'মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্' এবং 'পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্' বলিয়া উল্লেখ আছে। 'অক্ষোভ্য' পঞ্চধ্যানি-বুদ্ধের অন্যতম বুদ্ধ এবং 'মহাচীনতারা' তাঁহারই কুলের দেবতা। 'পঞ্চমুদ্রা' কথাটিও বৌদ্ধ প্রভাব সূচনা করে। উপরন্তু তারা-পূজায় যে জল ও পুষ্প নিবেদন করা হয়, তাহাদিগকে 'বজ্রোদক,' 'বজ্রপুষ্প' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'তারা' দেবী বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দুতন্ত্রে স্থান লাভ-

করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্ব্বাংশে সত্য নয়। 'তারা'র পূজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের হাত পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দেবী বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভবের পূর্ব্বেই হিন্দুদের মধ্যে দেবীরূপে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 'রামায়ণ', 'মহাভারত,' ও 'পুরাণ'গুলিতে 'তারা' নাম অজ্ঞাত ছিল না। বালীর স্ত্রীর নাম 'তারা', বৃহস্পতির পত্নীর নাম 'তারা'। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বৃহস্পতিগ্রহ কুপিত হইলে 'তারা'র উপাসনা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুদের প্রধান নক্ষত্র-দেবতা 'তারা'। এই নক্ষত্র-দেবতাগণ বহু প্রাচীনকালে হিন্দুর দেবতাসঙ্ঘে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। শরবনে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইলে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ তাঁহাকে পালন করেন; কার্ত্তিক যখন দেবসেনাপতিরূপে দেবতাসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন এই নক্ষত্রগণ তাঁহার নিকট ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরীর মত দেব-মর্য্যাদা দাবি করিয়াছিলেন; স্কন্দ তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ করায়, নক্ষত্রমাতৃকাগণ অন্যান্য দেবতার মতই পূজনীয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য মহাভারত, বনপর্ব্ব; ২২৯ অঃ)

এইভাবে বুদ্ধদেবের বহুকাল পূর্ব্বে নক্ষত্রদেবতা 'তারা' মাতৃকাশক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে (থেরীগাথায) হিন্দুর উপাস্য দেবতারূপে স্বীকৃত 'তাবতিংসা চ যামা চ তুসিতা যাপি দেবতা'র উল্লেখ দেখা যায়। এখানে 'তাবতিংসা' বলিতে তেত্রিশ বৈদিক দেবতা, 'যামা' বলিতে নক্ষত্রদেবতা এবং 'তুসিতা' বলিতে ভূতপেত্নীর মত উপদেবতা বুঝাইতেছে (দ্রষ্টব্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'থেরীগাথা')।

অতএব 'তারা'রূপী শক্তিদেবতা যে হিন্দুদের বহু প্রাচীনকালের দেবতা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া 'তারা' মূর্ত্তির পরিকল্পনায় যে 'অক্ষোভ্য' কথাটি পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধদের ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য নহে, ইনি হিন্দুপুরাণের নাগরূপী অক্ষোভ্য। 'পঞ্চমুদ্রা' বলিতে হিন্দুতন্ত্রে শ্বেতাস্থিনির্ম্মিত পট্টিকাপঞ্চক বুঝায়, উহাও বৌদ্ধদের 'কণ্ঠিকারুচকংরত্নকুণ্ডলংভস্মসূত্রকম্' (সাধনমালা) প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রার প্রতীক নয়। সুতরাং হিন্দুতন্ত্রের 'তারা' বৌদ্ধতন্ত্রের 'তারা' দ্বারা প্রভাবিত নহেন।

'ছিন্নমস্তা' ও 'কমলা'-মূর্ত্তি সম্পর্কেও অনুরূপ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

শাক্তপদাবলীর 'তারা' মূর্ত্তির কল্পনা হিন্দুতন্ত্র হইতেই গৃহীত। এখানে 'তারা'র দুইটি বর্ণনা আছেঃ একটি শিবচন্দ্র রায়-বর্ণিত, অপরটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বর্ণিত। ইহাদের কোনটিতেই 'অক্ষোভ্য' মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। শিবচন্দ্র রায়ের বর্ণনায় পাই—

নীলবরণী নবীনা রমণী।
নাগিনীজড়িত জটাবিভূষণী।…
নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী॥…

এখানে 'অক্ষোভ্যে'র পরিবর্তে 'নাগিনীজড়িত জটাবিভূষণী' এবং পঞ্চমুদ্রার পরিবর্তে 'ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী'র উল্লেখ দেখা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পদটিতে আছে,—

ঊর্দ্ধ জটাজুট গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব-বিমর্দ্দিনী॥

ভারতচন্দ্রও 'তারা'-রূপের বর্ণনায় 'সর্পবান্ধা এক জটা বিভূষণা' ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

জটা বিভূষণা পিঙ্গলবরণা
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী।

অতএব, বাঙলা কাব্যাদিতে বর্ণিত 'তারা' মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ-প্রভাব-বর্জ্জিত।

তথাপি হিন্দুতন্ত্রের মহাবিদ্যার সহিত বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীদের যে একটা সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ 'বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীয়মাণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেদের উপাস্য ধর্ম্মতত্ত্বকে হিন্দু দেবদেবীর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন…হিন্দুমূর্ত্তির বহিরাবরণে বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বের সারাংশ পরিবেশন করা তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।'[১] এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত বৌদ্ধ তারা-স্তুতিটি উদ্ধার করিতেছি। এই দশপারমিতা, 'প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গ চটুলামৃত পূর্ণধাত্রী' তারা হিন্দুর উপাস্যা গিরিজা-ভবানীর রূপান্তরিত মূর্ত্তি :

দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগদৈকরূপা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥
যানত্রয়েষু দশপারমিতেতি গীতা
বিস্তীর্ণ যানিকজনা কলশূন্যেতি।
প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গ চটুলামৃত পূর্ণধাত্রী
তুভ্যং নমোঽস্তু বপুষা গিরা নঃ॥[২]

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভূমিকা (কঃ বিঃ) ২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডাঃ সুকুমার সেন

দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুতর। হিন্দু দেবদেবীর সহিত বৌদ্ধ দেবদেবীর সৌসাদৃশ্যের অন্যতম কারণ, হিন্দুতান্ত্রিকগণ যে উৎস হইতে তাঁহাদের অধিকাংশ দেবমূর্ত্তি আহরণ করিয়াছেন, সেই একই উৎস হইতে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও দেবদেবীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin : it seems to be a religious under current, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India"[১]

তান্ত্রিকতার এক 'অনাদি উৎস হইতে' হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের দেবদেবীর পরিকল্পনা, পূজাপদ্ধতি নিজ নিজ ধর্ম্মের পরিবেষ্টনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকতার কল্পনা আদৌ করিয়াছিলেন এদেশের মাতৃতান্ত্রিক অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি ; বিশেষ করিয়া এই তন্ত্রাচারের প্রধান ধারক ছিলেন মোঙ্গলীয় বা তিব্বতীয় চীন জাতি। এই জাতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই চীন ও তিব্বতের সংস্কার লইয়া, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ধরিয়া উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্ত-পথে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসাম ছিল ইঁহাদের প্রধান বসতিকেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে হিমালয়ের অধিত্যকা-দেশ ধরিয়া ইঁহারা কাশ্মীর, ভূটান, সিকিম, নেপাল, বঙ্গ, আসাম, এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এক বিরাট বন্ধনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। তান্ত্রিক আচার এই বন্ধনীর মধ্যেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কামাখ্যা, সিরিহট্ট, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান ছিল ইঁহাদের প্রধান লীলাভূমি ; তাই বলা হয়, 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা', বৌদ্ধতন্ত্রেও ইহার স্বীকৃতি আছে (দ্রষ্টব্য সাধনমালা)। এই জাতির প্রভাবে হিন্দু আর্য্যগণ নিজধর্ম্মে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীর কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও ইঁহাদের নিকট হইতেই তন্ত্রাচার আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।' উপরন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রাচার তিব্বত, চীন, মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ চীন হইতে মহাচীনতারা, ভোটদেশ হইতে 'একজটা' (তারার রূপভেদ) প্রভৃতি মূর্ত্তি ও পূজা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব যে উৎস হইতে হিন্দুতন্ত্রের মূর্ত্তি, পূজা-পদ্ধতি পরিগৃহীত, সেই একই উৎস হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি গৃহীত। সেই জন্যই মহাচীনতারার সহিত হিন্দু 'তারা' বা 'একজটা' দেবীর এত সাদৃশ্য, বজ্রযোগিনীর সহিত 'ছিন্নমস্তা'র এত মিল, বৌদ্ধ 'বসুধারা' দেবীর সহিত হিন্দুর 'কমলা' মূর্ত্তির এতটা সামঞ্জস্য। উৎস এক এবং সাধারণ, অতএব উভয়ের মধ্যে যে নানাদিক হইতেই সৌসাদৃশ্য থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

১। Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Dasgupta.

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

উপাসনাতত্ত্ব

॥ এক ॥

সাহিত্যে তান্ত্রিক সাধকের চিত্র

তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ও ভীতিকর ধারণা জনসমাজে প্রচলিত আছে। ইহার সাধন-পদ্ধতির সহিত পরিচয় না থাকার জন্যই এই ভীতিকর ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কাব্যে ও সাহিত্যে যে-সকল কাপালিক-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও উচ্চধরনের নয়। পঞ্চতন্ত্রের কতকগুলি গল্পে তান্ত্রিক সাধকদের অতি হীন চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্ট এবং তাঁহার অন্তেবাসিনী কপালকুণ্ডলার চরিত্র অতি ভয়াবহ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য দেবীর নিকট নরবলি প্রদান, স্বার্থে বিঘ্ন হইলে হীন আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, তীব্র ও জঘন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণতা—প্রভৃতির জন্য এই সকল চিত্র ও চরিত্র বিভীষিকা-পূর্ণ। নিরীহ ষোড়শী যুবতী মালতীর কাতর অনুনয় সত্ত্বেও কাপালিক অঘোরঘণ্ট নির্মম ঃ

অঘোর। (শস্ত্রমুদ্যম্য) যদস্তু তদস্তু ব্যাপাদয়ামি।
চামুণ্ডে ভগবতি মন্ত্র সাধনাদৌ উদ্দিষ্টামুপনিহিতাং
ভজস্ব পূজাম্। (ইতি হন্তুমুপক্রান্তঃ)

এই তো অঘোরঘণ্টের চিত্র। অন্তেবাসিনী কপালকুণ্ডলা অধিকতর প্রতিহিংসা পরায়ণা।

'শঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থে কাপালিকের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা আরও ভয়াবহ। সেখানে কাপালিক উগ্রভৈরব ব্যভিচারী, কুটিল, হিংস্র; কাপালিকদের অধীশ্বর ক্রকচ তদপেক্ষা উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের কাপালিক-চিত্রও উন্নতমানের নয়।

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বাঙলা সাহিত্যেও প্রাচীনকাল হইতে তান্ত্রিক সাধকের যে চরিত্রাবলী চিত্রিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও অতিশয় হীন। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, নরোত্তম বিলাস, ভক্তমাল গ্রন্থাদিতে শক্তিসাধক

১। মালতীমাধব, ৫ম অঙ্ক।

ও শক্তিসাধনার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ইহাদের কলঙ্ক-কালিকাময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বামাচারী শক্তি-উপাসক, কাটোয়ার ফৌজদার জামালপুরের আঢ্য মহাধনবান দেবকীনন্দনের একটি চিত্র উদ্ধার করিতেছি,—

হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন।
দশন উপরে করি চৌকির আসন॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবীপূজা করে এক বড়াই করিয়া॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
মহাভৈরবের ন্যায় আকার হইয়া॥···
ভুমদাম করি চলে দেখিতে করাল।
রক্তচন্দন অঙ্গে জবা পুষ্পমাল॥
কাটা ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনী চক্রেতে বসি করয়ে আহার॥[১]

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাপালিকের যে দৃশ্য দেখাইয়াছেন, তাহাও অতি ভয়ঙ্কর! কাপালিক শবসাধক, অত্যুগ্র হিংসাপরায়ণ:

'নবকুমার দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত, সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল······নবকুমার একটা দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভব করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ বহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন।'[১] (কপালকুণ্ডলা ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বা 'বিসর্জ্জন' নাটকে শক্তি-সাধক রঘুপতির মধ্যেও শক্তি-সাধনার ব্যর্থতার কথাই পরিস্ফুট হইয়াছে। রঘুপতি কালীমূর্ত্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে শক্তি-মূর্ত্তির অপব্যাখ্যাই করা হইয়াছে:

১। ভক্তমাল, সপ্তদশমালা।

রঘু। মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া, তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তার—(বিসর্জ্জন, ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

* *

সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তাবে, কেহ নাহি পায় তারে!
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়িছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা! (বিসর্জ্জন, ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এইগুলিই সাহিত্যেব কাপালিক-চিত্র। শক্তি-সাধনার যে উচ্চতব আদর্শ ও লক্ষ্য আছে, সেদিকে কেহই অঙ্গুলি-সঙ্কেত কবেন নাই। সে আদর্শ তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গুহ্য সাধনাব বীভৎস, ন্যক্কাবজনক আচরণগুলিই ব্যভিচারী কাপালিকদের মধ্যে প্রকট হইয়াছে, তন্ত্রসাধনার সমুন্নত আদর্শ চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। পঞ্চ ম-কাব তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া লোক ইহাকে নিন্দা করিয়াছে, অপপ্রচারে ও অপব্যাখ্যায় ইহা আরও নিন্দিত হইয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধনাকে কেবল এই দৃষ্টিতেই দেখিযাছেন, "They teach the doctrine of the eating of meat, the drinking of spirits and promiscuous sexual intercourse' (Keith)। এইভাবে সাধনার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়াছেন।

শক্তি-উপাসনা যাদুবিদ্যার উপাসনা নয়, ইহা রসনাতৃপ্তির বা দৈহিক লালসা পরিতৃপ্তির উপাসনাও নয়। ইহা মোহাবৃত, সঙ্কুচিত মানবসত্তার আবরণ-উন্মোচনের সাধনা; মানুষকে শ্রীদ্বারা, শক্তিদ্বারা, বিভূতিদ্বারা মণ্ডিত করিবাব সাধনা; জীবনকে অপূর্ব্ব ছন্দে ও দীপ্তিতে পরিপূর্ণ করিযা তুলিবার সাধনা। মধ্যযুগীয় কোন বাঙলা সাহিত্যেই শক্তিসাধনার এই সমুন্নত লক্ষ্যের ইঙ্গিত নাই। শাক্তপদাবলীর খণ্ড-ক্ষুদ্র সঙ্গীতের মধ্যে শক্তিসাধক কবিগণ তান্ত্রিক উপাসনার সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে প্রতিফলিত করিয়াছেন,—দিব্যভাবের অতি সুন্দর লক্ষ্যের কথা ভাষাছন্দে গৌড়জনবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধারয়াছেন।

তন্ত্রোপাসনার মর্ম্মার্থ

শাক্তপদাবলীর সাধনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উপাসনা-তত্ত্বের মূল কথাগুলি জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে বলে, 'ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।'[১] দুঃখের হাত হইতে আত্যন্তিক মুক্তিই জীবের লক্ষ্য। জগতের চারিদিক হইতে নানাপ্রকার দুঃখ মানুষকে ঘিরিয়া রহিযাছে; মানুষ বা হিংস্র পশু মানুষের উপর অত্যাচার করিতেছে, ঝটিকা-প্লাবনাদি দুর্য্যোগ মানুষের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, আবার রোগ-শোকাদির যন্ত্রণায় মানুষ কাতর হইতেছে। এইগুলিই যথাক্রমে আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও অধ্যাত্মিক দুঃখ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মানুষ এই দুঃখকে অতিক্রম করিতে চায়।

এই দুঃখগুলি অতিক্রম করিতে গিয়া মানুষ লক্ষ্য করে, সাধারণ পুরুষকার দ্বারা এগুলির নিরাকরণ সম্ভবপর নয়, ইহাদের উপশমের জন্য প্রয়োজন অসাধারণ শক্তি। কেহ মনে করেন, এই শক্তি দেহাতিরিক্ত; আবার কেহ ভাবেন, দেহের মধ্যেই এই শক্তি নিহিত। শক্তি যেখানেই অবস্থান করুক, তাহা আছে, তাহার উদ্বোধন আবশ্যক। এই প্রয়োজনবোধ হইতেই উপাসনার উৎপত্তি।

মানুষ তাহার সূক্ষ্ম চিন্তা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছে যে, সমগ্র দুঃখের মূল অজ্ঞানতা। এক পরম কারণ হইতে, এক প্রচণ্ড শক্তির উৎস হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের উৎপত্তি. তত্ত্ব-দৃষ্টিতে উৎসার উৎস হইতে বিভিন্ন নয়। অতএব জগতের এই যে 'আমি' এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক বিশ্বেশ্বরী (বা বিশ্বেশ্বর) 'সে' এক। এই বোধ দৃঢ় হইলেই দুঃখের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, জীব পরমানন্দময় হইয়া উঠে। 'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্'—তত্ত্বোপলব্ধির দিক হইতে এই জ্ঞানই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়। তাই দার্শনিক বলিতেছেন, 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ' (সাংখ্য), 'সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থাঃ বিমুক্তয়ে' (শঙ্করাচার্য্য)।

তত্ত্বোপলব্ধির দিক হইতে ইহাই শেষ কথা। 'তিনিই আমি, আমিই তিনি···যে কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটি আমাদের মনে দৃঢ় হয়, আমরা আমাদের দেহগত আত্মাকে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে পারি—আমি কে, তাহার ঠিকমত নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্যা, তাহাই আরাধনা।'[২]

১। সাংখ্য প্রবচনসূত্র ১।১

২। উপাসনাতত্ত্ব—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩২০)

কিন্তু এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অতি দুরূহ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'জ্ঞানযোগ, বিচারপথ বড় কঠিন। কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহ নই, আমি মন নই' চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখদুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা মৃত্যু কৈ? এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন।'[১]

বস্তুতঃ 'ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এই মহাবাক্যের প্রারম্ভে 'অথ' কথাটির বিরাট ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকায় অধিষ্ঠিত না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব প্রশ্নই উঠে না। উপলব্ধি তো অনেক পরের কথা।

তাই তন্ত্র বলিতেছে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। অবশ্য তন্ত্রসাধনারও শেষ লক্ষ্য পরম শান্ত, শুদ্ধ, অদ্বৈত শিবজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেখানে জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই, 'অহং ইদং' বোধ নাই, সব এক, সব একাকার; কেবল এক শান্ত, জ্ঞানোজ্জ্বল অবস্থা। এই পরা অবস্থা হইতেই শক্তির সূক্ষ্ম ও স্থূল অভিব্যক্তি। শক্তির সূক্ষ্ম প্রকাশও অতি-মানস ব্যাপার, তাই অচিন্তনীয়; ইহা কেবল যোগ-গম্য। মহাশক্তির স্থূল প্রকাশ-গুলিই সাধারণভাবে উপাসনার যোগ্য। ভাস্কর রায় বামকেশ্বর তন্ত্রের 'সেতুবন্ধ' নামক টীকায় বলিয়াছেন, উপাসনার যোগ্য এই রূপগুলিও আবাব স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর এই তিন ভাগে বিভক্ত। বহির্বিশ্বে মহাশক্তির 'করচরণাদ্যবয়বশীল' রূপগুলি স্থূল; কালী, তারা মহাবিদ্যাব রূপগুলিই এই স্থূলরূপ; দেবীব সূক্ষ্মরূপ মন্ত্রাত্মক, বীজমন্ত্রই সেই রূপ। মহাশক্তির পররূপ স্থূলবোধের অতীত।

তন্ত্র-সাধনা আরোহক্রমিক

তন্ত্রের মহাশক্তিব প্রকাশগুলি যেমন অতিসূক্ষ্ম হইতে স্থূলের মধ্যে অভিব্যক্ত অর্থাৎ অবাঙমনসোগোচর হইতে মনোগোচর ও ইন্দ্রিয়গোচব—তান্ত্রিক সাধনার ক্রমটি ঠিক ইহার বিপরীত। সাধনায় স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম ও পরমার্গে যাইতে হয়। মহাশক্তির প্রকাশ অবরোহক্রমিক, কিন্তু সাধনা আরোহক্রমিক। কি উপায়ে ক্রমে ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে পরমতত্ত্বে পৌছানো যায়, তন্ত্র সাধনা তাহারই নির্দ্দেশে পূর্ণ। জীব-প্রকৃতির অতি সাধারণ জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির প্রতি অন্ধত্বের ভান না করিয়া, তন্ত্র 'অন্নময় কোষ' হইতে 'আনন্দময় কোষের' দিকে যাত্রা করিয়াছে। 'কলিজা মানবালুব্ধাঃ শিশ্নোদর-

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ

পরায়ণাঃ'। তাঁহারা 'নিদ্রালস্যপ্রযুক্তাঃ'—ইহা তান্ত্রিকদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তন্ত্র সকল মানুষের জন্যই সাধনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তাহাতে পণ্ডিত-মূর্খ ভেদ নাই, ধনী-দরিদ্র ভেদ নহে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই শক্তি-উপাসনার অধিকারী। ইহা 'সর্ব্বলোকোপকারায়, সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ'। ভোগী অথবা যোগী সকলেই ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখের জন্য তন্ত্র-সাধনার আশ্রয় লইতে পারেন—'তন্ত্রাদিতো মার্গো মোক্ষায চ সুখায চ।'

তন্ত্রোক্ত সাধনায় সকলের অধিকার আছে জন্যই, এই সাধনা ক্রম-বিন্যস্ত। জগতের মানুষ বিচিত্র প্রকৃতির, বিচিত্র রুচির; কেহ সকাম, কেহ নিষ্কাম, ; কাহারও লক্ষ্য প্রবৃত্তির দিকে, কাহারও লক্ষ্য নিবৃত্তির দিকে ; কেহ চায় ভোগ, কেহ চায় যোগ। তন্ত্রের সাধনা তাই ভুক্তি-মুক্তির সাধনা ; দেবী 'ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী'। সাধনার বিষয় ও স্তরগুলিও ক্রম-বিন্যস্ত। কি মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে, কি ধ্যান কল্পনায়, কি পূজাবিধানে সর্ব্বত্রই দ্বিবিধ ব্যবস্থা —স্থূল ও সূক্ষ্ম। সাধারণের জন্য স্থূল ব্যবস্থা আর উচ্চতর সাধকের জন্য সূক্ষ্ম ব্যবস্থা।

মূর্ত্তির বিষয়ে—

সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥ (দেবী ভাগবত)

ধ্যানের বিষয়ে—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মনসগোচরম্॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

পূজার ব্যাপারেও, বাহ্য ও মানস পূজা ভেদে পূজা দুই প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ উপযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্য পূজা বিধেয়—

বাহ্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে॥ (বামকেশ্বর তন্ত্র)

তন্ত্রের এই অধিকার-ভেদের স্তরগুলি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। জীবদেহের পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তন্ত্র সাধন-ক্রমের নির্দ্দেশ দিয়াছে। তন্ত্রোক্ত সপ্ত আচার ও ভাবত্রয় এই ক্রম-বিকাশের ভিত্তিতে পরিকল্পিত।

সপ্তআচার

তান্ত্রিকগণ সমগ্র ধর্ম্ম-সাধনাকে সাতটি আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। এদেশে প্রচলিত প্রায় সকল ধর্ম্মকেই তাঁহারা সাধনার পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। পরম ঔদার্য্যের

সহিত তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, এ বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্ম ও দেবতা এক মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই এক, একই ঐশ্বরিক বিভূতির প্রকাশ :

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম দুর্গা কালী রাধা শ্যাম।
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী॥ (রামলাল দাসদত্ত)

অতএব তাঁহারা বলিতেছেন, সেই পরম একককে উপলব্ধি করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার—এই আচারগুলির ক্রমিক স্তর অতিক্রম করিয়া পরম সিদ্ধি লাভের স্তর 'কৌলাচার' অবলম্বন করিতে হইবে। শক্তিসাধনার আরম্ভ বেদাচাব হইতে, শেষ কৌলাচারের প্রতিষ্ঠায়। আচারগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। বেদাচাব হইতে বৈষ্ণবাচাব. বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার উত্তম ঃ।

দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎসিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥ (কুলার্ণব তন্ত্র)

ভাবত্রয়

এই সপ্ত আচার আবার তিনটি ভাবের মধ্যে গ্রথিত , পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব :

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্যং সৎকৌলমুচ্যতে॥ (বিশ্বসারতন্ত্র)

—বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবেব অন্তর্গত ; সিদ্ধান্ত ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল আচারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেহ ও মনকে শক্তি-পূজার উপযোগী করিয়া গঠন করা হয় এবং যাহাতে মদ্যমাংসাদির ব্যবহার না করিয়া অনুকল্প বিধানে পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের সাধন করিতে হয়—তাহা পশুভাবের উপাসনা। 'পশু' শব্দের অর্থ জন্তু নয়, সাধারণ জীব ; এই অর্থেই শিব পশুপতি। তন্ত্রের মতে যে সকল জীব স্থূল জৈবপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, শক্তি সাধনার গুহ্য ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই পশু : 'The term appears to be applicable to a person who is not suited to comprehend occult matters' (Winternitz),

বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত। পশুত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া যাঁহারা দুরূহ শক্তিসাধনায় ব্রতী, তাঁহারাই বীর। 'বীর' শব্দটির অর্থ শারীরিক

বলবীর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি নয়। নিম্নস্তরের জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না যাঁহারা জয় করিয়াছেন, অতি শুদ্ধ শক্তি-সাধনায় শক্তি যাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহারাই 'বীর'। তাঁহারা রজোগুণ-সম্পন্ন : 'They are called Viras because of the natural resistence they put forth to the lower vital being' (Dr. Mahendra Nath Sircar); স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ইঁহারাই মায়ের অন্তরঙ্গ সাধক, 'মৃত্যুরূপা কালী'র একান্ত ভক্ত, ইঁহাদের হৃদয়কন্দরে মায়ের রুধির-রঞ্জিত অসি ঝকমক করে। এঁরা আজন্ম মায়ের অসিমুণ্ড-বরাভয়-করা মূর্ত্তির উপাসক।'

তন্ত্রে বীরভাবের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বীরভাবের সাধনায় স্থূল পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) ব্যবহার করিতে হয়। কলির মানবের সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই মার্গ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং ভাবত্রয়ের মধ্যে অন্যতম, 'বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমম্' (রুদ্র যামল)। কিন্তু এই ভাবের সাধক হওয়া অতি কঠিন ও সাধন-সাপেক্ষ। তন্ত্রোক্ত শবসাধনা, চিতাসাধনা ও চক্রসাধনা যেমন ভয়াবহ, তেমনই দুরূহ। ব্রহ্মচর্য্য-বলে বলীয়ান না হইলে, আত্মিক শক্তি করায়ত্ত না হইলে বীরভাবের সাধনায় পতন অবশ্যম্ভাবী। উপনিষদে বলা হইয়াছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', শ্রুতির এই বলশালী সাধকই তান্ত্রিক 'বীর'। ইনি বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ। কেবল দেহে নয়, মনে ও প্রাণে। সিদ্ধির সৌরভ তাঁহার কাছেই প্রথম প্রকট হয়, ঐশ্বরিক শক্তি-বিভূতির প্রকাশ ঘটে বীরসাধকের মাধ্যমে। Bible-এ বলা হইয়াছে, 'Out of the strong comes forth sweetness'—তান্ত্রিক বীর-সাধনা হইতেই সেই সৌন্দর্য্য-মাধুরীর উন্মেষ ঘটে। অবশ্য মাধুরীর পরিপূর্ণ বিকাশ দিব্যভাবে, বীরভাব তাহার সোপান।

দিব্যভাব ভাবত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এ এক পরম সাত্ত্বিকভাব। ইহার আচার-আচরণ অতি সুন্দর। সিদ্ধযোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর যে অবস্থা, দিব্যাচারী সাধক সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দেহ পবিত্র, হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, দৃষ্টি উদার, চরিত্র মহান্। প্রবৃত্তির সংঘাত তাঁহার মধ্যে থাকে না অন্যহং তিনি শান্ত, সুখদুঃখের অতীত। হিংসা-দ্বেষ নয়, বিশ্বমৈত্রীর ভাবে তিনি পূর্ণ: তাঁহার চোখে 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' তিনি নিরাসক্ত, উদাসীন সদানন্দময়। তিনি শক্তি ও দীপ্তির পূর্ণ আধার; যোগারূঢ় হইয়া তাঁহার যোগ ও ভোগ। দিব্যশক্তির লীলা, দিব্যভাবের জ্যোতিঃ তাঁহার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। এই দিব্যভাবের অবস্থায় উপনীত হওয়াই শক্তিসাধনার চরম লক্ষ্য।

দিব্যভাবের সাধনা বাধাবন্ধহীন নিয়ম ও ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমজ্ঞানের

অবস্থা বলিয়াই, দিব্যসাধকের ক্রিয়া ও চর্য্যা ভাবানুগ, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। কাশী-কাঞ্চী-প্রয়াগে তাঁহার তীর্থস্নানের প্রয়োজন হয় না, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার ত্রিবেণী-সঙ্গমে আনন্দ-স্নান করিয়া তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন; গৃহও তাঁহার নিকট বন্ধনাগার নয়, 'ন গৃহং বন্ধনাগারং'; তাঁহার হৃদয় মাতৃ-অনুরাগের গৈরিকে রঞ্জিত, কাজেই বহির্ব্বাস গৈরিক না হইলেও ক্ষতি নাই। ক্রিয়া-কর্ম্ম সব কিছুই তাঁহার সহজ। পদ্মপত্রস্থিত শুভ্র শিশিরবিন্দুর মত তাঁহার সংসারে অবস্থান। সে অবস্থান নিরাসক্ত উদার, অথচ প্রেমে পূর্ণ। শক্তি-পূজার স্থূল উপকরণেও তাঁহার প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক পঞ্চ;ম-কাব তত্ত্বে তিনি মায়ের আরাধনা করেন। তাঁহাব দীক্ষা—মনোদীক্ষা' তাঁহার পূজা—'মানস-পূজা', তাঁহার যাগ—অন্তর্যাগ, তাঁহার যোগ কুণ্ডলিনী-যোগ। দিব্য সাধকের দিব্য আয়োজন, দিব্য পূজা: সিদ্ধিও দিব্য সিদ্ধি।

তান্ত্রিক সাধনা এই অবস্থাতেই জীবকে শেষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয, কিন্তু ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে। দেহ ও দেহগত বৃত্তি, মানব-প্রকৃতি, জৈবিক প্রবৃত্তি কোন কিছুকেই তন্ত্র অস্বীকার করে নাই। স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া ধীরে ধীরে সেই প্রবৃত্তির ভোগস্পৃহা সংযত করিয়া, তান্ত্রিক সাধক দিব্য বিশ্বাতীত চেতনার ভূমিকায় আবোহণ করেন: 'The tantras offer unique discipline to wake up the finer dynamism of spirit. It moves the vital and the spiritual energies and transforms the vital nature by spiritual infusion. But this transformation is gradual, the blind seeking of the vital nature including vital obscurities is slowly eliminated, not by suppression, but by exposing the nature and the constitution of our vital being' (Dr. Mahendranath Sircar); ইহাই তান্ত্রিক সাধনার অভিনবত্ব। তন্ত্র বার বার বলিতেছে,

আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বোভাবোত্তমোমম্।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্॥ (রুদ্রযামল)

॥ দুই ॥

সাধন-প্রণালী

দিব্য জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়াই শক্তি-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দিব্য জীবন দিব্যভাবে পূর্ণ; দিব্যশক্তির বিকাশে এ জীবন নির্ম্মল, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, জ্যোতির্ম্ময়। ইহা মহাশক্তির লীলাধার। ইহা যেন পঙ্কের উপর প্রস্ফুটিত অপরূপ বর্ণসৌরভময় পদ্ম; অলৌকিক রূপ, অলৌকিক সৌরভ। দিব্য জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব: দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, উদারতায় মৈত্রীবুদ্ধিতে, আনন্দে, আনন্দ-বিকীরণে, সমাধির তন্ময় স্তব্ধতায় একখানি মূর্ত্তিমান দিব্য জীবন। প্রত্যেক শক্তি-সাধকের কাম্য এই দিব্য জীবন।

কিন্তু এই জীবন তো সহজলভ্য নয়; পদ্মের নিমীলিত কোরক তো সহজে দল মেলে না। পথে কত বাধা, কত অন্তরায়! প্রধান বাধা চিরাচরিত জৈব সংস্কার, আর সেই সংস্কারের ক্লেদ-মালিন্যময় লীলাভূমি এই দেহ। মন-মোড়লের ইঙ্গিতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয়, ষড়রিপুর তাড়নায় উন্মাদ, অস্থির মানুষ: আলোর জীব অন্ধকারে দিশাহারা।

তান্ত্রিক সাধক তাহাতে নিরাশ হন না। সাধারণ মানব-প্রকৃতিকেই তাঁহারা সাধনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা জানেন, মানুষ যতই তমসাচ্ছন্ন হউক না কেন, প্রত্যেকের চিত্তেই বিরাট-বিপুলের জন্য একটা সুপ্ত সংবেদন আছে। পশু-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই কল্যাণী আকাঙ্ক্ষা মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে: সেই আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিয়া নিম্ন প্রকৃতির সকল বন্ধন উন্মোচন করিয়া মানুষকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করাই তন্ত্র সাধনার উদ্দেশ্য। তান্ত্রিক সাধক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মানব-প্রকৃতিকে উচ্ছেদ না করিয়া রূপান্তরিত করেন। ফলে অন্ধকার কাটিয়া যায়, চঞ্চল মন সুস্থির হয়, দেহে ও প্রাণে মহৎ জীবনের স্পর্শ লাগে, ক্রমে অন্তরে মহাশক্তির স্ফূর্ত্তিতে জীবন, জীবনের যাবতীয় আচরণ সানন্দ মুক্ত ছন্দে স্পন্দিত হইতে থাকে।

ভাব-ভক্তি ও শ্রদ্ধা

তন্ত্রের সাধন-প্রণালী সর্ব্বথা ক্রিয়ামূলক, ইহা বিবিধ ক্রিয়ার নির্দ্দেশে পূর্ণ। সাধকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, সাধনার অতি প্রথম স্তর ভাব ও ভক্তি। ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না জন্মিলে, সকল সাধনাই ব্যর্থ। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকেই বলে শ্রদ্ধা। 'আদৌ শ্রদ্ধা'—এই শ্রদ্ধার উদয় হইলেই দেবতাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগ্রত

হয়। শ্রদ্ধাই ভাবকে উদ্দীপিত করে, প্রাণময় আগ্রহে তখন হৃদয় আলোড়িত হইতে থাকে। ভাব ও ভক্তির মধ্যেই অন্ধতমসাবৃত অন্তরের প্রথম জাগরণ ঘটে। এমন কি, কেবল ভাব দিয়াও চরম প্রাপ্য লাভ করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'বিশুদ্ধ ঈশ্বর ভক্তি হইতে অন্তরতম প্রদেশে যে আনন্দাবেগ হয়, তাহা হইতে স্নায়ুমণ্ডলে সাত্ত্বিক সঙ্কোচন-বেগ উদ্ভূত হইয়া প্রাণরোধ হইতে পারে।' (শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য)।

সাধারণতঃ নাম-মহিমা কীর্ত্তন, স্তব-কবচ পাঠ, সগুণ ঈশ্বরার্চ্চনা হইতে এই ভাবের উদয় হয়। মানুষের সাধারণ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তন্ত্রও এই নির্দ্দেশ দিয়া থাকে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কর, স্তব-কবচ পাঠ কর। তুমি আমি সাংসারিক জীব; আমরা জীবনে প্রথমতঃ ভুক্তি চাই, ঐশ্বর্য্য চাই, যশ চাই, জয় চাই। মায়ের কাছে চাহিলে অবশ্যই তাহা পাওয়া যাইবে। সুরথ রাজা ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যই পাইয়াছেন। অতএব ভক্তি-ভরে বল, 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি', বল, 'ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।' চতুর্দ্দিকে বাধা-বিঘ্ন, শত্রু আমার ক্ষতি করিতে চায়—তাহা হইতে পরিত্রাণ চাই: মাতৃ-কবচ সেই অঙ্গ-ত্রাণ। অতএব মাতৃ-কবচ পাঠ কর: 'আয়ুরক্ষতু বারাহী, ধর্ম্মং রক্ষতু পার্ব্বতী।'

এই ভাব ও ভক্তি হইতে তন্ত্র স্থূল ঈশ্বরার্চ্চনার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। বিস্তীর্ণ তন্ত্রশাস্ত্র পূজার বিবিধ বিধানে পূর্ণ। মহাশক্তির স্থূল প্রকাশ অনেক প্রকারে হইয়াছে। সেই-সেই মূর্ত্তির ধ্যান, পূজার যন্ত্র, মন্ত্র ও দেবতা-ভেদে অসংখ্য। যাহারা পশুর স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্যই হস্তপদাদি অবয়বসম্পন্ন স্থূল মূর্ত্তির ব্যবস্থা। বাহ্য পূজাবিধিও তাহাদের জন্য।

দীক্ষা

তান্ত্রিক উপাসনা যে প্রকারেরই হউক 'দীক্ষা' অবশ্য গ্রহণীয়। তন্ত্র ফলিত সাধনা, ইহার ফল প্রত্যক্ষ। কিন্তু গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে অগ্রসর না হইলে, পদে পদে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা; এমন কি তাহাতে অশুভও হইতে পারে। এইজন্য তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষার এত গুরুত্ব: 'জপোদেবার্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ' (মন্ত্রমুক্তাবলী): তন্ত্রসারে বলা হইয়াছে,—

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥

কেবল সাধারণ 'দীক্ষা' নয়, তন্ত্র-সাধনার প্রত্যেকটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 'শাক্তাভিষেক' না হইলে দক্ষিণাচার পূজায় অধিকার জন্মে না

বীরভাবের সাধনা করিতে হইলে আরও উন্নততর দীক্ষার প্রয়োজন। 'পূর্ণাভিষিক্ত' হইয়া বীরভাবের সাধনা করিতে হয়। ইহার উপরে আরও উচ্চস্তরে যাইতে হইলে 'ক্রমদীক্ষা', 'সাম্রাজ্য-দীক্ষা' গ্রহণ করিতে হয়। 'মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষা' হইলে যোগ ও নির্গুণ ব্রহ্মসাধনার অধিকার লাভ হয়। 'পূর্ণদীক্ষা' হইলে সাধক দিব্য সাধনার উপযোগী হইতে পারেন।

বস্তুতঃ শাক্তের দীক্ষা ও অর্চনা-পদ্ধতি, জীবের বিশেষ বিশেষ সংস্কারানুযায়ী গ্রহণ করিতে হয়ঃ প্রত্যেকটি দীক্ষাই তাৎপর্য্যবোধক। দীক্ষা ও অভিষেকের মন্ত্র ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট অনুমিত হয়, শাক্ত সাধক কত প্রযত্নে নিম্নস্তর হইতে মোহবন্ধ কাটিতে কাটিতে সুউচ্চ সাধন-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। মানুষের স্বভাব, যোগ্যতা প্রভৃতি বিচার করিয়া এক একরূপ 'দীক্ষা' ও পূজাধিকার দেওয়া হয়। দীক্ষা পাপক্ষয় করে এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার করে। ইহাই দীক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যঃ

> দিব্য জ্ঞানং তু যা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা।
> তেন দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্তিতং তন্ত্রপারগৈঃ ॥[১] (যামলবচন)

মাতৃপূজা

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মাতৃ-পূজায় অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমতঃ স্থূল মূর্ত্তির পূজাঃ ধাতু-পাষাণ মূর্ত্তিতে, স্থূল ধ্যানে, বাহ্য উপচারে পূজা। ইহারও প্রয়োজন আছে। ইহাতে হৃদয়ে নির্ম্মল ভক্তির উদয় হয়, মোহান্ধ হৃদয়ে শক্তির আলোকসম্পাত হইতে থাকে। বাহ্য আনন্দ অন্তরে আনন্দ-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। এ পূজাও স্থূলভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যবোধে হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। পূজক নিজেকে যন্ত্র ও মূর্ত্তি হইতে ভিন্ন মনে করেন না; দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রদীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে মূর্ত্তি-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহা ছাড়া বাহ্য পূজাতেও যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম, মানস পূজার বিধান আছে, তাহাও পূজার অন্তর্নিহিত সুউচ্চ লক্ষ্যের আভাস প্রদান করে। সব কিছুরই লক্ষ্য উচ্চতর—প্রাণ-বোধ করিয়া দেবভাবে তন্ময় হওয়া।

সকল সাধনারই অন্যতম উদ্দেশ্য, মনকে স্থির করিয়া দেহের কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা। পাতঞ্জল-দর্শনের সমাধি-পাদে, চিত্তনিরোধকেই যোগ

১। দীক্ষা: It is so called because it produces divine state of mind and body and destroys all sins. Arthur Avalon (Intro. to প্রপঞ্চসারতন্ত্র)

বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে: 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' (পাঃ দঃ ১।২)। চিত্তের নিরোধ নানারূপ প্রযত্নেই সিদ্ধ হইতে পারে। তাই বলা হইয়াছে, 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌বা' (১।২৩)—ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়। ঈশ্বরকে বাহ্যভাবে ধারণা করিতে গেলে, প্রথমাধিকারীকে রূপাদিযুক্ত রূপ ভাবনা করিতে হয়: 'যোগারম্ভে মূর্ত্ত-হরিমমূর্ত্তম্ চিন্তয়েৎ।' ইহাতে মূর্ত্তিভাবনশীল পূজকের চিত্ত একাগ্র হয়। দ্বিতীয়তঃ, পূজাব প্রধানতম অঙ্গ মন্ত্রজপ। মন্ত্র দেবতার বাচক; অতএব পূজার আর এক দিক হইল সেই মন্ত্রজপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করা: 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' (পাঃ দঃ ১।২৮); তাঁহাতেও প্রাণের নিরোধ হয়। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষা টীকাকার শ্রীমৎহরিহরানন্দ আরণ্য বলেন, "যাঁহারা ঈশ্বর প্রণিধান, জ্ঞানময় ধাবণা প্রভৃতির সাধন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করেন, তাঁহাদেব সেই একাগ্রতা মহানন্দকব হইলে, তাহাতেও সাত্ত্বিক নিরোধ প্রযত্ন আসিলে তদ্দ্বারা তাঁহারা রুদ্ধপ্রাণ হইতে পারেন। ঐ একাগ্রতা সর্ব্বকালীন হইলে তাহাতে বিভোর হইয়া অল্পাহার ও নিরাহাব করিয়া রুদ্ধপ্রাণ হইয়া সমাহিত হওয়া যায়।"

তান্ত্রিকগণ মন্ত্রাত্মক দেবতার পূজার আরও গূঢ়তর অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন, 'মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেযা, তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা'। মহাশক্তির প্রকাশ হয় নাদে, এই নাদের স্থুল প্রকাশ মন্ত্রের ধ্বনি, বর্ণ সেই ধ্বনির প্রতীক। মন্ত্রের ধ্বনি জপ করিতে করিতে, সাধক স্থুলনাদকে অবলম্বন করিয়া পরনাদের স্তরে উন্নীত হইতে পারেন। বীজমন্ত্র একদিকে নাদরূপিণী অনন্ত দীপ্তিশালী কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন সম্পাদন করে, অন্যদিকে উর্দ্ধনাদের সহিত সাধককে পরিচয় করাইয়া দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সাধকের সত্তা উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিশালী হইয়া উঠে। বীজমন্ত্র জপ সাধকের উর্দ্ধতর বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মূর্ত্তি-পূজা বা স্থুল ধ্যানের ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য।

দেহতত্ত্বের কথা

দীক্ষা, পূজা-অর্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা যাহাই বলি না কেন, পরিপূর্ণভাবে মনুষ্য-জীবনের বিকাশ সাধন করাই তন্ত্র-সাধনার শেষ উদ্দেশ্য। এইজন্য মনুষ্য-জন্ম ও মনুষ্য-জীবনকে সাধকগণ কখনও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। অকুণ্ঠভাবে তাঁহারা মনুষ্যজন্মের উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন। সহস্র সহস্র জন্মের অশেষ পুণ্যফলে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে। নিদ্রা, মৈথুন, আহার সকল জীবের পক্ষেই সমান, মানুষও ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু মানুষের স্বাতন্ত্র্য এই যে, মানুষ জ্ঞানবান, তুলনায় অন্যান্য

প্রাণী জ্ঞানহীন। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হয় না,—

চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিভিঃ।
ন মনুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

তাই মনুষ্যদেহই শক্তি-সাধকের প্রধান সাধনীয়। মহাশক্তির আধার মানুষ, তাঁহার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত, অধ্যাত্ম-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ তাঁহাতেই সম্ভব। ঈশ্বরকে, ঐশ্বরিক বিভূতিকে কয়জনে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পায়? তাহা অদৃশ্য, কিন্তু তাহা সুন্দর, মধুর, আনন্দময়, ঘনীভূত জ্যোতিঃর পুঞ্জ—জ্ঞান-ঘন, শক্তি-ঘন। অলক্ষ্যচারী পরমসত্তা, অনির্ব্বাচ্য মহাশক্তি, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, দীপ্তি, জ্ঞান সব আছে এই মনুষ্যদেহে। সবই আছে, কিন্তু সবই মোহাবৃত, প্রচ্ছন্ন। জ্ঞান, শক্তি, দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ঘনকৃষ্ণ আবরণ। এ আবরণ একটি নয়, বহু,—শত সহস্র আচ্ছাদন। তন্ত্রের সাধনা এই আবরণ উন্মোচনের সাধনা, জীবকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা। যে মহাশক্তি এই জীবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়া চৈতন্যময় সত্তার দীপ্তি বিকাশ করাই ইহার শেষ লক্ষ্য। জীবদেহই সেই সাধনার ক্রিয়াভূমি।

তান্ত্রিক সাধক তাই দেহভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়াছেন; দেখিয়াছেন বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এই দেহেই বর্ত্তমান:

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥ (শিবসংহিতা, ২য় পটল)

ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব, সকল দ্রব্য, দ্রব্যাদির সকল গুণ, সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, সপ্তাচল সবই এই দেহে রহিয়াছে: 'কৈলাসো দক্ষিণে কোণে, বামকোণে হিমালয়ঃ'। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, গ্রহমণ্ডলও এই দেহে বিন্যস্ত। দেহের মেরুদণ্ড যেন সুমেরু পর্ব্বত, এই মেরুর মধ্যে দেবতাগণ বসবাস করিতেছেন; পরম জ্যোতির্ম্ময় পরম সত্তাও 'প্রদীপ কলিকাকার জীব'রূপে হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত। দেহে অভাব কিসের? দেহ যেন 'macrocosm in microsm'—সীমার মধ্যে অসীম। সীমার মধ্যে সেই অসীমের ব্যঞ্জনা জাগাইয়া তোলাই সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। শক্তি-সাধনার গূঢ় তাৎপর্য্য দেহ-বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত বলিয়াই, সাধক এই দেহকে বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

নাড়ী: তান্ত্রিকগণ এই দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান পাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধন-ব্যাপারে তিনটি নাড়ীই প্রধান: ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী ইড়া, দক্ষিণে সূর্য্য-স্বরূপিণী পিঙ্গলা ও মধ্যে অগ্নি-স্বরূপিণী সুষুম্না অবস্থিত। এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যে সুষুম্নারই প্রাধান্য: ইহা কন্দমূল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গুহ্যদেশে এই নাড়ীটির মুখকে বলা হয় ব্রহ্মদ্বার। দেহস্থ শক্তি—নাদ ও জ্যোতির আকারে এই সুষুম্না-পথেই বিচরণ করিয়া থাকে। নাড়ীগুলি রসবাহী। সাধক এই রসবাহী নাড়ীগুলিকে নদ-নদীরূপে কল্পনা করিয়াছেন: ইড়া—গঙ্গা, পিঙ্গলা—যমুনা, আর সুষুম্না—সরস্বতী, এই তিনটি নাড়ী গুহ্যদেশে ও মস্তকে যে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে 'ত্রিবেণী'। দিব্যমন্ত্রী সাধকগণ বাহ্য-স্নানের পরিবর্ত্তে এই দেহ-ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া থাকেন।

বায়ু: দেহের যত প্রকার ক্রিয়া, তাহা বায়ুদ্বারা সাধিত হয়। দেহে দশ প্রকার বায়ু আছে—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ু দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াই প্রধান। 'হৃদি প্রাণোবসেন্নিত্যমপানো গুহ্যমণ্ডলে'। হৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণবায়ুই প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবন। এই বায়ুই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পাদন করে। সাধারণতঃ নাসারন্ধ্র হইতে নাভি পর্য্যন্ত প্রাণ-বায়ু গমনাগমন করে এবং অপান-বায়ু নাভির নিম্নদেশ হইতে যোনিমূল পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। এই দুই বায়ুর বিসংবাদে জীবের জীবন রক্ষা হয়, ইহাদের অবিরোধ গতিই জীবের মৃত্যু।

ষট্‌চক্র: দেহস্থ সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা অতি সূক্ষ্ম। তান্ত্রিকগণ মনে করেন, এই নাড়ী-মৃণালে ছয়টি চক্র বা পদ্ম গ্রথিত আছে। পদ্মগুলি কলিকাকার এবং বিভিন্ন দলযুক্ত, এক একটি পদ্মে এক একজন মাতৃকা-শক্তি অবস্থিত:

> তত্রৈব গ্রথিতং পদ্মং মূলাদি পদ্মপঞ্চকম্।
> কলিকাকাররূপেণ ডাকিন্যাদি-অবলম্বিতম্॥ (তন্ত্রচূড়ামণি)

এই চক্র বা পদ্মগুলি দেহের বিশিষ্ট শক্তিকেন্দ্র: সাধনার সময় ইহার যে কোন কেন্দ্রে মন স্থির করতে হয়। পদ্মগুলির নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এগুলি ছাড়া শীর্ষদেশে অধোমুখী অবস্থায় আর একটি সহস্রদল পদ্ম আছে, তাহার নাম সহস্রার পদ্ম।

গুহ্য ও লিঙ্গ দেশের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর মুখে 'আধার' পদ্ম, ইহা শোণবর্ণ ও চারিটি দলযুক্ত। এই দলে ব, শ, ষ, স এই চারিটি মাতৃকাবর্ণ সন্নিবিষ্ট। মূলাধার পৃথিবী-তত্ত্বের স্থান, এখানে ডাকিনী নামক শক্তি বিরাজ করেন। সুষুম্না নাড়ীর

মুখকে বলে ব্রহ্মদ্বার। মুখদ্বারা এই ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করিয়া সর্পের ন্যায় সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতি জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। এই শক্তিকে জাগ্রত করা সাধকের প্রথম লক্ষ্য। পরাশক্তিই ঘুমন্ত অবস্থায় কুণ্ডলিনীরূপে জীব-দেহে অবস্থান করিতেছেন।

লিঙ্গমূলে ষড্‌দলযুক্ত যে পদ্ম, তাহার নাম 'স্বাধিষ্ঠান'। ইহা রক্তবর্ণ, ষড্‌দলে ব, ভ, ম, য, র, ল এই ছয়টি মাতৃকাবর্ণ। স্বাধিষ্ঠান জলাধিপতি বরুণের মণ্ডল, ইহা অপ্-তত্ত্বের স্থান। এখানে রাকিণী নামক মাতৃকা-শক্তি বিরাজ করেন।

স্বাধিষ্ঠান চক্রের ঊর্দ্ধে নাভিমূলে দশদলযুক্ত 'মণিপুর' পদ্ম. ইহা ঘন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই মাতৃকাবর্ণগুলি শোভিত। মণিপুর তেজতত্ত্বের স্থান। এখানে শক্তিরূপে আছেন লাকিনী দেবী।

জীবের হৃদয়দেশে হৃদয়াম্বুজ 'অনাহত'। ইহা বন্ধুককুসুমের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল। ইহার দ্বাদশ দল, এই দলগুলিতে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ মাতৃকাবর্ণ শোভা পায়। ইহা বায়ুতত্ত্বের স্থান। শব্দব্রহ্মরূপী জীবাত্মা প্রদীপ-কলিকাকারে এখানে অবস্থান করেন। শব্দব্রহ্মই হংস, অহংভাব অবলম্বন করিয়া ইনি জীবাত্মারূপে মানবদেহে আছেন। এখানকার মাতৃকাশক্তি কাকিনী দেবী। অনাহত পদ্ম মানস-পূজার স্থান, পূজার সময় সাধক এখানে কল্পবৃক্ষ, রত্নবেদী, চন্দ্রাতপ, পতাকা ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, দেবতাকে হৃদয়-পদ্মে বসাইয়া পূজা করিয়া থাকেন।

কণ্ঠদেশে 'বিশুদ্ধাখ্য' নির্ম্মল পদ্ম। ইহা 'ধূম্রবর্ণধূম্রাবভাসম্'। এই পদ্মের ষোড়শ দল; দলগুলিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোলটি স্বরবর্ণ বিন্যস্ত। ইহা আকাশতত্ত্বের স্থান, এখানে শাকিনী নামক শক্তিদেবী বিরাজ করেন।

ভ্রূমধ্যে অবস্থিত অতি শুভ্র হিমকররূপ 'আজ্ঞাচক্র'। এই পদ্মের দুইটি দল, দুই দলে হ, ক্ষ দুইটি মাতৃকাবর্ণ। চন্দ্রের মত ধবলকান্তিবিশিষ্ট হাকিনী নামক মাতৃকাশক্তি এখানে বিরাজ করেন। আজ্ঞাচক্রকে প্রণব-স্থানও বলা হয়, কারণ ইহার অন্তশ্চক্রে প্রণবাত্মক শুদ্ধ-বুদ্ধ অন্তরাত্মা। ইহাকে 'ধ্যান ধাম'ও বলে। উপাসক এই স্থানে নিজ ইষ্টদেবতাতে মনোলয় করিয়া, নিজে ইষ্টদেবতাস্বরূপ হইয়া যাইতে পারেন। এই চক্রে ধ্যানপরায়ণ সাধক অতি শীঘ্র পরপুরে অর্থাৎ পরমশিবপুরে যাইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

সহস্রার পদ্ম ঃ—জীবদেহের মস্তকে 'পূর্ণেন্দুশুভ্র' পূর্ণপীযূষপূর্ণ সহস্রার পদ্ম; ইহা শুক্লবর্ণ ও অধোমুখ, এই পদ্মের সহস্রটি দল। ইহাই সাধকের সর্ব্বার্থসিদ্ধির

স্থান। সহস্রার পদ্মের পরিমণ্ডলটি অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ; ইহাঁর বর্ণনায় তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পদ্ম নাদ-বিন্দু-সমন্বিত, 'সহস্রারং মহাপদ্মং নাদবিন্দু-সমন্বিতম্। সহস্রার পদ্মই পরম রমণীয় শিবপুর; এই পুর সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত, নিত্য-পুষ্প-ফলবাহী কল্পদ্রুমে পরিশোভিত:

সহস্রারং শিবপুরং রম্যং দুঃখবিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দিব্যং নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ।। (গন্ধর্ব্বমালিকাতন্ত্র)

সহস্রার পদ্ম একদিকে সগুণ ব্রহ্মময় শিবের স্থান, ইহাই আবার অপরদিকে নির্ব্বাণ-শক্তির মধ্যস্থ ব্রহ্ম-স্বরূপ পরশিবের আধার। 'স এব নির্ব্বাণাখ্যকলোপবিগতঃ নির্ব্বাণশক্তেঃ পুরম্' (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)। ইহার মধ্যস্থ শূন্যই ব্রহ্ম-স্বরূপ পরশিব। এই শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শক্তিসাধকের শেষ লক্ষ্য।

দেহ-সাধন

অতএব দেখা যাইতেছে, তান্ত্রিক সাধনাব প্রধান উপকবণ এই জীবদেহ। পবম শান্ত, অদ্বৈত, নিরুপাধি, চৈতন্যময় সত্তাব আধার এই দেহ। কিন্তু গুণত্রয়েব (তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব) আবরণে এই সত্তা আচ্ছন্ন। তান্ত্রিক সাধক এই আবরণ উন্মোচন কবিতে অগ্রসর হন। ভাব ও ক্রিয়া-যোগের উত্তবোত্তব সাধনায, দেহ নির্ম্মোক ত্যাগ করিতে থাকে। পশুভাবেব পূজা-অর্চ্চনায তামসিক আববণ উন্মোচিত হয। মানব-প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই এই সাধনায অগ্রসব হইতে হয়। ক্রমে ক্রমে সাধক রাজসিক মোহবন্ধ উন্মোচনের শক্তি অর্জ্জন করেন। বীরভাবের সাধনায় বীরের প্রচণ্ড আত্মশক্তির আঘাতে অতি প্রবল রাজসিক বৃত্তিগুলি নিযমিত হইযা যায় এবং সাধকেব দেহ দিব্যভাবের সাধনার উপযোগী হয়। দিব্যভাবের সাধনায় সাত্ত্বিক আবরণ খসিয়া যায়, মানুষ দিব্য ভাব ধারণ করে: ক্রমাভ্যাসের ফলে দেহ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জ্জন করে এবং ধীরে মানবসত্তা সত্ত্ব, অতিসত্ত্ব, পরমসত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় হইয়া উঠে। সে এক বিরাট, বিপুল আনন্দ; আলোর বন্যায় সত্তা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হয: তখন জ্ঞেয়-জ্ঞাতা বোধ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই শেষ অবস্থা।

দেহকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রগতি। সাধারণ পূজা অর্চ্চনাতেও দেহ ছাড়া পূজা নয়, দেহ ছাড়া ক্রিয়া নয়। ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম, মানসপূজার ক্রিয়াগুলিতে সাধকগণ দেহেরই সাধনা করিয়া থাকেন।

ভূতশুদ্ধি

'স্বভাবতঃ সদাঽশুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ'—পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ স্বভাবতঃই অশুদ্ধ ইহা মলমূত্র-সমাযুক্ত, মলিন। দেহকে পরিশুদ্ধ না করিলে, তাহা পূজার যোগ্য হয় না তাই প্রথমে প্রয়োজন ভূতশুদ্ধি।

> 'শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
> অব্যয় ব্রহ্মসংযোগাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতঃ॥[১]

প্রথমে এই দেহকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করিয়া দিতে হয়। হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারে আনয়ন করিয়া, কুলকুণ্ডলিনীসহ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, সহস্রারে ব্রহ্মময় শিবের সহিত তাহাকে যোগ করিয়া, দেহকে শূন্যময় ভাবনা করিতে হয়। ইহার পর দেহের আরও বিশুদ্ধি প্রয়োজন; সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় দেহকে শোষণ করিয়া, দগ্ধ করিয়া, দগ্ধীভূত ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং অমৃতদ্বারা সেই পাপশূন্য দেহকে আপ্লাবিত করিয়া। এ সকল ক্রিয়া দেহের বাহিরে নয়, দেহ-মধ্যেই করিতে হয়। পূরক, কুম্ভক ও রেচকের প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে দেহস্থ বায়ুতত্ত্বের বীজদ্বারা দেহকে শোষণ করিতে হয়, বহ্নিতত্ত্বের বীজ দিয়া দেহস্থ পাপ-পুরুষকে দগ্ধ করিতে হয়, সলিলবীজ দিয়া সেই ভস্মকে ধৌত করিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়: তাহার পরে চন্দ্রমণ্ডলস্থ চন্দ্রবীজ দ্বারা দেহকে আপ্লাবিত করিয়া অমৃতময় ভাবনা করিতে হয়। ইহাই ভূতশুদ্ধি, ইহাদ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় জীবাত্মা, কুলকুণ্ডলিনী ও অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়।

ন্যাস

ভূতশুদ্ধি দ্বারা যে নূতন দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেবতাময় করিয়া তুলিতে হইবে। পূজ্য ও পূজকের সত্তা তন্ত্রমতে অভিন্ন। যদি অভিন্ন না হয়, তবে পূজা ব্যর্থ। 'ন্যাস'দ্বারা ভূত-সত্তা যখন দেবতাময় হইয়া উঠে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যায়:

> আগমোক্ত বিধানেন নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
> দেবতাভাবমবাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥[২]

'ন্যাস' শব্দের সাধারণ অর্থ স্থাপন। দেহস্থ বিভিন্ন অংশে মন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণাদি স্থাপন করাই ন্যাস; ইহাতে দেহ সর্ব্বতোভাবে শক্তিময় হইয়া উঠে: 'Nyasas consist of

---

১। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র। ২। কুলার্ণবতন্ত্র।

placing the finger tips and the palm of the right hand on the various parts of the body, whilst reciting certain mantras, in order thus to imbibe one's body with the life of the Devi.'[১]

ন্যাস নানা প্রকারের হয়। শক্তিপূজায় ন্যাসের স্থান প্রধান। ষড়ঙ্গন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস তো আছেই—তদুপরি মাতৃকান্যাস ও ষোঢ়ান্যাসও করিতে হয়। দেহস্থ ষট্‌চক্রের দলে দলে মাতৃকাবর্ণের বিন্যাসের নাম মাতৃকান্যাস। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়া পঞ্চাশৎ বর্ণই মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকা-ন্যাসে কণ্ঠস্থ ষোড়শদল পদ্মে ষোলটি স্বরবর্ণ, অনাহত হৃদয়াম্বুজের দ্বাদশদলে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি ব্যঞ্জন, মণিপুর পদ্মের দশদলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশবর্ণ, স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ষড্‌দলে ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ, মূলাধার কমলের চতুর্দ্দলে ব, শ, ষ, স এই চারিটি বর্ণ এবং আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণ বিন্যস্ত করিতে হয়।

ষোঢ়ান্যাসের ক্ষমতা অসাধারণ। তন্ত্রাদিতে এই ন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়: 'ষোঢ়ান্যাসশরীরস্ত ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ং'। যাঁহার শরীরে ষোঢ়ান্যাস অনুষ্ঠিত হয়, তিনি স্বয়ং মহাদেব তুল্য। ষোঢ়ান্যাস দেবতা ও মন্ত্রভেদে পৃথক পৃথক হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম

'প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি যোগ্যতা'—প্রাণায়াম না করিলে মন্ত্রজপে বা পূজার যোগ্যতা জন্মে না। প্রত্যেকটি শুভকর্ম্মের পূর্ব্বে ও পরে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম করা বিধেয়। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের অশেষ গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। মনুসংহিতায় আছে, বায়ুর নিগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি দগ্ধ হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে প্রাণায়ামের ফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ॥' (সাধনপাদ, ৫২।৫৩); প্রাণায়াম করিলে আবরণ বিনষ্ট হয় এবং ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতা জন্মে। যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'মনো লয়ত্বং লভতে, পলিতাদি বিনশ্যতি'—প্রাণায়ামে অতি সহজে মনোলয় হয়, বৃদ্ধত্ব দূরীভূত হয়। বস্তুতঃ প্রাণায়ামের কার্য্য দেহস্থ বায়ু লইয়া। বায়ুর জন্যই মন চঞ্চল হয়, দেহে নানাপ্রকার রোগ দেখা দেয়। বায়ু-সংযমন করিলে দেহ সুস্থ এবং মন সুস্থির হয়।

দেহস্থ বায়ুগুলির (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সাধিত হয়। যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক

১। A Hist. of Indian Lit, Vol I, Winternitz

থাকে, তখন মন চঞ্চল, বিবেক মলিনতার আবরণে অপরিচ্ছন্ন; কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের এই স্বাভাবিক গতি যদি রোধ করা যায়, তবে মন সাধকের আয়ত্তে আসে। তখন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিষয়ে স্থিরভাবে মনোভিনিবেশ করা সম্ভব।

সাধারণতঃ প্রাণবায়ু নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত যায়, এবং সেখান হইতে আবার ঊর্দ্ধগ হইয়া বাহিরে আসে: নাসার বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এই বায়ু বহির্গমন করে। অপর দিকে অপানবায়ু নাভির নিম্নদেশ হইতে যোনিস্থান পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। গমনাগমনকালে প্রাণ ও অপান বায়ু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই জন্যই একে অন্যে দেহের বাহিরে গেলেও, পরস্পরের আকর্ষণ বশতঃ আবার দেহে ফিরিয়া আসে:

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপি আকৃষ্যতে পুনঃ॥

প্রাণ ও অপান বায়ুর এইরূপ ক্রিয়ায় হৃদয়স্থ প্রদীপ-কলিকাকার জীব (প্রাণ-শক্তি) দেহে অবস্থান করে এবং জীব জীবিত থাকে; প্রাণ ও অপানের অবিরোধ গমনে মৃত্যু হয়। প্রাণায়ামের কার্য্য এই অবিরোধত্ব সম্পাদন করা, কিন্তু এমন ভাবে তাহা করিতে হইবে যে, তাহাতে মৃত্যু হইবে না; বায়ু দেহের মধ্যেই অবিচল হইবে। প্রথমে প্রাণ-বায়ু হ্রস্ব হইবে, অর্থাৎ নাসার বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যাইবে না, 'নাসাভ্যন্তরচারী' হইয়া থাকিবে। ক্রমে বায়ু সূক্ষ্ম হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত মৃদু হইবে (এমন মৃদু হইবে যে, 'তুলাখানি ধবে নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥'); অবশেষে ইহা অবিচল হইবে। তখন দেহ স্থির, নিস্পন্দ—মন অচঞ্চল, শান্ত—নয়ন নিমেষহারা। এই সময় মনকে দেহস্থ যে-কোন শক্তিকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করা যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া মন কোন বিষয় ধারণা করিতে পারে এবং সে-ধারণায় শ্বাসপ্রশ্বাস-জনিত কোন বাধা থাকে না। প্রাণায়ামের ইহাই অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য্য। বায়ু-সংযমনে দূষিত রক্তাদিও শোধিত হয়, তাহাতে দেহও সুস্থ থাকে। এই জন্যই প্রাণায়ামের এত প্রশংসা।

প্রাণায়াম-পদ্ধতি :—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচক-পূরক-কুম্ভকৈঃ॥ (যোগীযাজ্ঞবল্ক্য)

প্রথমে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসায় বায়ু পূরণ করা হয়; এই ভাবে উদরে বায়ু পূরণের নাম পূরক। তাহার পরে উভয় নাসা বন্ধ করিয়া উদরে বায়ু ধারণ করিতে হয়; ইহার নাম কুম্ভক। তাহার পর বাম

নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিন নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহার নাম রেচক। এইরূপে আবার দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ করিয়া, উভয় নাসা বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিয়া বাম নাসায় রেচক করিতে হয়। পুনর্ব্বার প্রথম বারের মত পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয়। এইরূপে একবার প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হয়। যতক্ষণ পূরক, তাহার চতুর্গুণ কুম্ভক এবং পূরকের দ্বিগুণ রেচক করিতে হয। বীজমন্ত্রের মাত্রাসংখ্যা দ্বারা সময়ের পরিমাণ ঠিক রাখিতে হয। প্রথমে অল্প মাত্রায় প্রাণায়াম করা বিধেয়, ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাডাইতে হয়। প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্রুত করা একেবারেই নিষেধ, তাহাতে নানারূপ রোগ হইবাব সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ ব্যক্তিব নিকট হইতে প্রাণায়ামের প্রণালী শিক্ষা করা উচিত।

কয়েকবার প্রাণায়াম কবিলে দেহ লঘু বোধ হইবে, বায়ু সুষুম্নাবর্ত্মে প্রবাহিত হইবে এবং তাহা ক্রমে এই দেহেব মধ্যেই স্থির হইবে। প্রাণাযাম করিলে দেহস্থ নাদ জাগ্রত হয়, যোগিগণ এই নাদ ধাবণা করিযা থাকেন। প্রাণায়াম দ্বারা সাধক সাধনার প্রকৃত যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। এই জন্যই বলা হয়ঃ

আদাবস্তে চ যত্নেন প্রাণাযামং সমাচরেৎ।
কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষ্বপি-অশুভেষু চ॥

অন্তর্যাগ (মানস পূজা)

মানস পূজা, মানস হোম ও মানস জপ অন্তর্যাগের অন্তর্ভুক্ত। তন্ত্রোক্ত এই অন্তযাগ অতি উন্নত ধরণেব সাধনা। এই পূজায় আড়ম্বর নাই, বাহ্য নৈবেদ্যাদি অর্থাৎ উপচারের প্রয়োজন নাই। ইহাতে স্থুল মূর্ত্তিব প্রয়োজন হয় না, ঢাক-ঢোল প্রয়োজন হয় না, বলি আহরণের দরকার হয় না; ইহাতে হোমের জন্য বাইরের সমিধ, হবি কিছুরই দবকাব হয় না। এমন কি জপ কবিবার জন্য অক্ষমালা বা রুদ্রাক্ষমালারও কোন প্রয়োজন নাই। স্থূল পঞ্চ ম-কার তত্ত্ব, যাহা মায়ের পূজার প্রধান উপকবণ, তাহাও এখানে অবান্তর।

সাধক এই পূজায় নিজেব দেহ হইতেই পূজোপকরণ আহরণ করেন, কারণ তিনি জানেন, 'ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।'—যে কোন সাধন-জন্য, যাহা কিছু প্রয়োজন, সব এই দেহেই আছে। দেহে সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু; দেহের মধ্যেই ভূমণ্ডলস্থ সরিৎ, সাগর, শৈল, পুণ্যতীর্থ, পীঠ ও পীঠ-দেবতা বর্ত্তমান। মূলাধার পৃথিবী তত্ত্বের স্থান, ইহাই গন্ধতত্ত্ব; স্বাধিষ্ঠান চক্র জল-তত্ত্বের স্থান—রস; নাভিমূল

তেজস্তত্ত্বের স্থান, অগ্নিস্বরূপ; হৃদয় বায়ুতত্ত্বের স্থান, এইখানেই অনাহত নাদ; কণ্ঠদেশ আকাশতত্ত্বের স্থান—ইহা আবরণাত্মক বস্ত্র। সহস্রার পদ্ম হইতে প্রতিনিয়ত অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে—অতএব সাধকের অভাব কিসের? অভাব যাহা, তাহা তো কল্পনাদ্বারাই পূর্ণ করা যায়।

তাই সাধক বহির্বিশ্বে ছুটাছুটি না করিয়া নিজের দেহটিকে লইয়া পূজায় বসেন, আরম্ভ হয় মানস পূজা: সাধক নিজের দেহেই ক্ষীরসমুদ্রের কল্পনা করেন, তাহাতে রত্নময় এক দ্বীপ, সেই দ্বীপে মণিময় এক দিব্য মন্দির, তাহাতে কল্পবৃক্ষ শোভমান, কল্পবৃক্ষের নীচে এক স্বুবর্ণ বেদিকা। দেবতাকে আবাহন করিয়া সাধককে কি ভাবে মানস পূজা করিতে হয়, তন্ত্রে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে:

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বস্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদন্তথা॥···
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলম্ ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্ষ্যঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা॥···
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।[১]

—মাকে আবাহন করা হইয়াছে, তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, সাধকের হৃদয়স্থিত পদ্মই শ্রেষ্ঠ আসন। পাদ্য—চরণপ্রক্ষালনের জল। সিদ্ধ সাধকের সহস্রার পদ্ম হইতে নিরন্তর যে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই জননীর পাদ্য, আচমনীয় স্নানীয়। মনটি অত্যন্ত দুরন্ত, সেই-ই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, অতএব মায়ের অর্ঘ্য এই মন। স্নানের পর বসন দিতে হয়; বিশ্বমূর্ত্তিকে আবৃত করিতে পারে, এমন আবরণ কি আছে? আকাশতত্ত্ব সেই আবরণ, শরীরস্থ গন্ধতত্ত্ব গন্ধ, চিত্ত পুষ্প, পঞ্চপ্রাণ ধূপ, তেজতত্ত্ব দীপ। নৈবেদ্য সুধাসমুদ্রের সুধা। হৃদয়ে যে অনাহত মধ্যমা নাদ, তাহাই

১। মহানির্ব্বাণতন্ত্র, পঞ্চম উল্লাস

ঘণ্টা-বাদ্য। মাকে ব্যজন করিতে হইবে, চামর দেহস্থ বায়ুতত্ত্ব। চঞ্চল ইন্দ্রিয়-জননীর সেবাদাসী হইয়া তাহারা নৃত্য করুক। মায়া-রাহিত্য, অনহঙ্কার, রাগহীনতা পুষ্পাঞ্জলি। মায়ের পূজায় মদ্য চাই—মাংস চাই, মৎস্য চাই, মুদ্রা চাই: সুধাম্বুধির রসই মদ্য, মাংস-পর্ব্বত মাংস, মীন-পর্ব্বত ভর্জ্জিত মৎস্য এবং সুভক্ষ্য ঘৃতাক্ত পায়স মুদ্রা; মায়ের চরণে মনকে যুক্ত করাই মৈথুন। শক্তিপূজায় বলি দিতে হয়: কামক্রোধ বিঘ্নোৎপাদক শত্রু, তারাই মায়ের বলি। ইহাই শক্তি-সাধকের বিবিধ উপচারে মানস পূজা; এ এক শ্রেষ্ঠ ভাবের পূজা।

কুণ্ডলিনী-যোগ

দেহ-সাধনার প্রধান অঙ্গ কুণ্ডলিনী-যোগ। কুণ্ডলিনীই মনুষ্যদেহের অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তি। ইহা জীবদেহে মূলাধারে সুপ্তা অবস্থায় বিরাজ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তা, ততক্ষণ দেহস্থ অপ্রমেয় শক্তিও স্তিমিত। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে সাধক নিজ দেহেই তাহার পরিচয় লাভ করেন। সহসা কোথা হইতে শক্তিপুঞ্জ, অলৌকিক দীপ্তি, অব্যক্ত আনন্দময় স্পন্দন এই দেহে প্রকাশিত হয়। মুহূর্ত্তে প্রকাশ-আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, জ্ঞান ও শক্তির সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে মানুষ এক পরম উদারতার ক্ষেত্রে উন্নীত হয়।

এই কুণ্ডলিনী-জাগরণের জন্যই ভাবুকের ভাব, পূজকের পূজা-অর্চ্চনা, হঠ-যোগীর ধৌতি-বস্তি-ত্রাটক, যোগীর যোগ। তান্ত্রিক সাধকেরও সকল ক্রিয়া প্রধানতঃ কুণ্ডলিনী-জাগরণের জন্য। মহাশক্তি সঙ্কুচিতা, তাই কুণ্ডলী-আকৃতি, জট-পাকানো। এই জট খুলিয়া গেলেই শক্তি-লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অশুদ্ধ দেহে এক নবীন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়।

কেবলমাত্র কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা নয়, তাঁহাকে উর্দ্ধমুখা করিয়া দেহস্থ চক্রে চক্রে চালনা করিতে হয়। কুণ্ডলিনী উপর্য্যুপরি যত উর্দ্ধদিকে যাইতে থাকে, ততই উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ, শুদ্ধতর সত্ত্বের প্রকাশ ও নিম্নতর বৃত্তির নিমীলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেহস্থ পদ্মদল বিকশিত হয়, কুণ্ডলিনীর স্পর্শে চক্রস্থ এক এক শক্তি স্বীয় মহিমা বিচ্ছুরিত করিতে থাকেন, সকল শক্তি, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল বিভূতি সাধকের দেহে ভর করে। তখন সাধক স্বয়ং ঐশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন হন।

কিন্তু ঐশ্বরিক বিভূতি নয়, আনন্দই সাধকের কাম্য। সেই কাম্য পূর্ণ হয়, যখন তিনি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্চক্রভেদ করিয়া সহস্রারস্থ শিবের সহিত যুক্ত করেন। শিব ও শক্তির সমযোগে, তখন যে সামরস্য উদ্ভূত হয়, তাহা কোটি লাক্ষারসের

চেয়েও রক্তবর্ণ। এই সামরসস্দ্বারা সাধক সমস্ত দেহকে আপ্লাবিত করেন। তখন 'আনন্দ সাগর' উথলিয়া উঠে, আনন্দ-তন্ময় সাধক আপাত সুখদুঃখের সংঘাত হইতে মুক্ত হইয়া এক সুদিব্য স্তরে উন্নীত হন।

অতএব কুণ্ডলিনী-যোগ তন্ত্রসাধনার অন্যতম লক্ষ্য। দেহ-সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ এই যোগে সাধিত হয়। কুণ্ডলিনা-যোগের প্রক্রিয়াটি দুরূহ হইলেও বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী : এই যোগ-ক্রমের নির্দ্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে অতি সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে—তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়।

কুণ্ডলিনী-যোগের ক্রিয়া : সাধক প্রথমতঃ একটি নির্জ্জন সাধনোপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। সাধারণতঃ কোন সিদ্ধপীঠই সাধনার উপযুক্ত স্থান। সাধক বামাক্ষেপা তারাপীঠে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ দেশে অনেক সিদ্ধপীঠ আছে : কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (করতোয়া তীর), কামাখ্যা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপীঠ।

কেহ কেহ সাধনার জন্য সুন্দর, নির্জ্জন স্থানে 'পঞ্চবটি' নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে সাধনা করিয়া থাকেন। অনেক প্রকার কুলবৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটি বৃক্ষ দিয়া পঞ্চবটি নির্ম্মাণ করা বিধেয়। সাধারণতঃ অশ্বত্থ, নিম্ব, অশোক, বিল্ব, চম্পক দ্বারা পঞ্চবটি নির্ম্মিত হয়। ঠাকুর পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতে সাধনা করিতেন।

সাধনার জন্য আসনও প্রয়োজন। কেহ কেহ পঞ্চমুণ্ডির আসন করিয়া (দুইটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালমুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড ও একটি সর্পমুণ্ড), কেহ বা কেবল একটি মুণ্ডের আসন করিয়া, তাহার উপরে কুশাসন বা শুদ্ধ চর্ম্মাসন পাতিয়া সাধনা করেন। বসিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের আছে, তাহাদিগকেও আসন বলা হয় ; এই আসনগুলির মধ্যে পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সুখাসন প্রসিদ্ধ।

সাধনোপযোগী কোন স্থানে স্থির সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধক পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আধারস্বরূপ জীবাত্মাকে অনাহত পদ্ম হইতে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেন। তৎপরে 'হুং' মন্ত্রদ্বারা ধীরে ধীরে নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে হইবে ; ইহাতে মূলাধার-কমলে কামবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এবং তাহাতেই নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কুণ্ডলিনী-জাগরণে প্রাণস্পন্দন দ্রুততর হয়, মেরুদণ্ড মধ্যে শিহরণ জাগে। বায়ুর সহিত বহ্নি মিলিত হইলে উহা যেমন ঊর্দ্ধগামী হয়, তেমনই কামবহ্নিদ্বারা সন্দীপিত হইয়া কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখ হন। তখন 'হংস' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুম্ভক করিতে হয়।

এই সময় কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করিতে থাকেন। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলেই আধার-কমলের চতুর্দ্দল প্রস্ফুটিত হয়। তিনি এক মুখ মূলাধারে রাখিয়া অন্য মুখে স্বাধিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হন; অগ্রসর হইবার কালে কুণ্ডলিনী দক্ষিণাবর্ত্তে আধার-কমলের দলে দলে, তালে তালে নিম্ন মুখ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন; একে একে আধার-কমলের পৃথিবীতত্ত্ব (ক্ষিতি, গন্ধ, নাসা, ঘ্রাণ), মাতৃকা-শক্তি ডাকিনী ও মাতৃকাবর্ণ (ব, শ, ষ, স) কুণ্ডলিনী-দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আধার-কমলের দলগুলি অধোমুখ ও নিমীলিত হইয়া যায়। অপর দিকে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং জল-চক্রের যাবতীয় বৃত্তি ও গুণ বিকশিত হয়।

স্বাধিষ্ঠানে আসিয়াই কুণ্ডলিনী পূর্ব্বমুখ মণিপুরের দিকে উত্তোলন করেন। অপর মুখ দিয়া পূর্ব্ববৎ ছন্দে ছন্দে স্বাধিষ্ঠানপদ্মের দলগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে জলতত্ত্ব (অপ, রস, রসনা ইত্যাদি), মাতৃকাশক্তি 'রাকিণী' মাতৃকাবর্ণ (ব, ভ, ম, য, র, ল) গ্রাস করেন। তাহাতে স্বাধিষ্ঠানপদ্মের দল অধোমুখ ও ম্লান হইয়া যায়। ওদিকে মণিপুরের সকল দল, সকল তত্ত্ব প্রকাশমান হয়। এইভাবে মণিপুর হইতে কুণ্ডলিনী হৃদয়াম্বুজ অনাহতে আসেন; মণিপুরের তেজতত্ত্ব (রূপ, চক্ষু প্রভৃতি), লাকিনী দেবী মাতৃকাবর্ণ (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ) কুণ্ডলিনী-দেহে লয়প্রাপ্ত হয়। অনাহত প্রস্ফুটিত হয়, মণিপুর ম্লান হইয়া যায়।

অতঃপর কুণ্ডলিনীর পূর্ব্বমুখ কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধপদ্মে আসিয়া পদ্মটিকে দলে দলে ঊর্দ্ধমুখ ও প্রমুদিত করিয়া তুলে। বিশুদ্ধপদ্মের প্রকাশে তাহার যাবতীয় বৃত্তি স্ফুরিত হয়; ওদিকে অনাহতের দেবদেবী, বায়ুতত্ত্ব (ত্বক, স্পর্শ ইত্যাদি), মাতৃকাবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ) কুণ্ডলিনী-দেহে বিলীন হয়।

কুণ্ডলিনী তখন আজ্ঞাচক্রে আসিয়া উপস্থিত হন; ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদলপদ্ম, সকল বৃত্তি-সহ বিকশিত হইয়া উঠেঃ অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শে মন বিপুল ব্যাপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তখন সাধকের মানস জাগরণ। সে এক অনির্ব্বচনীয় সুখকর অবস্থা। অপরদিকে বিশুদ্ধ পদ্মের দল, বৃত্তি (ব্যোম, শব্দ, শ্রুতি), শক্তি ও বর্ণ (সমুদয় স্বরবর্ণ, ষোলটি) কুণ্ডলিনীর মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

আজ্ঞাচক্র হইতে কুণ্ডলিনী আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন। একে একে প্রপঞ্চ সৃষ্টির সকল তত্ত্ব—পঞ্চমহাভূত হইতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, এমন কি সৃষ্টির কারণ-কারণ প্রকৃতি পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী-দেহে বিলীন হইয়া যায়, সাধক তখন অমৃত-পথের পথিক। ছন্দে ছন্দে তাঁহার সত্তা তখন স্পন্দিত, আবরণগুলি উন্মোচিত। তখন তিনি দীপ্তিময়, বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিকারী। এই অবস্থায় তিনি কুণ্ডলিনীকে শিবের সহিত সংযোজিত

করেন। শিব 'নিরীহ শবরূপবৎ', শিবপুরী মনোরম, দুঃখ-বিবর্জ্জিত। এইখানে আসিয়া 'দেবী রূপবতী কামোল্লাসবিহারিণী' পরদেবতা কুণ্ডলিনী স্বীয় মুখারবিন্দ-গন্ধে শিবকে প্রমোদিত করিয়া তুলেন ; নিরীহ শিব জাগ্রত হন ; দেবী শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করিয়া ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত রমণ করেন : তখন,—

অমৃতং জায়তে দেবি ! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি।

তদুদ্ভবামৃতং দেবি ! লাক্ষারস-সমারুণম্ ॥'

এই অমৃতদ্বারা সাধক নিজে আপ্লুত হন, ইহা দ্বারা দেবতা পরিতৃপ্ত হন, সাধকের নিত্যানন্দরূপ মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই অমৃতই 'সামরস্য'। 'স্ত্রীপুংযোগে তু যৎ সৌখ্যং সামরস্যং প্রকীর্ত্তিতম্।' সামরস্যের আনন্দ অবর্ণনীয়।

ইহার পর কুণ্ডলিনীকে আবার বিপরীত ক্রমে শিবপুর হইতে ক্রমে ক্রমে সকল পদ্ম অতিক্রম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়। সাধক তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তখন তাঁহার যে অনুভূতি, যে সম্ভূতি, যে স্ফূর্ত্তি, তাহা অনির্ব্বাচ্য। সাধক তখন দিব্য চেতনায়, দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই দিব্য সাধকের দিব্য সাধনার ফল। ইহা হইতেও আরও এক অবস্থা আছে, তাহা নিত্যানন্দ, নিত্যচৈতন্য, অদ্বৈত শিবময় অবস্থা। দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমে সে অবস্থাও আসে। তাহা অচিন্তনীয় সমাধির অবস্থা।

এই দিব্য সাধনাই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান লক্ষ্য। ইহার আদর্শ যে কত সমুন্নত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য ভোগ হইতে ইহা দিব্য যোগের পথে উত্তরণ। দিব্যজীবন লাভ করাই ইহার সিদ্ধি। এই সিদ্ধির বাস্তব উদাহরণ পরমহংসদেব। অতএব শক্তি-সাধনা কামুকের সাধনা নয়, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সাধনাও নয়— পঙ্কে পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করিবার সাধনা, পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিপূর্ণ বিকাশের সাধনা। ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম, অন্তর্যাগ ও কুণ্ডলিনীযোগ প্রভৃতি সাধন-অঙ্গে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

॥ তিন ॥

শাক্তপদাবলীতে শক্তিসাধনার রূপ

শাক্তপদাবলীতে শক্তিসাধনার সমুন্নত লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। দক্ষিণাচার ও বামাচারের সাধন-স্তর অতিক্রম করিয়া, সাধক এখানে কৌলাচার অবলম্বন করিয়াছেন ; পশুভাব ও বীরভাবকে পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা দিব্যভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। তাই এখানে স্থূল মূর্ত্তি-পূজার কথা নাই, শব-সাধনা বা চিতা-সাধনার কথা নাই, স্থূল পঞ্চ ম-কার তন্ত্রের উল্লেখ নাই, পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভের কামনা নাই, আছে সুউচ্চ সাধন-স্তরে উন্নীত হইবার জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। সাধক এখানে লীলার মধ্যে লীলাময়ীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, জগজ্জননীর স্থূলরূপের অন্তরালে 'ওঙ্কার মূরতি' মায়ের স্বরূপ আবিষ্কার করেন, সগুণা রূপের (করুণাময়ী, কালভয়-হারিণী) অন্তরে 'ব্রহ্মময়ী মায়ে'র তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন।

শাক্ত সঙ্গীতের রচয়িতা রুদ্র-ভয়ঙ্কর কাপালিক নহেন; অঘোরঘণ্টের মত নিষ্ঠুর হিংস্রতা, 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের কাপালিকের মত অত্যুগ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ক্রকচের মত উচ্ছৃঙ্খলতা, 'বিসর্জ্জন' নাটকের রঘুপতির মত জিঘাংসা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা উদার, মৈত্রীভাবাপন্ন—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী; তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক দলাদলি হইতে তাঁহারা দূরে অবস্থিত। শ্রেণীগত আত্মম্ভরিতা, জাতিগত বৈষম্য, ধর্ম্মগত অন্ধ-সংস্কার হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য 'মাতৃপদ'। ইহাই তাঁহাদের দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন। সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও চেষ্টা। ইহাই তাঁহাদের সাধন। জ্ঞান ও যোগের পথ ধরিয়া তাঁহাদের পথ-পরিক্রমা। কিন্তু এই জ্ঞান, শুষ্ক জ্ঞান নয়—যোগ, নীরস আত্মধ্যান নয়—তাহা ভক্তি-বিমণ্ডিত। ভক্তিও-আবার ধৈর্যহারা, ভাবোন্মত্ত উচ্ছল ভক্তি নয়, অপ্রমত্ত ভক্তি। শাক্তপদাবলীতে অহৈতুকী ভক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কুণ্ডলিনী-যোগ এক মৃণাল সূত্রে গ্রথিত।

শাক্ত পদকর্ত্তার শক্তি-সাধনা দিব্যমন্ত্রীর সাধনা বলিয়াই, ইহার ভাব ও ক্রিয়া অতি উচ্চ গ্রামে বাঁধা। তাঁহাদের 'আকুতি', দীক্ষা-প্রকরণ, মাতৃপূজা ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দিব্যসাধকের আকুতি—মাতৃরূপার আকুতি, তাঁহাদের দীক্ষা—'মনোদীক্ষা', তাঁহাদের পূজা—'মানস পূজা', তাঁহাদের যোগ—কুণ্ডলিনী-যোগ, তীর্থ—চরণ-তীর্থ, সিদ্ধি—'হৃৎকমলে' মাকে প্রতিষ্ঠিত করা, কালীকে ব্রহ্মস্বরূপে জানা। সাধন-তত্ত্বমূলক শাক্ত-পদাবলীর প্রত্যেকটি পদে দিব্যভাবোচিত অভিলাষ, সাধন-ক্রিয়া ও সংসিদ্ধির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

ভক্তের আকুতি

আকুতি' শব্দের অভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা অভিলাষ; অতএব ভক্তের 'আকূতি' বলিতে বুঝায় ভক্তের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। শাক্ত সঙ্গীতকারদের মধ্যে নানা স্তরের মানুষই আছেন, কেহ রাজা, কেহ দেওয়ান; কেহ পাঁচালীকার, কেহ

যাত্রাওয়ালা; কেহ ভক্ত, কেহ প্রেমিক; কেহ বা উচ্চাঙ্গের সাধক। ইহাদের মধ্যে কেহ বদ্ধ, কেহ মুমুক্ষু, কেহ বা মুক্ত। ভক্তের স্তর ও রুচি অনুযায়ী অভিলাষও ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা প্রায় একপ্রকার, সকলেরই কামনা ও ব্যাকুলতা একসুরে বাঁধা। প্রত্যেকেই মাতৃস্নেহের কাঙাল। পশ্বাচারী ও বীরাচারীর কামনার কথা এখানে অনুপস্থিত, সকলের প্রার্থনাই দিব্যভাবানুগ।

সাধারণতঃ পশুভাবের ভক্ত প্রার্থনা করেন, ভক্তি, সাংসারিক সুখ-শান্তি, পার্থিব দুঃখ-মুক্তি। শিশু যেমন আপাতরমণীয় বস্তুর অভিলাষী, পশ্বাচারী ভক্তের অভিলাষও তদ্রূপ। বীরসাধক প্রচণ্ড সাধনা করিয়া অলৌকিক সিদ্ধি কামনা করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই পার্থিব কামনা-বাসনাদি জয় করিতে পারেন না, এই জন্যই আভিচারিক প্রার্থনা ও ক্রিয়াকলাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত নহেন। শাক্তপদাবলীতে এ-ধরনের কোন প্রার্থনাই প্রকাশিত হয় নাই, কোন ভক্তই প্রার্থনা করেন নাই, জয় দাও, যশ দাও, অর্থ দাও। তামসিক ও রাজসিক অভিলাষের মোহ অতিক্রম করিয়া, শাক্তপদাবলীর ভক্তগণ পরম সাত্ত্বিক অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে সকল ভক্তই যেন দিব্যভাবের ভাবুক।

জননীর স্নেহলাভের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা

'ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ের পদাবলীতে প্রধানতঃ জগজ্জননীর স্নেহলাভের আকাঙ্ক্ষা সুরপঞ্চমে ধ্বনিত হইয়াছে। জীবমাত্রই আকাঙ্ক্ষার অধীন। যতদিন দেহ আছে, ততদিন আকাঙ্ক্ষার বিরতি কোথায়? তবে কাহারও আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তির, কাহারও নিবৃত্তির। বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নীর কামনা প্রবৃত্তিমূলক, কিন্তু মৈত্রেয়ীর অভিপ্রায় নিবৃত্তিমূলক: তিনি বলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?' শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায়, রাজা সুরথ দেবীকে আরাধনা করিয়া, 'অথো বব্রে নৃপ রাজ্যমবিভ্রংশি', চিরস্থায়ী রাজত্ব কামনা করিলেন; কিন্তু সংসারে নির্বিণ্ণ-মানস সমাধি বৈশ্য 'জ্ঞানং বব্রে'—জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।

শাক্ত কবিদের প্রার্থনীয় মাতৃস্নেহ। তাঁহারা জানেন, দেবী 'ভোগস্বর্গাপ[illegible]। কিন্তু ইহলোকে ভোগ, পরলোকে স্বর্গের জন্য তাঁহারা লালায়িত হন নাই, [illegible] চাহিয়াছেন মাতৃকৃপা। মায়ের মধুর স্নেহকণার তুলনায় মুক্তিও তাঁহাদের নিকট

অনেক সময় তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্য তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আরাধ্যা জননী 'কুবেরের মা', তিনি ইচ্ছা করিলেই ভক্তকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে পারেন: 'কারে করেছ রাজ্যেশ্বর অতুল ধনের অধিকারী', 'ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলে জমিদারী।' তিনি বাঞ্ছিত-ফল-দাত্রী। জগতের ভোগসুখের আয়োজন তিনিই করেন, নিখিল জগতের ঘরে ঘরে সম্ভোগের আনন্দ তিনিই বিস্তার করিয়া রাখেন, 'রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে।' কিন্তু এ ভোগে ভক্তের বিতৃষ্ণা, এ আনন্দে তাঁহার বিরক্তি, এ ঐশ্বর্য্যে অনাসক্তি। তাঁহার একমাত্র কামনা জননীর স্নেহ, মাতৃক্রোড, মায়ের চরণ। যে তবিলে মায়ের 'পদরত্ন ভাণ্ডার' জমা আছে, সেই তবিলের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ: 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ নয়, পার্থিব সম্পদ নয়—তাঁহার কাম্য অপার্থিব সম্পদ। 'যদি পাই গো শ্যামাপদ হই না ধনে অভিলাষী'—প্রেয়ের জগতে ইহাই ভক্তের নিঃশ্রেয়স, পরম অভিপ্রেত বস্তু।

জননীর কৃপা, ক্রোড় ও পদ-কমলকেই যিনি সার বলিয়া জানিয়াছেন, সংসার তাঁহার কাছে অসার। তাঁহার চিত্তে নিত্য উদ্যত মোহমুদ্গর, উদ্ঘোষিত বজ্রবাণী: 'মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং'—ওরে মূঢ়, ধনাগমতৃষ্ণা ত্যাগ কর, সঙ্গলিপ্সা বর্জ্জন কর। পরমার্থের আহ্বান যাঁহার হৃদয়ে পৌঁছিয়াছে, তাঁহাকে ইতর ভোগ-সুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না:

'যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান-গীত . দিয়াছে সে বিশ্ববিসর্জ্জন,
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।
শুনিয়াছি তারি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।' (রবীন্দ্রনাথ)

মাতৃ-স্নেহাভিলাষী সন্তানের কাছে তাই সাংসারিক সুখ একেবারেই ছোট হইয়া গিয়াছে, মহাপ্রেমের প্রতি প্রগাঢ় তৃষ্ণাবশে তাঁহারা কামনা-কুটিল সংসারকে মোহপাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। মা-টিকে খাঁটি মনে করায়, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সাংসারিক সুখ যেন 'চিত্রের পদ্ম', ইহা নিম্বের মত তিক্ত, 'বিষয় বিষ', 'সংসার গারদ', ভব কূপ' অথবা 'ভব সাগর'—সে সাগর মায়া-ঝড়, মোহ-তুফানে উত্তাল। ভোগ ও ভোগের পরিণাম-সীমা তাঁহারা দেখিয়াছেন বলিয়াই, মোহ-মুক্তির অভিলাষ ভক্তের কণ্ঠে এমন করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

বদ্ধজীবের সকরুণ চিত্র

প্রপঞ্চ সৃষ্টির তত্ত্ব, জীবের জন্ম, মোহ-কারণ এবং মোহ-প্রভাবকে অবলম্বন করিয়া শাক্তপদাবলীর কবিগণ মুমুক্ষু অথচ বদ্ধ জীবের এক সকরুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বহুস্থলে জীবের সংসার-কারণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মই জীবের জন্ম-কারণ, 'দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তঃ', 'সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং'। শারদাতিলকে আছে ঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপেণ মোহপাশেন যন্ত্রিতঃ। কশ্চিদাত্মা তদা তস্মিন্ জীবভাবং প্রপদ্যতে॥ (১।৩১) মোহগ্রস্ত জীবের বর্ণনাও তন্ত্রে রহিয়াছে :

স্বদেহ-ধন-দারাদি-নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হাহন্তাঽজ্ঞানমোহিতাঃ॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

জীবের জন্ম ও মোহাবস্থার বর্ণনায় তন্ত্রে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব বর্ত্তমান। সাংখ্যমতে প্রকৃতি প্রপঞ্চ সৃষ্টির আদি-কারণ-কারণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণ-ত্রয়ের বিষম অবস্থায় প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের (বুদ্ধিতত্ত্ব) উদ্ভব হয়। মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)। এই সপ্তদশ তত্ত্ব (বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়) মিলিয়া জীবের লিঙ্গদেহ ; ইহা অতি সূক্ষ্ম। ইহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত এবং এই চৈতন্য জীবাত্মা নামে কথিত। জীব প্রদীপ-কলিকাকারে হৃদাম্বুজে অবস্থান করেন। সূক্ষ্ম দেহের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) পঞ্চভূতাত্মক (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্) স্থূল শরীর। অতএব দেখা যাইতেছে, পঞ্চভূতাত্মক এই মানব-শরীরে জীব বদ্ধ হইয়া আছেন। মানুষ সেই বদ্ধ জীব। বদ্ধজীব মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, অন্ধ ; 'ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে দিশাহারা। ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালক আবার মন ঃ ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মনং পরম সারথিঃ।' বুদ্ধি-সংসর্গে কর্ম্মরহিত জীব কর্ম্ম সম্পাদন করে, ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। চৈতন্যময় সত্তা নির্লেপ হইলেও, মায়া-প্রকৃতির ক্রিয়ায় এই প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত হয়। চৈতন্যাধিষ্ঠিত লিঙ্গদেহ (ৰতান্তরে জীব) মাতাপিতার শুক্র-শোণিতের পরিণামে স্থূলদেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ মৈথুন সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই দেহ জরা-মরণের অধীন। দৃশ্যমান এই স্থূল শরীরে ভোগাবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা।

বদ্ধ জীবের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ষড়রিপুর প্ররোচনায় সে অস্থির, মায়ার মোহ-প্রভাবে সে অন্ধ-ধন্ধ, 'অপত্যং মে কলত্রং মে' বলিয়া সে ব্যাকুল। পঞ্চভূতাত্মক দেহটি যে নশ্বর, তাহাও সে ভুলিয়া যায় ; মহাকাল যে

প্রতিক্ষণে এই দেহকে আক্রমণ করিতে উদ্যত, ক্ষণেকের জন্যও তাহা শান্ত থাকে না :

মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি ॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

শাক্ত-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কতকগুলি রূপকের সাহায্যে বদ্ধ জীবের অতি মর্ম্মান্তিক আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। পরিচিত রূপক ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে মুমুক্ষু কবিগণ মোহভ্রান্ত জীবের অসহায়, করুণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন :

(১) জীব যেন 'দুঃখের ডিক্রী জারি'র আসামী। ছয়জন প্যায়াদা (ষড়রিপু) তাহাকে নির্য্যাতন করিতেছে, হুজুরে দরখাস্ত করিবার মত অর্থ-সামর্থ্যও তাহার নাই, সে নিঃসম্বল ফকির। সরকারী উকিলও (মন) তাহার বিপক্ষে। মামলা বাতিল করিয়া দিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক। আসল অনুসন্ধান করিয়া তিনি এমনভাবে জেরা করেন যে, আসামীর পরাজয় সুনিশ্চিত। তাই তো কাতর স্বরে সে বলে, 'পলাইতে পথ নাই মা, বল, কিবা উপায় করি' (রামপ্রসাদ)।

(২) সংসার-গারদে জীব দীর্ঘ-মেয়াদের কয়েদী। তাহার পায়ে কঠিন শৃঙ্খল ('স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন') ; ছয়টা দূত তাহাকে যন্ত্রণা দেয় 'মসিল ছয় দূত তসিল করে কত'। জীব অসহায়, উপায়হীন, দুঃখের দহনে সে দগ্ধ। তাহার বাঁচিবার সাধ নাই, ইচ্ছা হয় সাপ ধরিযা সে বিষ খায় :

আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই
ফণী ধ'রে খাই হলাহল। (নীলাম্বর মুখো)

(৩) নিঃসম্বল (সাধন-সম্পদহীন) জীব ভূতের (পঞ্চভূত) বেগার খাটিয়া মরিতেছে। দিন-মজুরী খাটিয়া কায়ক্লেশে সে যাহা উপার্জ্জন করে, দিনান্তে পঞ্চভূত তাহা কাড়িয়া লয়। পঞ্চভূত, ষড়রিপু, দশ-ইন্দ্রিয় মহাবলবান লাঠিয়াল, তাহারাই জীবকে সর্ব্বস্বান্ত করে, শ্রমের মজুরি আত্মসাৎ করিয়া লয়। অন্ধ যেমন হারাদণ্ডকে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়, সে-ও তেমনই অপহৃত ধন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু হায়, কর্ম্মদোষে তাহাও হাতছাড়া হয় ('প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি')। এ অবস্থায় মৃত্যু সুনিশ্চিত, জীব সেই মৃত্যুই কামনা করে। তাঁহার সকাতর মিনতি :

প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে। (রামপ্রসাদ)

(৪) জীব যেন 'কুমোর ঘড়া'। তাহার উঠা-পড়ার নিবৃত্তি নাই; আশী লক্ষ পাটে ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে কড়া পড়িয়া গিয়াছে (জীবকে কর্ম্মফলে চুরাশী লক্ষ বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়)। ঘড়ার গলায় শক্ত দড়ি; এ ফাঁস কাটিবার উপায় নাই—গতায়াত রোধ করিবারও উপায় নাই, শীতে কাঁপিয়া, জলে ভিজিয়া, রোদে পুড়িয়া তাহাকে উঠা-নামা করিতেই হইবে। রোগ হইলে বা মৃত্যু হইলেও বিশ্রাম নাই, জীবাত্মা-কাঁসারী আবার তাহা জোড়া লাগাইয়া দেয় (চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্মদেহ কর্ম্মবশে বার বার ভোগের জন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে)। শ্রান্ত-ক্লান্ত জীব তাই আর্ত্তনাদ করিয়া বলে,

'কি অপরাধ করেছি মা,
কেন এত শাস্তি কড়া?' (প্যারীমোহন কবিরত্ন)

(৫) জীব যেন অকূল সাগরে ভাসমান এক যাত্রী; তাহার তরী জীর্ণ, মাঝি আনাড়ি, ছয়জন গোঁয়ার দাঁড়ী। কেহ কাহারও কথা শুনে না। এদিকে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে তুফানে তরী টলমল, যাত্রী এলোমেলো ঝড়ের তরঙ্গদোলায় হাবুডুবু খাইতেছে। তরীর হাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তরণী লক্ষ্যহারা বিপর্য্যস্ত। বিপন্ন জীব আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিতেছে:

'তরী হল বানচাল, বল কি করি।' (দেওয়ান রঘুনাথ)

মোহবদ্ধ জীবের এইরূপ আরও অনেক চিত্র আছে; বিষয়ভোগে প্রমত্ত জীব কোথায়ও 'চিত্রের পদ্মেতে পড়া' ভ্রান্ত ভ্রমর, কোথায়ও ষড়্‌রিপুর একান্ত অনুগত স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত 'কলুর বলদ', কোথায়ও ভানুমতীর কুহকে মোহ-মুগ্ধ 'বেদে,' কোথায়ও আবার কঠিন রোগে আক্রান্ত মৃত্যু-পথযাত্রী 'রোগী'। সর্ব্বত্রই ভোগ-পঙ্কে আকণ্ঠনিমজ্জিত জীবের অতি করুণ, অতি বিপন্ন অবস্থা, মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। একটি প্রমত্ত হস্তী পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া মুক্ত হইবার জন্য যেমন আকুলি-বিকুলি করে, প্রচণ্ড শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে অবস্থায় সেই বিরাটকায় জীব যেমন শক্তিহীন, অসহায়—তাহার ক্রন্দন যেমন গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী, বদ্ধজীবের অবস্থাটিও তদ্রূপ. সে অবস্থায় হস্তিপকের নিদারুণ অঙ্কুশ-তাড়নায় সে যেমন বিকট, ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়-তাড়িত, প্রবৃত্তির সংঘাতে বিপর্য্যস্ত জীবও ঠিক তেমনিই অভিমান-ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এ ক্রন্দন নিয়তির জটিল জালে আবদ্ধ Tragedyর নায়কের 'Ah woe, Ah woe' (ঈডিপাস) ক্রন্দন-ধ্বনির মতই গভীর, ভীতিকর ও মর্ম্মান্তিক।

বদ্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্য

শাক্তপদাবলীর এই দুঃখের চিত্রগুলি দেখিয়া হয়তো ধারণা হইতে পারে, শক্তির সাধক কবিগণ বুঝি নৈরাশ্যবাদী। শাক্তপদাবলীতে দুঃখের চিত্র আছে, কিন্তু দুঃখবাদ নাই। ভোগাসক্তির যে ভয়াবহ চিত্র তাঁহারা অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কেবল মাতৃভাবাসক্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবাব জন্য। অন্ধকারের নিবিড় কৃষ্ণতা ও ভয়াবহতা দেখিয়া, আমরা আলোর মহিমা আরও সহজে উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখের ম্লান চিত্রের পার্শ্বে সুখের চিত্র আরও মধুর, আরও আকর্ষণীয় হয়। মাতৃ-চরণের প্রদীপ্ত মহিমা দেখাইতে গিয়া তাই মায়ের ভক্ত সন্তানগণ সংসারের অসারত্ব ও মোহভ্রান্ত জীবের এমন করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, মায়েব চবণকমল-মধু বিষয়-মধু হইতেও মধুর, মাতৃ-পাদপদ্মের তুলনায় ভোগের বিষয় 'চিত্রের পদ্ম' মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ দুঃখের অতি করুণ অবস্থা বর্ণনা কবিযা মাতৃস্নেহ আদায় করিবার প্রয়াসও ইহাতে বর্তমান। বদ্ধজীবেব নিদারুণ বিপন্ন অবস্থা অনুকম্পার্হ। মাতৃ-কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য তাই ভক্ত সন্তান জীব ও জগতের এমন করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সন্তানের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া, তাহাব কাতব ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া পাষাণও বিগলিত হয়, তাহাতে কি স্নেহময়ী মায়ের অন্তরে করুণা উদ্রিক্ত হইবে না?

বস্তুতঃ সংসারের অতি ভয়ঙ্কর দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হইলেও শাক্তপদাবলীতে কোথায়ও সংসার ছাড়িয়া যাইবার নির্দ্দেশ নাই। মায়াবাদী বা জ্ঞানবাদী সাধকের মত তাঁহারা এমন নির্দ্দেশ দেন নাই, 'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।' জগৎ-পলাতকাব মনোবৃত্তি শক্তি-সাধনাতেই নাই। শক্তি-সাধনা যুগপৎ ভুক্তি ও মুক্তির সাধনা: 'এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তির্মুক্তি করে স্থিতা' (সময়তন্ত্র)। শক্তি-সাধক ইহাও জানেন, ত্যাগ বাইবের বস্তু নয়, অন্তরের। মনের ত্যাগই আসল ত্যাগ। রাজা সুরথ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন, সমাধি বৈশ্যও সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভের জন্য বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু ত্যাগী তাঁহারা হইতে পারেন নাই। বনে গিয়াও সমাধি বৈশ্যের মনে অহরহ সংসারচিন্তা জাগিয়াছে: যে-পুত্রকন্যা অর্থের জন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত তাহাদের চিন্তাই মনে উদিত হইয়াছে,—

> যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
> পতি-স্বজন-হার্দঞ্চ হার্দিতেষ্বেব মে মনঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

রাজা সুরথেরও সেই একই অবস্থা, 'মমত্বং গতরাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষখিলেষপি'—হৃতরাজ্যাদির প্রতিই মমতা।

অতএব চিত্ত না রাঙাইয়া বহির্ব্বাস রাঙাইলে কোন ফল নাই, এ কথাটি সকল ভক্তই বুঝিয়াছেন। 'দ্বে পদে মোক্ষবন্ধায় ন মমেতি মমেতি চ, মমতারাহিত্য ও মমতা এই দুইটিই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ; কিন্তু সে মমতারাহিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া নয়, সংসারে থাকিয়াই, সাংসারিক কর্ম্ম করিয়াই:

মনসা কর্ম্মণা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

মাতৃ-সাধক সংসারে থাকিয়াই, ভাব ও ভক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছেন, সংসারের দুঃখ-পঙ্কে তাঁহারা আনন্দের পদ্মদল প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। দেহ-পদ্মের দলে দলে, তালে তালে ভক্তির মন্ত্র গাহিয়া, তাঁহারা অধোমুখ, নিমীলিত, ম্লান কমলকে উর্দ্ধমুখ, প্রমুদিত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই শক্তি-সাধনার বিশিষ্টতা। শাক্তসঙ্গীতেও সে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর আছে। সংসারের দুঃখময় চিত্র অঙ্কিত হইলেও শাক্তপদে দুঃখবাদ নাই, দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখ জয় করিবার সঙ্কেত আছে।

সন্তানের জীবন্ত চিত্র

শাক্ত সাধক এই দুঃখের সংসারে জগজ্জননীর সন্তান। সন্তান যেমন দুঃখ পাইয়াও জননীর স্নেহাঞ্চল পরিত্যাগ করে না, শক্তি-সাধকও তেমনই সংসার-জননীর স্নেহ-রাজ্যের বহির্ভূত হন নাই। 'ভক্তের আকৃতি' অংশে ভক্তকবি পরমেশ্বরীর সহিত এই মধুর সন্তান সম্পর্ক পাতাইয়া হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। সন্তান যেমন দুঃখে পড়িয়া মায়ের স্নেহ না পাইয়া কাঁদে, অভিমান করে; কখনও মাকে তিরস্কার করে, ব্যঙ্গ করে; কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, শক্তি-সাধক কবিগণ তেমনই সংসারের দুঃখানলে জ্বলিতে জ্বলিতে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত চিত্তে নিজের মনে ক্রন্দন করিয়াছেন, মায়ের প্রতি অভিমান করিয়াছেন, মাকে তিরস্কার করিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অভিযোগ করিয়াও মাতৃ-ভক্তিতে তাঁহারা অটল থাকিয়াছেন, মায়ের প্রতি নির্ভর করিতে ভুলেন নাই। বিদ্রোহের মধ্যে একান্ত নির্ভরতা, অনুযোগের মধ্যে আবদার, অভিযোগের মধ্যে আত্মসমর্পণই শাক্তসঙ্গীতের প্রধান সুর; এই সুরটিই বিবিধ রাগ-রাগিণীর সমবায়ে বহুবিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

সন্তানের প্রতি জনক-জননীর যে স্নেহ, তাহাকে বলে বাৎসল্য। কিন্তু জননীর প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, তাহাকে কি বলে? ভক্তিশাস্ত্রে পূজ্যের প্রতি অনুরাগ ভক্তি ('পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ'—শাণ্ডিল্যসূত্র) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু জননীর প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, তাহা কেবল ভক্তি নয়, আরও কিছু। যাঁহার সহিত নাড়ীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, 'চিত হতে চিত দিয়া' যিনি সন্তানের জীবন-স্পন্দন সঞ্চার করেন, তাঁহার সহিত কেবল ভক্তির সম্পর্ক? জননী যেমন সন্তানের হৃদয়-দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, সন্তানও ঠিক তেমনই জননীর হৃদয়-দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে; সন্তানের জন্য জননীর যেমন মহা স্নেহ-ব্যাকুলতা জাগে, জননীর জন্যও সন্তানের তেমনই সুতীব্র আকর্ষণ, 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান।' জননীর প্রতি এই স্নেহাকর্ষণ প্রতিটি সন্তানের মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম। এই সংস্কার 'যুক্তির সাহায্য চায় না, তর্কের ধার ধারে না, বিধি ও বিধান মানে না।'[১] এই সহজাত, অহৈতুকী, সুতীব্র স্নেহের কোন নাম নাই। ভক্তিশাস্ত্রে ও রসশাস্ত্রে বাৎসল্যের নাম ও স্থান আছে, কিন্তু জননীর প্রতি সন্তানের বিচিত্র রহস্য-গূঢ় ভাবের কোন নাম নাই।

অথচ শাক্তপদাবলীর ভক্তিভাব এই বিচিত্র, মধুর, রহস্যময়, প্রীতিপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ, একান্ত বিশ্বাসপ্রবণ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোচনার সুবিধার জন্য এই রসটিকে 'ভক্তি' না বলিয়া আমরা 'প্রতিবাৎসল্য' নাম দিলাম। শাক্ত সাধনার জ্ঞান ও যোগ প্রতিবাৎসল্যের রসে অভিসিঞ্চিত। শাক্তপদাবলীতেও বিষয়-বিবিক্ত ভক্তের দুঃখময় জীবন প্রতিবাৎসল্যের রস-সিক্ত হইয়া রসাল, সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষ করিয়া ভক্তের আকূতি অংশে প্রতিবাৎসল্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার লক্ষণীয়। জননীর প্রতি সন্তানের মমত্ববোধ, আবদার, অনুযোগ, অভিযোগ, তিরস্কার, একান্ত বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ অধ্যাত্মলোকের ভক্তিকে মর্ত্ত্যপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে; ইহাদ্বারা কৈলাসবাসিনী শিবের সতী ধরণীর ধূলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

প্রথমতঃ জননীর প্রতি সন্তানের সুতীব্র অভিযোগ, কেন তিনি সন্তানকে এই দুঃখের সংসারে ডালি দিলেন! সন্তান মায়ের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এত শাস্তি:

১। পরপারে (নাটক)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'কি অপরাধ করেছি মা, কেন এত শাস্তি কড়া ?'
'কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ?'
'কোন্ অবিচারে আমার পরে কর্‌লে দুঃখের ডিগ্রাজারি ?'

মা হইয়াও তিনি সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। লীলার ছলে ফাঁকি দিয়া তিনি সন্তানকে ভূতলে নামাইয়াছেন, চিনি বলিয়া তিনি তাহাকে নিম খাওয়াইয়াছেন। তাই সন্তানের অনুযোগ-মিশানো অভিমান ঃ

'মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে, তিতমুখে সারাদিনটা গেল ॥' (রামপ্রসাদ)
'এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥, (রাজা রামকৃষ্ণ)

অতঃপর সন্তানের বিস্ময়! সন্তানের প্রতি মায়ের এ কি ব্যবহার! জননী অনন্ত স্নেহময়ী, দুরন্ত সন্তানের প্রতিও তাহার স্নেহ প্রদর্শনের বিরাম নাই। কিন্তু 'এ কেমন মা!' ডাকলেও তিনি সাড়া দেন না ঃ

ও মা, কেমন মা কে জানে!
মা বলে ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে! (গিরিশচন্দ্র)
মা বলে কাঁদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয়!
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়!
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়। (বিষ্ণুরাম চট্টোঃ)

জননীর সাড়াশব্দহীন মূক-প্রকৃতি সন্তানের মনে সংশয় সৃষ্টি করে—হয় তিনি বাঁচিয়া নাই, নয় সন্তানের দুঃখ দূর করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তাই ভক্ত বলেন,—

মা বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই। (নরচন্দ্র রায়)
আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে ?
তোমার, কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে। (রামপ্রসাদ)

কখনও বা জননীর স্নেহ-বঞ্চিত সন্তানের উন্মত্ত ক্ষুব্ধতা। অনুযোগ তখন সুতীব্র তিরস্কারে পরিণত হয়, মাতৃ-নিন্দায় রসনা ক্ষুরধার হইয়া উঠে। কঠিন অপভাষ প্রয়োগ করিয়া তিনি বলেন, কে বলে মায়ের ঐশ্বর্য্য আছে, কে বলে তিনি কৃপাময়ী? তিনি 'সর্ব্বনাশী', তিনি নিষ্ঠুর, তিনি কৃপণা ঃ

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?
দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে। (নরচন্দ্র রায়)
ব্যভারেতে জানা গেল, তুমি যে অতি কৃপণা।
ভক্তেরে সর্ব্বস্ব দাও মা আগমেতে কেবল শোনা ॥
প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল কারে কি দিয়াছ বল,
দেবার মধ্যে মায়াজালে বদ্ধ করে দাও যাতনা ॥ (প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ)

সুকঠিন তিরস্কার করিয়াও জ্বালা মিটে না। তখন আত্মধিক্কার উপস্থিত হয়। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কৃত করিয়া ভক্ত বলিয়া উঠেন,

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। (দাশরথি রায়)

কখনও ভাবেন, তিনি বুঝি পাগল হইয়া যাইবেন :

এবার যাব গো পাগল হয়ে
আমার ভবের আগুন জ্বলছে মাথায়
আর কতদিন থাকবো সয়ে। (বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী)

জন্ম-যন্ত্রণায় অস্থির, ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জর, কাম-সিন্ধু-নীরে নিমজ্জিত ভক্তের আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মনে জাগে ব্যাকুল প্রশ্ন। এমন আশ্রয় নাই, যেখানে আশ্রয় মিলিতে পারে, সন্তান 'একূল ওকূল হারা'। তখন মায়ের দিকেই ভক্ত আবার ফিরিয়া দাঁড়ান, বলেন,—

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা ?
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা। (রামপ্রসাদ)

তখন মনে হয়, জননীই একমাত্র আশ্রয়, তিনিই একমাত্র গতি। একান্ত নির্ভরতায় ভক্ত তখন জননীর চরণেই শরণ গ্রহণ করেন ; অন্তরের আকুল আবেদন করুণ সুরে মূর্চ্ছিত হয় : 'কুরু করুণা, কুরু মে করুণা', 'তনয়ে তার তারিণি' 'তারা, এবার আমারে কর পার', 'ওমা, কৃপা কর কাতরে'। ভক্তের মুখে ওই এক কথা, কণ্ঠে এক 'মা মা' ডাক, অন্তরে ওই এক প্রার্থনা, 'কোলে তুলে নে মা কালী', 'কোলে তুলে নে মা শ্যামা',—

সারাদিন করেছি মা গো, সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা
ধূলা ঝেড়ে নে মা কোলে, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।

কত ছাই-মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা। (চন্দ্রনাথ দাস)

শরণাগতি ও জীবন্মুক্তির আকৃতি

অনুযোগ অভিমান যাহাই থাকুক, পরম শরণাগতির আকৃতিই ভক্তের সর্ব্বপ্রধান আকৃতি। ভক্ত জানেন, মা চিন্তাময়ী, তারিণী, শঙ্করী, 'ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী,' তিনি 'ভীত-ভয়-নাশিনী,' 'কালভয় নিবারিণী'; তিনি করুণাময়ী, 'মন-মানস পূর্ণকারিণী'; তিনি 'বাঞ্ছাফলদাত্রী,' জগদ্ধাত্রী; তিনি মহামায়া, মহেশ্বরী, 'প্রকৃতি সাবিত্রী,' তিনি 'পরম পদদায়িনী,' 'মোক্ষরূপা কাত্যায়নী'। অতএব মা ছাড়া আর কি আছে? তিনিই একমাত্র শরণ্য। যন্ত্রণাও মায়েরই সৃষ্টি, তিনিই আবার ত্রাণকর্ত্রী। সুতরাং মায়ের সঙ্গে যত দ্বন্দ্বই হউক, মায়ের স্নেহ, মায়ের চরণই একমাত্র ভরসা। তাই ভক্তের অভিপ্রায়: 'দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে, তবু রব মায়ের চরণে।'

ভক্ত মায়া-মোহে বদ্ধ থাকিলেও, তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন নয়। কেন এই মোহ, কেন এই দুঃখ, কে এই দুঃখের মূল, কি ভাবে এই দুঃখ জয় করা সম্ভব—সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ভক্তের আছে। ভক্ত জানেন, জীবকে কর্ম্মবশে বার বার জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, ইহাও মহামায়ার লীলা। অজ্ঞান, মোহ, বিভ্রান্তি তাঁহারই সৃষ্টি: তিনি অবিদ্যা 'তয়া সংমোহ্যতে জগৎ,' বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের সূত্রধারিণী তিনি, তিনি 'ত্রিগুণা রজ্জুধারিণী'। অতএব মোহ-মুক্তি যদি লাভ করিতে হয়, তবে তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে হইবে। আবার তিনিই পরমা বিদ্যা, মোক্ষদাত্রী; তাই মোক্ষও যদি কাম্য হয়, তখনও তিনি শরণ্য। তবে নির্ব্বাণ-মুক্তি নয়, ভক্তের এ জগতে প্রার্থনীয় 'জীবন্মুক্তি'। জীবদেহের স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়াও প্রতিনিয়ত মাতৃ মন্ত্রে বিভোর হইয়া থাকা, মাতৃচরণ-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকা—ইহাই জীবন্মুক্তি। 'ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ে জীবন্মুক্তির অভিলাষ নানাভাবে, নানাসুরে ব্যঞ্জিত হইয়াছে: 'ভবের আসা খেলব পাশা বড়হ আশা মনে ছিল,'—ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে এই আশাই জীব করে,: 'সপিণ্ডিত শরীরস্তু মোক্ষমেব কিলেচ্ছতি।' কিন্তু জন্মমাত্র মায়াপ্রভাবে সে ইচ্ছা বিস্মৃত হয়: 'বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি।'—তাই জন্ম হইলেই যুগ (মায়ের সহিত একীভূত অবস্থা) ভাঙ্গিয়া যায়, দেহ পাঞ্জা ছক্কায় (পঞ্চেন্দ্রিয়, ষড়রিপুতে) বদ্ধ হয়। কিন্তু স্মৃতি তখনও কিছু কিছু থাকিয়া যায় জন্যই মোক্ষ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, জীবন্মুক্তির

অভিলাষ জাগিয়া উঠে। মুমুক্ষু ভক্ত ব্যাকুলভাবে তাই প্রার্থনা করেন শরণাগতি, মাতৃচরণে প্রপত্তি। এই প্রপত্তির আকাঙ্ক্ষাও প্রাণস্পর্শী :

'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।' (মহারাজ নন্দকুমার)
'হবে কবে সেদিন ভবে—
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে ?' (নৃসিংহ ভট্টাচার্য্য)
'এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা, তারা, তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা।' (রামপ্রসাদ)

জননীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করিবার অভিলাষ

জননীর অনন্ত লীলা, অনন্ত রূপ, একদিকে তিনি 'বাঙ্মন-অগোচর,' অন্যদিকে তিনিই আবার বহুরূপিণী। তাঁহার মায়ায় ভুবন মুগ্ধ, রূপে ভুবন আলো। কখনও তিনি নৃমুণ্ডমালিকা হইয়া মহেশের বুকে নৃত্য করেন, কখনও রণরঙ্গিণী বেশে শত্রু ধ্বংস করেন। শ্মশানকালী আবার শ্মশানপ্রিয়। শ্যামাই আবার রাসেশ্বর শ্যামা, যশোদার নয়ন-দুলাল। ভক্তগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এইরূপ নানামূর্ত্তিতে জননীকে দেখিতে চাহিয়াছেন : 'ধ্যানগম্য' প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্ বিধম্' (যামলতন্ত্র)। ভক্ত-হৃদয়টি মায়ের আধিষ্ঠানভূমি, সে স্থানে যে মূর্ত্তিতে মায়ের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্ত আপন হৃদয়কে সেইরূপ স্থানে রূপান্তরিত করিয়া জননীর সেই রূপ দর্শন করিতে চাহিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, মুক্তকেশী কালীরূপে শ্মশানে বিহার করেন। চিতার আগুনে, চিতা-ভস্মের মধ্যে উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করেন। ভক্তও তাঁহার হৃদয়কে শ্মশান-সদৃশ মনে করেন, এখানে নিরন্তর চিত্ত-চিতা জ্বলিতেছে, চিতা-ভস্মে হৃদয় অনুলিপ্ত। চতুর্দ্দিকে শোকতাপের অন্ধকার : অতএব,

নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয় মাঝার,
তুমি তো শ্মশানপ্রিয় শ্মশান হৃদয় আমার।
(মহারাজ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অথবা কেহ বলেন,

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি। (রামলাল দাসদত্ত)

কোন ভক্তের অভিলাষ, জননী রণক্ষেত্রে অসুরদলনীরূপে নৃত্য করেন, রণক্ষেত্র

তাঁহার প্রিয়। ভক্তের হৃদয়টিও বণক্ষেত্র, দেহেব ষড়্‌রিপু ঘোর শত্রু, কুমতি যেন রক্তবীজ। ভক্তের হৃদয়-বণক্ষেত্রে অসুব-দলনীর নৃত্য হউক, বণপ্রিয়ার অসিব আঘাতে দেহ-শত্রু নিপাত হউক :

কব কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবাব মনসাধে
রণক্ষেত্রে মা। মোর হৃদয মাঝে। (দাশরথি বায)

কাহারও আবার আকাঙ্ক্ষা,—

কবগো দক্ষিণে কালী আমাব হৃদযে বাস।
চতুর্দ্দলে শম্ভুসহ পুবাও মন-অভিলাষ॥ (নবীন চক্রবর্ত্তী)

কোন কোন ভক্ত আবাব শ্যামামা'যেব শ্যামরূপ দর্শনাভিলাষী, তাঁহাদেব হৃদয়টি বৃন্দাবন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, 'হৃদয-বাস-মন্দিবে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।' ভক্ত সাধক রামপ্রসাদেব আশা,—

একবাব নাচ গো শ্যামা,—
যশোদায় সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নাযিকা অষ্ট সখী হোক,
যেমন করে বাসমণ্ডলে নেচেছিলি,
হৃদি-বৃন্দাবন মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠামে
চবণে চবণ দিযে, গোপীব মন-ভুলানো বেশে,
তেমনি তেমনি তেমনি কবে। (বামপ্রসাদ)

সাধনাকাঙ্ক্ষাব বৈচিত্র্য

বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন কবিবাব অভিলাষ মাত্র নয়, মাকে বিভিন্ন ভাবে আবাধনা করিবাব আকাঙ্ক্ষাও ভক্তেব বহিযাছে। বাহ্য পূজাব প্রতি ততটা আকর্ষণ নয়, অন্তব-পূজার দিকেই ঝোঁক : 'ভক্তি আছে মা আমাব, তাই দিব উপহাব'—ভক্তেব ইহাই অভিলাষ। এমন কি অন্তিমকালেও 'যখন কববে অন্তর্জলী'[১] তখনও ভক্তেব যে পূজা, তাহাও মানস-পূজা :

তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে।
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥ (দাশবথি বায়)

সাধনার যে শেষ লক্ষ্য— কুণ্ডলিনী জাগবণ, কুণ্ডলিনী-যোগ এবং সমাধি। তাহাও ভক্তের অভিপ্রেত। 'ভক্তের আকূতি'র মধ্যে 'কবে হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে', 'কবে

১। অন্তর্জলী—পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত মুমূর্ষুর নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে মগ্ন কবা।

সমাধি হবে শ্যামা-চরণে', 'হবে কবে সেদিন ভবে, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় রবে'—ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। কুণ্ডলিনী উত্থাপিত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিলে, দেহস্থ পদ্মের উন্মীলনে ও নিমীলনে একে একে সকল তত্ত্ব একতত্ত্বে বিলীন হইয়া যাইবে, এই ইঙ্গিতটিও মহারাজ নন্দকুমারের এই পদটিতে সুস্পষ্ট :

> কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
> অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনাসনে ॥
> উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব,
> সর্ব্বতত্ত্বাতীত-তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে ॥

ইহা সর্ব্বশেষ লক্ষ্য : 'দেখি আপনে আপনে'—নিজের মধ্যে আত্ম-দর্শন, একদিক হইতে ইহাই 'পরতত্ত্ব'। কিন্তু কুণ্ডলিনী-জাগরণ না হইলে সে তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, সাধক বলেন, 'তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে কুণ্ডলিনী-জাগরণে'। কুণ্ডলিনী-জাগরণের উপায় প্রাণায়াম, বায়ুর সংযমন, তাহাতে মনস্থির হয়। তাই ভক্ত বলেন,

> শীতল হইবে প্রাণ অপানে পাইব প্রাণ
> সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে ॥

কিন্তু সে স্তরে যাইতে হইলেও অপরিশুদ্ধ দেহটির শুদ্ধি প্রয়োজন। দেহ ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্যে অশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধি হয় শিব-শিবার যোগে। ভূতশুদ্ধির মূলও কুণ্ডলিনী-যোগ :

> করি শিবাশিবা-যোগ বিনাশিবে ভবরোগ
> দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ ক্ষরিত সুধার সনে।
> মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল ল'য়ে জীবনে।
> মণিপুরে হুতাশনে মিলাইবে সমীরণে ॥

এই ভাবে শক্তি-আরাধনা করিয়া ব্রহ্মদ্বার পার হইতে হয় : তখন ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে হৃদয় বিভোর, সে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। তখন প্রাণ প্রেমরসে মাতোয়ারা, মন ভক্তিবশে স্থির, মায়া-ভ্রান্তির অবসানে জীব 'বিবেক খ্যাতি'তে (=বিবেক-বৈভব) প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় আসিলেই সব কিছু মাতৃময় হইয়া যায়।

ঐকান্তিক মাতৃভাবাসক্তি

'ভক্তের আকুতি' অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন আশা-কামনার কথা ব্যক্ত হইলেও, মাতৃভাবাসক্তিই এখানকার প্রধান সুর। যে কোন সাধনার প্রথম

বর্থা ইষ্টের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠার উদয় না হইলে সাধনার প্রশ্নই উঠে না। সাধন-ক্রমের প্রথম প্রয়োজন 'শ্রদ্ধা'—আদৌ শ্রদ্ধা', এই শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভাব ও প্রেম জন্মে। ভক্তও শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমাকাঙ্ক্ষী। ভক্তগণ অবশ্য উচ্চতর সাধন-অঙ্গের জন্যও অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন: কেহ বলিয়াছেন, 'দে মা চৈতন্য', কেহ কহিয়াছেন, 'দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি বোধ', কাহারও ইচ্ছা হইয়াছে, 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে', 'কবে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে হৃদয় বিভোর হবে'। কিন্তু সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে তারা-গ্রামে ধ্বনিত হইয়াছে তারার কৃপা-স্নেহের আকাঙ্ক্ষা। ভক্ত মা পাগল: মা ছাড়া অন্য কোন ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই। মা দুঃখ দেন, মায়াঘোরে ফেলেন। ভানুমতীর ভেল্কিতে ভক্ত চোখে অন্ধকার দেখে। তবু মা ছাড়া অন্য কথা নাই। ভক্ত মাতৃভাবে তন্ময়, 'গতি নাহি তোমা বিনা আর,— ইহাই শেষ কথা। জীবনে ও মরণে এই এক কামনা, 'তুই বিনে মোর কে আছে মা!' মায়ের নাম, মায়ের চরণ, মায়ের কৃপা, -জীবনকালেও ইহাই সর্ব্বস্ব, মরণালেকও ইহাই সম্বল। মৃত্যু যখন দুয়ারে, তখনও ভক্ত বলেন,

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা, কালী কালী॥ (দাশু রায়)

অথবা

মন যদি মোর ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণমূলে॥ (মহারাজ রামকৃষ্ণ)

অভীষ্টের প্রতি এই প্রগাঢ় তৃষ্ণাই প্রেম। প্রেম সর্ব্বগ্রাসী, জগতের অন্য সকল বস্তু, সকল আকাঙ্ক্ষা ইহার কবলস্থ হয়। প্রেমিকের চোখে তাই নিখিল ভুবনে আর অন্য কিছু থাকেনা, থাকে কেবল প্রেমের বস্তুটি। এই অর্থেই 'Lovers are blind'—এই প্রেমের উদয় না হইলে ইষ্ট লাভ হয় না। অস্ত্রপরীক্ষা-গ্রহণকালে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'পাখীটি ছাড়া আর কাহাকে দেখিতেছ?' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, বৃক্ষের উপরে কেবল পাখীই দেখিতেছি, 'অন্য নাহি দেখি।' দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ?' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন,

আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥

তখন দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,

এইবার মার অস্ত্র কাট পক্ষী-শির।
না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর॥ (কাশীদাসী মহাভারত)

এই তন্ময়তাই ভক্তি বা প্রেম। ইহার নিকট অন্য সকল তুচ্ছ বলিয়াই, প্রেম হইতে সুতীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, অখিল বিশ্বের অন্য সব বস্তু নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। 'ভক্তের আকূতি' অধ্যায়ে এই একাভিমুখী প্রেম, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, সুতীব্র বৈরাগ্য প্রকট হইয়াছে। মাতৃভাবের গাঢ় রঙে হৃদয় অনুরঞ্জিত করিয়া ভক্ত সন্তান সাধনার পরবর্তী সোপানের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

॥ চার ॥

মনোদীক্ষা

দীক্ষা মনকে দিব্যভাবে প্রণোদিত করে এবং সর্ব্বপাপ ক্ষয় করে। এই শক্তিসাধনার উপযোগী হইবার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, অদীক্ষিত হইয়া যে পূজা-জপাদি করা হয়, তাহা শিলায় উপ্ত বীজের মতই নিষ্ফল। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হয়। শক্তি-দীক্ষা না হইলে শক্তিপূজার অধিকার জন্মে না, গুরু দীক্ষাদ্বারা শিষ্যের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করিয়া ভোগ দেহকে শুদ্ধতর করিয়া তুলেন।

অধিকারীভেদে দীক্ষার ক্রমভেদ আছে। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা বা পূর্ণদীক্ষা না হইলে সুউচ্চ সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া দিব্যভাবের সাধনা মহাভাবের সাধনা। সংস্কার দেহের অনেক আবরণ উন্মোচিত করিয়া সাধককে এই সাধনার উপযোগী হইতে হয়। এ দীক্ষা যে-কোন লোকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায় না। পরম কৌলাচারী পরমহংস জাতীয় গুরুই এ বিষয়ে প্রকৃত গুরু; তিনিই অজ্ঞান তিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত করেন ও দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে পারেন।

দীক্ষা বাহ্য ও আন্তরভেদে দুই প্রকার। সকল প্রকার শাক্ত দীক্ষার মধ্যেই এই দুই প্রকার দীক্ষার স্থান আছে। বহির্দীক্ষায় বাহিরের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়, জীবের দেহ এই ভাবে শক্তি-পূজার উপযোগী হইয়া উঠে। আন্তরদীক্ষা বা মনোদীক্ষা অন্তরকে মহাশক্তির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে।

দিব্যভাবের সাধনায় প্রকৃত দীক্ষা 'মনোদীক্ষা'। দীক্ষা সেখানে শুধু দেহকে বিশুদ্ধ করে না, অন্তরের সকল সঙ্কোচ-ভাব ক্ষয় করিয়া সাধককে নির্মল বিবেক প্রদান করে।

মনের প্রকৃতি ও 'মনোদীক্ষা'র তাৎপর্য্য

মনকে দীক্ষিত করাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। মনের মত চঞ্চল, খরতম গতিশীল সূক্ষ্মতর আর কি আছে? বহির্বিশ্বের সহিত জীবের যে সংযোগ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়, তাহার পরিচালক মন। মন ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, তাহারই মন্ত্রণায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মন্ত্রমুগ্ধের মত কাজ করিয়া বিষয় গ্রহণ করে। অপর পক্ষে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম অন্তরিন্দ্রিয় মনদ্বারাই গৃহীত হয়।

মনের দোষ ও গুণ দুইই আছে। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের বিচারশক্তি নাই, সংশয় নাই, মনন নাই, মনের তাহা আছে। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। 'To be or not to be' এ সংশয় মনের, তাই মন চঞ্চল। মনই জীবকে সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান রাখে, হ্যামলেটের মত জীবনে গভীর কারুণ্যের সঞ্চার করে। মনই প্রশ্নে প্রশ্নে জীবকে অস্থির করিয়া তোলে, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া যত অনর্থ, মনই তাহার স্রষ্টা। মনের আবার সদ্গুণও আছে,—

> The mind is its own place, and itself
> Can make a heaven of hell, a hell of heaven.[১]

এদেশের শাস্ত্রেও এই কথাই বলে। সংশয়, মনন, বিচার—এগুলি মনের কার্য্য। মনই আস্তিক হয়, নাস্তিক হয়। ভালমন্দ বলিয়া জগতে কিছুই নাই, মনের মননের ফলেই একই বস্তু ভাল হয় বা মন্দ হয়। Shakespeare বলেন,

> 'There's nothing either good or bad, but
> Thinking makes it so'

মনের দুইপ্রকার ক্রিয়াই আছে। এই জন্য সাধকগণ মনের উপরই বেশি জোর দেন 'মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'—মনই মনুষ্যের বন্ধ অথবা মোক্ষের হেতু। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গেই ছুপবে। যেন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ।' এই জন্যই অন্যান্য দীক্ষা হইতে 'মনোদীক্ষা' অত্যাবশ্যক।

১। Paradise Lost, Book I, Milton

মনের দীক্ষা-ক্রিয়ায় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, ইহাতে কুলাকুল চক্র বিচার করিয়া, 'অকথহ' বা 'অকডম'—চক্র বিচার করিয়া, কাল-নিরূপণ করিয়া মন্ত্রীর মন্ত্রনির্ণয়ের প্রয়োজন নাই। মানসিক শিক্ষাই 'মনোদীক্ষা,' ইহার উদ্দেশ্য অন্তরকে উদ্বোধিত ও উদ্ভাসিত করা। যে মন সংশয়াচ্ছন্ন, তাহার সংশয় অপনোদন করা, যে মন বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়, কঠিন আঘাতে তাহার মোহাচ্ছন্নতা দূরীভূত করা, তাহাকে শিক্ষা দান করাই 'মনোদীক্ষা'র লক্ষ্য। মনকে বুঝাইতে হয়, জীব-প্রকৃতি কি, পরমার্থ কি চরমতত্ত্ব কি, মায়া-বন্ধন এড়াইবার কৌশলই বা কি? ইহাতে মনের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, শক্তিগ্রহণে মনের উপযোগিতা জন্মে, অবিচলিত শ্রদ্ধায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়, সেই মুহূর্ত্তে শিক্ষা দিতে হয় কুণ্ডলিনী-যোগের কৌশল, মাতৃ-আরাধনার প্রকৃষ্ট ক্রিয়া। 'মনোদীক্ষা'র ইহাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

শাক্তপদাবলীর 'মনোদীক্ষা' অধ্যায়ে বদ্ধজীবের প্রকৃতি, বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, উপাসনার গূঢ়ার্থ, মাতৃনামে ও মাতৃপদে অবিচলিত ভক্তি এবং কুণ্ডলিনী-যোগের কৌশল সম্পর্কে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে মন শিষ্য আর গুরু যেন পরমহংসরূপী আত্মারাম। 'মনোদীক্ষা'র চর্য্যা, ক্রিয়া ভক্তি ও মুক্তির উপদেশাবলী দিব্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জীব-প্রকৃতি ও মৃত্যুবিভীষিকা

জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে জীব যখন জননী-জঠরে থাকে তখন গর্ভ-বাসের যন্ত্রণাবশতঃ সে প্রতিজ্ঞা করে, জন্মগ্রহণ করিয়া সে জগজ্জননীকে বিস্মৃত হইবে না, মায়া-মোহে আবদ্ধ হইবে না। সে বলে,—

> বিষয়াংস্ত্বসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীম্।
> নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ॥ (ভগবতী গীতা, ৩।২৩)

কিন্তু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে সে-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়, সংসার-মায়ায়, মোহের অপ্রতিহত প্রভাবে সে মোহগ্রস্ত হয়ঃ

> এবং সংবদ্ধ সংসারবান্ধবো বিস্মরিষ্যতি।
> পূর্ব্বকর্ম্ম চ গর্ভস্থমুদ্ভূতি ক্লেশমেব চ॥ (প্রপঞ্চসারতন্ত্র, ২।৭৯)

ইহাই জীব-প্রকৃতি। মায়ের স্নেহ, বন্ধুবান্ধবের সৌখ্য, সর্ব্বোপরি পত্নী ও পুত্রের প্রতি মমত্ববোধ জীবের সদ্‌গুণ অপহরণ করে। 'জঠরস্থ ছিল যোগী, জন্মমাত্র কর্ম্মভোগী'—ফলে জীব হয় বদ্ধ। 'দারাসুত কলের দড়ি'র ফাঁস লাগিয়া 'জ্ঞানমুণ্ড'

ছিঁড়িয়া যায়, মনে হয়, বড় সুখের এই সংসার: 'কোলেতে কামনা-কান্তা,' সর্ব্বাঙ্গে 'আশার চাদর,' 'বিষয়-মদে'র নেশা। মানুষ 'দিবানিশি মাতাল'। মহাসুখের ঘুম, ভুলেও এ ঘুম ভাঙ্গে না। চৈতন্যহারা হইয়া সে ভাবে, 'কোথায় পাবে টাকার তোড়া।' ওদিকে 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্'—মোহভ্রান্ত জীব, তাহা দেখিয়াও দেখে না; দেখে না—'কাল করিছে হৃদে বাস।' এই ভাবেই জীব 'ঐবিসুখে'[১] সুখী হয়। ষড়রিপুর অধীন জীব, নিদ্রা, ক্ষুৎপিপাসা, মদন নলে ক্লিষ্ট হইয়াও ওইগুলিকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে।

এই আপাতরমণীয় সুখকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া প্রকৃত সত্যের প্রতি মনকে আকর্ষণ করা 'মনোদীক্ষা'র প্রথম অঙ্গ। তত্ত্বজ্ঞান-বিস্মৃত মনের প্রতি আত্মারামের প্রথম উপদেশ:

> জঠরস্থ ছিলে যোগী জন্মিয়ে হলে ভোগী,
> শ্যামা-নামামৃত ত্যাগী, বিষয় সম্ভোগী হলে। (দেওয়ান রঘুনাথ)

কিন্তু এ উপদেশেও মোহনিদ্রা ভাঙ্গে না, তাই প্রয়োজন হয় 'মোহ-মুদ্গর', অতি ভীষণ মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইয়া সুপ্তির ঘোর ভঙ্গ করিতে হয়। তাই দীক্ষাগুরু গর্জন করিয়া বলেন, 'এই যে স্বপনের নিশি জেনেছ কি প্রভাত হবে না?' পার্থিব সুখের আনন্দমত্ততাকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মহাকাল অপেক্ষা করিতেছেন। 'গমনের দিন আর বাকি নাই,' 'ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে নেওয়া।' মৃত্যুর আগমন সুনিশ্চিত।

যে সকল রমণীয় বস্তুর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তাহা নশ্বর, অনিত্য, মেকী। অর্থ, দারা সুত, আশা-কামনা, ষড়রিপুর মোহানন্দ, ইন্দ্রিয়াদির মনোরম আয়োজন—সবই ক্ষণস্থায়ী: 'চাকি কেবল ফাঁকি নাম', ইন্দ্রিয় বলে নন্দ ইন্দ্রত্বও অসার, 'পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব দশেন্দ্রিয় অবশ হলে।'

প্রকৃত সত্য: মাতৃনাম

সংসারে সবই অনিত্য, একমাত্র নিত্যবস্তু জগজ্জননী—কালী। বিশ্বের সব অসত্য সত্য কেবল 'মা'; জগতের সুখানন্দ নশ্বর, অবিনশ্বর চির আনন্দের আকর আনন্দময়ী 'মা'। এই মায়ের নামকেই শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। ভক্ত ও সাধকের নিকট নাম ও নামী অভিন্ন। তাই নাম লইয়াই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, তাঁহার নামে তন্ময় হইতে হইবে। কালী মহাকাল-কলনকর্ত্রী, তিনিই কালভয়-নিবারিণী, তিনিই

১। ঐবিসুখ—অরি+বৈরী=ঐবি: ঐবিসুখ বলিতে বুঝায় সেই সুখ, যাহা আপাতরমণীয় এবং পরমার্থ লাভের অন্তরায়।

রক্ষাকর্ত্রী। 'মা'কে স্মরণ করে না বলিয়াই জীবের দুর্গতি, সে তত্ত্বজ্ঞান-হারা, মৃত্যুভয়ে ভীত : তাই আত্মারামের উপদেশ :

মন, কেন রে ভাবিস এত,
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ?
ভবে এসে ভাবছে বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত। (রামপ্রসাদ)

অবিচলিত চিত্তে মাতৃনাম স্মরণ করাই সাধনার প্রধান ক্রিয়া। শক্তি-সাধকের যাবতীয় ধ্যান জ্ঞান মাতৃনাম। মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাব ও ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিই মুক্তি ও জ্ঞানের সোপান। অতএব ভক্তের পক্ষে মাতৃনামই একমাত্র সম্বল : 'ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ ধাম নাম।'

শাক্তপদাবলীতে মাতৃনামের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মাতৃনাম যেমন গুণ ও রূপভেদ অসংখ্য, তাহার মহিমাও তেমনই অনন্ত। 'দুর্গানামে রয় না জীবের ভয়-ভাবনা,' 'নিলে তারা নাম, তবে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো'। কালী নামের কাছে তীর্থ-পর্যটনের পুণ্য, পূজা-সন্ধ্যা সব তুচ্ছ। 'মা নামের তুলনা নাই' এমন সুধাভরা নামে ভক্ত-হৃদয় মাতোয়ারা। তাই প্রেমিক যেমন বলেন,

'যে যা খুসি বলে বলুক,
আমি সদাই বলব কালী কালী।

সাধকও তেমনই বলেন,—

'জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥' (মহারাজ রামকৃষ্ণ)

মনকে তাই উপদেশ দেওয়া হয়, 'কালীর নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' মাতৃনামেই ভূতে-পাওয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহের শুদ্ধি হয়, দেহে সাধন-বীজ উপ্ত হয়। মাতৃনামই একপ্রকার ন্যাস : মাতৃনামে দেহ-মনকে মাতৃময় করিয়া তোলা যায়। এমন কি মুক্তিও কালীনামে সহজলভ্য : শক্তি-সাধকের মন্ত্র-দীক্ষা নামেরই দীক্ষা, কারণ বীজ-মন্ত্র মাতৃকাবর্ণময়। তাই সাধক বলেন,

যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে। (রামপ্রসাদ)

তাই মাতৃনামের উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাতৃনাম-রূপ মহামন্ত্র জপ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। তন্ত্রে তাই বার বার বলা হইয়াছে, 'জপাৎসিদ্ধি

জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্নসংশয়ঃ।' কালীর নামই ভক্তির মূল, মুক্তির উপাদান —তাই মাতৃনামদ্বারাই উপাসনার উদ্বোধন।

প্রবৃত্তিজয়ের উপায়

সাধন-পথের প্রধান অন্তরায় প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি হইতেই সংসার-মোহ, বন্ধন। ইন্দ্রিয়াসক্তি, কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনা জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। বিষয়াসক্তি রজ্জু না হইলেও রজ্জুর মত মানুষকে বন্ধন করেঃ 'অরজ্জুবন্ধনং সঙ্গো দুষ্টসঙ্গো মহাবিষঃ'। ভক্তির ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, ইহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবেঃ "মন, অগ্রে শশী[১] বশীভূত কর তোমার শক্তি-সারে।'

প্রবৃত্তিকে জয় করিবার উপায় কি? তন্ত্রে এ সম্পর্কে বলা হইতেছে,—

'দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নমমেতি চ মুচ্যতে॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

—মমতা-রাহিত্যই বন্ধন-মুক্তির উপায়। 'মনোদীক্ষা'র কয়েকটি সঙ্গীতে এই মমতা-রাহিত্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামপ্রসাদের 'আয় মন, বেড়াতে যাবি'—গানটি প্রবৃত্তি-জয়ের নির্দ্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ঠাকুর পরমহংসদেব এই পদটি গান করিয়া, সংসারে থাকিয়াও যে জনকরাজার মত ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ সংসার করিয়াও সাধন-পথের পথিক হওয়া যায়। প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে, ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া মোহের প্রভাব অতিক্রম করিতে হইবে। এই ভাবে যেদিন শুচি ও অশুচি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবোধ বিলুপ্ত হইবে, সেই দিনই মানুষ জীবন্মুক্ত হইবে, হইবে বিদেহ-পতি জনক রাজার মত। পদটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রভাব বর্ত্তমান।[২]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'বাসনাতে দাও আগুন জেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাটি'—পদটির মধ্যেও বাসনা-জয় করিবার সঙ্কেত রহিয়াছে।

সাধন-পদ্ধতি

'মনোদীক্ষা' পর্য্যায়ের পদাবলী সাধনার ক্রম, সাধন-পদ্ধতির উপদেশাবলী ও উপাসনার সঙ্কেতে পরিপূর্ণ। অতি প্রাথমিক স্তর হইতে কি ভাবে ক্রমে

১। শশী—কাম। ২। দ্রষ্টব্য অবতরণিকা, ৪২ পৃষ্ঠা।

ক্রমে সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, মনকে তাহারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দেহমল ও মনোমল দূরীভূত হইলে শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি ও ভাবের উৎপত্তি। এই ভাব ও ভক্তির উপরে সাধক ভক্ত অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেবী কহিয়াছিলেন,

কিন্তুসুদুর্লভা° তাত মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্।
তস্মাদভক্তিঃ পরা কার্য্যা ময়ি যত্নাদ মুমুক্ষুভিঃ। (ভগবতী গীতা)

শাক্তপদাবলীর কবিগণও বার বার এই কথা কহিয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?' 'মা ভক্তি-রসের রসিক,' মাতৃভাবে বিভোর হইয়াই পরতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। শক্তিসাধকের যোগ-যাগ, ধ্যান-জ্ঞান সবই ভক্তি-মুখী তাই গুরুর উপদেশ, 'সযতনে ভক্তি-ডোরে পায়ে ধরে বাধবে তারে'। প্রেমিক ভট্টাচার্য্য বলেন, 'পাবি না ক্ষ্যাপা মায়েরে ক্ষ্যাপার মত না ক্ষেপিলে,'—

নৃত্য কর প্রেমে মেতে সদা কালী কালী বলে
'আয় রে পাগল ছেলে' বলে পাগলী মায়ে নেবে কোলে।

রসিকচন্দ্র রায়ের 'সাধনরূপ গ্রাবৃ্যখেলা এই বেলা মন, খেলিয়ে নে রে' পদটির মধ্যেও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবকে সোপান করিয়া সমাধি ও মুক্তির পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ শক্তি-সাধকের মাতৃপূজা ভাবেরই পূজা। ইহাতে কপটতার কোন স্থান নাই। 'সাতগেঁয়ে আর মামদোবাজি' দিয়া মাকে লাভ করা যায় না। ইহা 'ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, ভোগ' দিয়া কাড়িয়া লওয়া যাইবে। দ্বেষাদ্বেষি করিলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে লীলা করিয়া চলিয়াছেন। শক্তি-সাধকের 'ব্রহ্মময়ী মা' সর্ব্বঘটে বিরাজ করেন। ভাবময়ী মাকে ভাবের পূজা করিয়াই লাভ করিতে হয়, মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ মাতৃপূজা। তাই গুরু মনকে উপদেশ করেন,

মন, তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে বস রে ধ্যানে॥
ধাতু পাষাণ-মাটির মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদিপদ্মাসনে। (রামপ্রসাদ)

কুণ্ডলিনী-যোগ

দেহের সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। মাতৃপূজার অঙ্গ ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস প্রভৃতির মধ্যে তাহার কথা রহিয়াছে। দেহ-সাধনার ভিত্তি কুণ্ডলিনী-যোগ। 'মনোদীক্ষা' শীর্ষক পদাবলীতে গুরু আত্মারাম মনকে সে যোগ-শিক্ষার কৌশল দেখাইয়া দিয়াছেন। হাতে-কলমে না শিখিলে মাতৃ-সাধনা করা যায় না। দেহ, বায়ু, নাড়ী লইয়া যে সাধনা, তাহা একান্তভাবে গুরুমুখী; দীক্ষা দিবার সময়ে গুরুই তাহা শিষ্যকে শিখাইয়া দেন: 'মনোদীক্ষা'র অংশে কয়েকটি রূপকের সাহায্যে সাধক কুণ্ডলিনী-যোগের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

(১) 'মন, থাক তুমি চুপটি করে। তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছ ধরে॥'—পদটির মধ্যে যোগদ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে অনাহত পদ্মে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। পূরক করিতে করিতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপন করিয়া, হৃদযাম্বুজে আনিয়া কুম্ভক করিতে হইবে; সুযোগ বুঝিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। পদটির মধ্যে ভক্তির কথাও আছে: 'সযতনে ভক্তি-ডোরে পায়ে ধরে বাঁধবে তারে।'

(২) কমলাকান্তের 'মনপবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে'—পদটিতে দেহকে মন-পবনের নৌকা বলা হইয়াছে, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই দেহের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মন ইহার যন্ত্র, কুণ্ডলিনী ইহার পাল, অনুকূল শ্বাস-প্রশ্বাস সুবাতাস। অনুকূল বাতাসে কুণ্ডলিনী-পাল তুলিয়া দিতে হইবে, মানসিক সুবৃত্তি ও কুবৃত্তিগুলিকে (সুজন, কুজন) নৌকার দাঁড়ি করিয়া রাখিতে হইবে। মনকে মহামন্ত্রে (শক্তিমন্ত্রে) শোধিত করিতে হইবে; দুর্গানাম স্মরণ করিয়া নৌকার নোঙর খুলিতে হইবে। যদি তুফান আসে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি এলোমেলো হইয়া যায়, তবে 'সারি' গাহিতে হইবে; তাহার অর্থ—মন, বায়ু, মানসিক বৃত্তি এবং কুণ্ডলিনী শক্তি যাহাতে একমুখা হয়, ঐকতানে গান গায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ যোগ-সাধনায় এগুলি পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

(৩) রামপ্রসাদের 'ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥'—গানটি কুণ্ডলী-যোগের নির্দ্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ইহাতে ভক্তি ও জ্ঞানের সমযোগে কিরূপে শক্তিকে আয়ত্ত করা সম্ভব, রত্ন আহরণকারী ডুবুরীর রূপকে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥

শক্তি জ্ঞানগম্যা, জ্ঞান আবার ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াযোগদ্বারা ভক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। ভগবতী গীতায় বলা হইয়াছে, 'জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি-র্ভক্তি জ্ঞানস্য কারণম্। কর্ম্মণো জায়তে ভক্তির্ধর্মযজ্ঞাদিকস্য তু॥' এখানে কর্ম্ম-যজ্ঞাদি কর্ম্ম নয়, কুণ্ডলিনী-যোগরূপ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া সাধন করিতে হইলে সাধককে ডুবুরীর মত রত্ন-আহরণে ব্রতী হইতে হইবে। জীব-হৃদয় রত্নাকর সদৃশ; এখানে জীবাত্মা রহিয়াছেন। জীবাত্মাকে লইয়া মূলাধারে কুণ্ডলিনীর সহিত মিলিত করিতে হয়; বার বার পূরক-কুম্ভক করিতে করিতে এই যোগ সাধিত হয়; তাই সাধক বলেন, 'দুচার ডুবে ধন না পেলে, তুমি দম সামর্থে ডুব দিয়ে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে।' যোগ-সাধনায় ষড়্‌রিপু প্রধান বাধা। হৃদয়-সমুদ্রেও কামক্রোধাদি কুমীর আছে। কিন্তু গায়ে হলুদ মাখা থাকিলে কুমীর ডুবুরীকে স্পর্শ করে না। বিবেক সেই হলুদ; 'তুমি বিবেক হলদি-গায়ে মেখে নাও', তাহার গন্ধে কুমীর পলাইয়া যাইবে, কামাদি ছয় কুম্ভীরের উদ্যত গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। মানব-দেহ, হৃদয়—এগুলি আনন্দময়ীর আনন্দ-সাগর, রত্নের ভাণ্ডার। ইহা হইতে সেই আনন্দ-রত্ন আহরণ করিতে হইলে ঝাঁপ দিতে হইবে (=যোগ করিতে হইবে); 'ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে'। সাধকমাত্রই এই রত্ন-সাগরে ডুব দেন, সে রূপ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যান; রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।'

(৪) কমলাকান্তের 'আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে'—পদটির মধ্যে স্বদেহেই পরম ধন প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। 'যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' মণি-মাণিক্যের মহামূল্য ভাণ্ডার এই দেহ-ভাণ্ড; এখানে কিসের অভাব? যে পরশ-মণির স্পর্শে সব-কিছু স্বর্ণময় হইয়া যায়, জীবদেহ যাঁহার স্পর্শে সকল সঙ্কোচ-আবরণ ত্যাগ করিয়া দলে দলে বিকশিত হয়, শক্তির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, হয় জ্যোতির্ম্ময়—সে পরশমণিরূপ কুণ্ডলিনী এই দেহেই আছেন। ভক্তি, ভাব, জ্ঞান সব-কিছুর আধার দেহ; চিন্তামণির আবাসস্থল দেহ, ইহার বহির্দ্বারেই কত মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি। দেহকে ছাড়িয়া বাহিরের তীর্থ-স্নানেও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, দেহের রসবাহী নাড়ীগুলি তৈর্থিক পুণ্য সঙ্গম; ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, সুষুম্না সরস্বতী; ইহাদের মিলনস্থল পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম; মূলাধার এবং আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে এই ত্রিবেণী-সঙ্গম রহিয়াছে; সেইখানে মনঃস্থির করাই ত্রিবেণী-স্নান। এই অন্তঃস্নানই দিব্যাচারীর তীর্থ-স্নান; তাঁহারা বলেন, 'অন্তঃস্নানবিহীনস্য বহিঃস্নানেন কিং

কলম্?' শক্তি-সাধকের উপাস্যা দেবী মহামায়া (=বাজিকর), তিনিও এই দেহেই আছেন, 'সে তোমার ঘটে বিরাজ করে'—সাধকের তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হয়।

ধ্যান ও সমাধি

যোগ-ক্রিয়ার শেষ দুইটি অঙ্গ ধ্যান ও সমাধি। 'মনোদীক্ষা' অংশে এ সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দেহস্থ যে-কোন শক্তি-কেন্দ্রে মনকে বদ্ধ করাকে 'ধারণা' বলে: 'স্থান-স্থাপনকর্ম্ম প্রোক্তা স্যাদ্ধারণেতি তত্ত্বজ্ঞৈঃ' (প্রপঞ্চসারতন্ত্র)। যাহাকে চিত্তে ধারণা করা হয়, একতান চিত্তে তাহার ভাবনার নাম ধ্যান: 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' (পাতঞ্জল দর্শন)। তন্ত্রাদিতে ধ্যানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে:

> ধ্যানযোগপরস্যাহস্য পূজা নাস্তি কথঞ্চন।
> ধ্যানযোগাদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি॥ (শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

চিত্তদ্বারা দেবতার রূপ ও স্বরূপ চিন্তার নামই ধ্যান: ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার। দেবতার রূপময় মূর্ত্তি চিন্তার নাম সগুণ ধ্যান। আর অপ্রমেয় আনন্দ-স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মা-শক্তির ধ্যান নির্গুণধ্যান। এই ধ্যানে সাধক একদিকে যেমন ইষ্ট-ধ্যানে তন্ময় হইয়া যান, তেমনই অন্যদিকে ইষ্টে চিত্তলয় হেতু—'আত্মাভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ'--দেবতার সহিত অভেদ চিন্তা করিয়া তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তখন সাধকের 'অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি'—এই ভাব।

এই লক্ষ্যে যাইবার জন্যই 'মনোদীক্ষা'র আয়োজন। দীক্ষিত ব্যক্তিকে আদর করিয়া শ্যামা মাকে হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া ধ্যান করিতে হইবে: ষড়্‌রিপু ও ইন্দ্রিয়গুলিকেও মাতৃমুখী করিয়া তুলিতে হইবে: ইন্দ্রিয়গ্রাম একতালে মাতৃমন্ত্র গান করিবে; 'রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন 'মা' ব'লে ডাকে।' রামপ্রসাদের 'দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা'—পদটিতে ধ্যান ও সমাধির এই সঙ্কেত রহিয়াছে। দেবী নীল কাদম্বিনীবরণী, লোলরসনা, দিগ্‌বসনা; প্রথমে এই স্থূলরূপকে ধ্যান করিতে হইবে; ক্রমে ক্রমে ভাবনা করিতে হইবে, তিনি স্থূল হইলেও সূক্ষ্ম, ব্যক্ত হইলেও অব্যক্ত, লোলরসনা হইলেও আনন্দময়ী, আনন্দস্বরূপিণী; দেহস্থ চক্রে তাঁহার অধিষ্ঠান:

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন, জান না

সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা। (রামপ্রসাদ)

—আনন্দে এই আনন্দময়ীকে হৃদয়ে স্থাপন করিতে হইবে, জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া অনুভব করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মময়ী। ইহাই স্বরূপ-ধ্যান। জ্ঞানাত্মক এই ধ্যানে সাধক 'সোঽহং' স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ভক্ত, সাধক এরূপ লয়-মুক্তি কামনা করেন না, সগুণ ধ্যানের দ্বারা মাতৃ সামীপ্যই তাঁর কাম্য: ভক্তের কথা, 'সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না।'

'মনোদীক্ষা'-পদাবলীর সৌন্দর্য্য

শাক্তপদাবলীর 'মনোদীক্ষা'র পদগুলি দুরূহ সাধন তত্ত্বের নির্দ্দেশপূর্ণ হইলেও নানাদিক হইতে চিত্তহারী। পদগুলি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ভক্তজনের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা, তান্ত্রিক সাধকের নিকট যোগ ক্রিয়ার ভাষা ভাষ্য, বিষয়াসক্ত গৃহস্থের পক্ষে 'মোহমুদ্গর'। বদ্ধ বা মুমুক্ষু, ভোগী বা যোগী, জ্ঞানী বা প্রেমিক সকলের কাছেই 'মনোদীক্ষা'র নির্দ্দেশগুলি রুচিকর। প্রত্যেকটি পদ মাতৃ-অনুরাগের অঞ্জনে অনুলিপ্ত, 'সুধামাখা, বলিহারি।'

কঠিন সাধন তত্ত্বের কথা পরিচিত রূপকে বিধৃত হওয়ায়, উপদেশগুলি সহজ ও বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে, 'মনোদীক্ষা'র সাধন নির্দ্দেশ তাহা অপনোদিত হয় এবং এই সুদিব্য সাধনার প্রতি সহজেই হৃদয় আকৃষ্ট হয়। মাতৃ-সাধনা যে কামনা পরিতৃপ্তির সাধনা নয়, স্থূল ইন্দ্রিয়াদির আসক্তিকে সংযত করিয়া দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিবার সাধনা, 'মনোদীক্ষা'র পদাবলী পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত প্রবৃত্তি, যাবতীয় রিপু, দেহস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাম —সকলেই মায়ের সেবায় নিযুক্ত: মাতৃ-সাধনায় কেহই উপেক্ষিত নয়, সকলেই অপেক্ষিত: তাই তো গুরু উপদেশ করেন, 'সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে', 'রসনারে সঙ্গে রাখি সে-ও যেন 'মা' ব'লে ডাকে।'

কাব্যামোদীর নিকটও 'মনোদীক্ষা'-পদাবলীর আবেদন তুচ্ছ নয়। সাধন-তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া, কেবল যদি রূপকগুলির বহিরঙ্গ বিচার করা যায়, তবে তাহার আকর্ষণও কম মনে হয় না। মন-ঘুড়ির গোঁত্তা খাওয়া, সাধের ঘুমের চিত্র, ধোপার কাপড়-ধোলাই করার কৌশল, কৃষকের কৃষি কাজ, সেতারে সুতানে গৎ বাজানো, চতুর্দ্দলে ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরার সঙ্কেত, স্ত্রী-সঙ্গে ভ্রমণ, বাদাম তুলিয়া নৌকা

খাওয়া, ডুবুরীর মত 'রত্ন' আহরণের ইচ্ছায় সাগরজলে ডুব দেওয়া প্রভৃতি চিত্রগুলি পরিচিত বাস্তব চিত্র, এগুলি মানবীয় ভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া হৃদয়গ্রাহী।

সর্ব্বোপরি মনের সহিত বিবেকের একান্তে বোঝা-পড়ার কল্পনাটি অতিশয় কবিত্ব-পূর্ণ। মন নবদীক্ষিত শিষ্য, আর জীবের বিবেকরূপী আত্মারাম গুরু। একই দেহে দুইটি 'আমি', ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভাষায়, একটি 'কাঁচা আমি', আর একটি 'পাকা আমি'। মন কাঁচা আমি, সে ভোগ-প্রমত্ত, কামনা-কান্ত-সর্ব্বস্ব, সুখ-নিদ্রা-কাতর, অর্থলোভী, 'পাঁচ সওয়ারের তুর্কী ঘোড়া'—অতএব বদ্ধ, আর উপদেষ্টা গুরু ভূয়োদর্শী, সত্যদ্রষ্টা, সিদ্ধ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষ। ইনি ঠাকুর পরমহংসের মতই পরমহংস, অনেক কালের 'পাকা আমি', ইনিই বিবেক। মনের প্রতিটি ক্রিয়া, প্রতিটি গতি ইহার নখদর্পণে, মন 'সে ত হয়ত সোনা নয়ত মাটি'—ইহা তিনি জানেন, মনের নিম্নগতি ও ঊর্দ্ধগতি সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই কত কৌশলে, কত যত্নে মনের প্রতি উপদেশ। কখনও তাহার প্রতি বিদ্রূপ, কখনও তিরস্কার, আবার কখনও 'বাপু বাছা বাপের ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন। মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকৃতির বিশ্লেষণে মনোদীক্ষা গুরুর অসাধারণ পারদর্শিতা। 'মনোদীক্ষা'র গুরু,—মনস্তত্ত্ববিদ, সংসারাভিজ্ঞ, তিনি যোগী হইয়াও কবি, তাই এই অধ্যায়ের কবিতাবলী কাব্যের দিক হইতেও উৎকৃষ্ট, বিশেষ করিয়া মন ও বিবেক-সংবাদ কল্পনার মনোহারিত্বে অভিরাম।

॥ পাঁচ ॥

মাতৃপূজা

শাক্তপদাবলীর সকল ভাবই মহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, মাতৃপূজার আদর্শও অতি উন্নত। হিন্দুর পূজা-অর্চনা, যোগ-যাগ কোনটাই আড়ম্বর বা বিলাস মাত্র নয়, মহান ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার শেষ লক্ষ্য। দেহের তামসিক আবরণ উন্মোচিত করিয়া জ্ঞানের বিকাশ করাই প্রতিটি সাধনার উদ্দেশ্য। তন্ত্রশাস্ত্র ধীরে ধীরে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

মানুষের কামনা মুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ হিন্দুগণ বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন: কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি উপায়। আপাততঃ একটি অন্যটির বিরোধী বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদকে নিম্নস্থান প্রদান করেন,

ভক্তিবাদী আবার জ্ঞানের অসারতা প্রতিপন্ন করেন ; জ্ঞান কর্ম্মকে পরিহার করে, আর কর্ম্মযোগী জ্ঞানের নিন্দা করেন। পূর্ব্বমীমাংসায় উত্তরমীমংসার খণ্ডন করা হইয়াছে, উত্তরমীমাংসায় পূর্ব্বমীমাংসার নিরর্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে : 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' প্রেমিকভক্ত চৈতন্যদেব অদ্বৈত জ্ঞানবাদীর মত খণ্ডন করিয়া নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে, সাকার, সগুণ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান,' কিন্তু তিনি প্রেমময়, প্রেমের মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। উপাসনা-বিষয়ে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী নানা মত প্রচলিত আছে।

তন্ত্রশাস্ত্র এ বিষয়ে সমন্বয়বাদী। শাক্তধর্ম্মে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম কোনটাকেই উপেক্ষা করা হয় নাই। গীতায় যেমন সর্ব্ববাদের সমন্বয় দেখা যায়, তন্ত্রেও সেই চেষ্টা রহিয়াছে। তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত। মানুষের সংস্কার অনুযায়ী ইহার দীক্ষা ও সাধন-পদ্ধতি। তন্ত্রোক্ত সাধনা স্তর-বিন্যস্ত, কোন স্তরকে বাদ দিয়া কোন স্তরে যাইবার উপায় নাই। ভাগবতী গীতায় বলা হইয়াছে, 'জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যম্', কিন্তু এই জ্ঞান কর্ম্মসাপেক্ষ : 'সহায়তা ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারী চ।' ভগবতী গীতায় সাধন-স্তরগুলির ক্রম-বিন্যাস আরও সুস্পষ্ট, এখানে বলা হইয়াছে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, কিন্তু জ্ঞান ভক্তি-সাপেক্ষ, ভক্তিকে উদ্বোধিত করে কর্ম্ম—এই কর্ম্ম পূজা অর্চ্চনা যজ্ঞাদি ক্রিয়া। তন্ত্রের সাধন-ক্রমগুলিও ঠিক এইরূপ : স্থূল উপাসনা হইতে সূক্ষ্মের প্রতি যাত্রা।

তাই তন্ত্রে পূজা অর্চ্চনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার মন্ত্র, মণ্ডল, জপ ও হোমের নির্দ্দেশে পূর্ণ। কিন্তু বাহ্যপূজার অন্তরালে যে গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তান্ত্রিক সাধক সম্পূর্ণ সজাগ, এইজন্যই বাহ্যপূজার মধ্যেও মানস পূজার ব্যবস্থা। দিব্যমন্ত্রীর বাহ্য পূজা নাই, তাঁহার কেবলই মানস পূজা বা অন্তর্যাগ, বাহ্যপূজা হইতে অন্তঃপূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়—'অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটি ফলং লভেৎ।' (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

শাক্তপদাবলীর মাতৃপূজা ভাবের পূজা

শাক্তপদাবলীর মাতৃপূজা' অংশে এই মানসপূজার প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্কেত করা হইয়াছে। তাহার প্রথম কথা, 'জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,' অতএব তাঁহাকে গোপনে, দেহাভ্যন্তরে পূজা করিতে হইবে। এই মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ মাতৃপূজা। এই পূজায় দেহের মধ্যে হৃদয়ে মায়ের আসন স্থাপন করিতে হয়, দেহ হইতেই বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া মায়ের পূজা করিতে হয়।

দেহ তো ক্ষুদ্র নয়, ইহা যে সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রতীক, দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্ব্বত, সরিৎ-সাগর এই দেহেই আছে। এইখানেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; এইখানেই গন্ধতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব (=শব্দতত্ত্ব); এই দেহেই আছে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশেন্দ্রিয়—আছে অমায়া, বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ। অতএব দেহে অভাব কিসের? দেহপীঠেই মায়ের উপাসনা হইবে—'তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদিপদ্মাসনে।' তন্ত্রোক্ত মানস পূজার নির্দ্দেশ এই পদটিতে ভাষা-রূপ লাভ করিয়াছে :

হৃৎকমল মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে ॥
সহস্রার চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে
পূজ যথাবিধি মতে অর্ঘ্য দিয়া মনেরে ॥
তদামৃতে আচমন তদামৃতে করাও স্নান
আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন ;
চিত্তপুষ্প, প্রাণধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ,
করে নৈবেদ্য স্বরূপ দেও অমৃত অম্বুধিরে ॥
অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর
সহস্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর ;—
শব্দতত্ত্ব কর জ্ঞান, নর্ত্তকী ইন্দ্রিয়গণ
কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অসি করে ধরে ॥
যেইরূপ আছে তন্ত্রে, রসনা কর হে যন্ত্রে
কালীর নাম মহামন্ত্র জপ দৃঢ় ক'রে ॥ (রামকুমার পত্রনবিশ)

বিবিধ উপচার দিয়া মায়ের পূজা করিতে হয় : পঞ্চোপচার। দশোপচার বা ষোড়শোপচার। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য—এইগুলি পঞ্চোপচার। 'পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং মধুপর্কাচমনংতথা। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥' মূর্ত্তির পূজা ষোড়শোপচার বা অষ্টাদশোপচারে করিতে হয় : সে পূজার উপকরণ,—

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাচমনং ততঃ ॥
তাম্বুলমার্চ্চনা-স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমক্রিয়া।

মানস পূজায় এই সকল উপচার দেহ হইতেই আহরণ করিতে হয়। শাক্তপদাবলীতে ভাবের পূজার উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মাতৃপূজার প্রধান উপকরণ

ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান : 'ভক্তি গঙ্গাজল, মনোবিল্বদল, শতদল দিলে হয় সাধনা।' স্বার্থ-আশা বলি দিয়া, বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া মাতৃপূজা করিতে হইবে। মাতৃপূজায় জাতিভেদ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া 'ভক্তি-ভাবে ডাকলে পরে মা কি ভুলে থাকতে পারে?' এই ভক্তি লইয়া পূজা করিলে পূজকের দেহে মহাশক্তির উদ্বোধন হইবে। জীবদেহে মহাশক্তির উদ্বোধন করাই শক্তি-পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য।

'ব্রহ্মময়ী' মায়ের পূজা

তন্ত্রে স্থূল সাধনা অপেক্ষা সূক্ষ্মের প্রতিই বেশী লক্ষ্য; রূপময়ী মায়ের অনুধ্যান হইতে রূপ বিবর্জ্জিতা ব্রহ্মময়ী মায়ের ধারণা করিতে হয়। তপঃসম্ভূত জ্ঞানেই মুক্তি। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময়ী হইযা যায়, তখন জ্ঞেয়-জ্ঞাতার জ্ঞানও লুপ্ত হয়। অবশ্য মানস পূজা ও যোগ-সাধনাতেও, পূজ্য ও পূজক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যান, কিন্তু যাঁহাব 'সবই ব্রহ্মময়ী' এই বোধ হইয়াছে, তাঁহার ভাব আরও উচ্চাঙ্গের। ইহা দিব্যজ্ঞানের অবস্থা: বাহ্য ও মানস—সর্ব্বপ্রকার পূজা, কিম্বা যোগ সবই তাঁহার নিকট নিরর্থক :

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা-ধ্যান-ধারণা ॥[১]

বস্তুতঃ 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো যোগো ন চ পূজনম্'। শাক্তপদাবলীর একটি গানে ব্রহ্মময়ী জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধকের অনুভূতির বিবরণ আছে; পদটি মাতৃ-উপাসনারচরমার্থ-ব্যঞ্জক। এখানে কবির প্রশ্ন :

বল মা তোমায় কি দিয়ে পূজি গো ব্রহ্মময়ি!
আমি দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বৈ॥
ব্রহ্ম হতে পরমাণু, সকলি তোমার তনু,
মাগো অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ॥

ব্রহ্মময়ী মা বিশ্বব্যাপিনী, মানস-উপচারগুলির মধ্যেও তিনি অনুস্যূত; হৃদি-পদ্মাসন তাঁহার চির আসন, সহস্রার-চ্যুতামৃতে মায়ের পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে হয়, আচমন করাইতে হয়, স্নান করাইতে হয়। কিন্তু এ অমৃতও যে মায়েরই পদ-বিগলিত অমৃতধারা। অতএব মাতৃ চরণামৃতে মাতৃপূজা কি করিয়া হয়? তাই সাধক বলেন, 'তোমার

১। মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্দ্দশ উল্লাস।

'চরণামৃতে তোমারে দিব কি মতে মাগো!' আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বও প্রধান প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট: তেজতত্ত্বও তিনি:

'রবিত্বেন ভূত্বান্তরাত্মা দধাসি প্রজাশ্চন্দ্রমস্ত্বেন পুষ্ণাসি ভূয়ঃ।
দহস্যগ্নিমূর্ত্তিং বহস্যামাহুতিং বা মহাদেবি! তেজস্ত্বয়ংত্বত্তএব॥'[১]

অতএব মাকে ব্রহ্মময়ী বলিয়া জানিলে, তিনি ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কিছুই থাকে না। জ্ঞানীর নিকট মায়ের পূজা যেন 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।' শুধু তাই নয়, তিনিই যদি সব, তবে কে কাহার পূজা করে? 'আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবু কি আর আমি রলেম মাগো!' বস্তুতঃ তখন ব্রহ্মময়ী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সবই মা, সবই ব্রহ্মময়ী।

ইহা এক অচিন্ত্য তত্ত্ব! এই তত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাঁহার কৃত্যাকৃত্য কিছুই নাই। তিনিই পরম কৌলাচারী: 'স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্।' তিনি দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি অহরহ মাতৃময়। তাঁহার কাছে উপাসনার কালাকাল বিচার নাই, 'উপাসনা সর্ব্বকাল', বিধি-বন্ধনও তাঁহার নাই, 'নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি।' দিব্য সন্ন্যাসীর দেহে পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতীর্থ। তিনি উদার, দিগ্-দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত। তাঁহার কাছে সব মাতৃময়; মগের 'ফরাতারা', ফিরিঙ্গির 'গড্', মুসলমানের 'আল্লা', শৈবের 'শিব', বৈষ্ণবের 'রাধিকা'—সব তাঁহার চোখে এক মহাশক্তির প্রকাশ। এককে দুই ভাবিয়াই, মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, আসে সংশয়; দিব্যজ্ঞানী এই দ্বিধা হইতে মুক্ত। পরম ঐক্যবোধে তিনি তন্ময়, তাই তিনি ভেদজ্ঞানের অতীত। তিনি 'মুক্তোঽবিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ।'—সর্ব্বঘটে তাঁহার দেবী-সন্দর্শন। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মাতৃপূজার শেষ লক্ষ্য।

মাতৃপূজার ফলশ্রুতি: সাধন-শক্তি

শক্তি-আরাধনায় সাধকের মধ্যে শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। অপ্রমেয় শক্তিকে দেহমধ্যে সঙ্কর্ষণ করা শক্তি-সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য। যে-কোনরূপ ভাবে শক্তিসাধনা করিলে এই দেহেই শক্তির স্ফুরণ ঘটে। পশুভাবের শক্তিপূজায় হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়; এই ভক্তির শক্তিও অসাধারণ! কথায় বলে, ভক্তিতে পাহাড় টলে। ইহা মিথ্যা নয়। ভক্তির আকর্ষণী শক্তি অপরিসীম। অন্তরে গর্গর প্রেম, মদমত্ত হস্তীর মত পদবিক্ষেপ। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি ভক্তি হইতেই সঞ্চারিত হয়।

১। প্রপঞ্চসারতন্ত্র, একাদশ পটল।

এই ভক্তি দৃঢ়তর হয় বীরভাবের সাধনায় ; তখন দেহে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ঘটে। বীরাচার সাধনায় মন্ত্রসিদ্ধি হইলে :

হৃদয়গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূনি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥ (তন্ত্রসার)

এখানে একদিকে ভক্তি-চিহ্নের প্রদীপ্ত প্রকাশ : দেহস্ফীতি, আনন্দাশ্রু, পুলক, দেহাবেশ, অপরদিকে দৈবী ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ : অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িতা। ইচ্ছা করিলে সাধক এই অবস্থায় ভূমণ্ডল করতল-গত করিতে পারেন : কীর্ত্তি ও সম্ভূতি তাঁহার অধীন হয়। এককথায় ঐশ্বরিক ভাবের বিকাশ সাধকের মধ্যে দেখা দেয়। সিদ্ধির এই অবস্থায় ঈশ্বর-ভূমিকায় অবস্থিতি হয় বলিয়া, সাধকের হৃদয়ে চিৎ-শক্তির উন্মেষ হয়।

দিব্যভাবের সাধকের সিদ্ধি অনন্যসাধারণ ; তাঁহার সাধন-শক্তি আরও বিস্ময়কর। ভক্তিতে তাঁহার অবিচলিত প্রতিষ্ঠা তো থাকেই, উপরন্তু ভক্তির দিব্যভাবগুলি একসঙ্গে তাঁহার মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয় : সে এক সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব! পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্পের একত্র প্রকাশ। অণিমা-লঘিমাদি শক্তির ঐশ্বর্য্য তিনি সংযত করেন—ক্রমে এক দিব্য শান্তভাবের প্রকাশ হইতে থাকে। মুহুর্মুহু সমাধি, মুহুর্মুহু আত্মহারা ভাব। ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে ; জ্যোতিঃর প্রকাশে মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়া উঠে : জীবন দিব্যছন্দে পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থাতেই জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া সাধক ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখেন, তখন সমগ্র ভুবন ব্রহ্মময়ী হইয়া যায়, সাধক নিজেকে আর উপাস্যা হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না : তিনিও ব্রহ্মমগ্ন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী ; পরম শান্ত, নিষ্কল, নিরুপাধি। তখন তিনি নির্দ্বন্দ্ব, শুদ্ধচিত্ত, পরমহংস।

শাক্তপদাবলীর 'সাধন-শক্তি' অধ্যায়ে, শক্তি-সম্পাতে যে সুদৃঢ় ভক্তি, যে অপ্রমেয় নির্ভরতা ও যে দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাদের বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'ভাক্তর ভেলায়' আরূঢ় থাকায় সাধক আর তরঙ্গাভিঘাতে কাতর নহেন, চঞ্চল নহেন। তিনি নির্ভয়। অধ্যাত্ম শক্তিতে তিনি বলীয়ান। দিব্যশক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই মায়া-শক্তির ভ্রূকুটিভঙ্গ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত। তাই প্রদীপকণ্ঠে তিনি বলেন,

আমি কি আটাশে ছেলে!
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে!

মাতৃ-চরণে তাঁহার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। তিনি 'সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ'। এই একতানতা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি কাহারও নাই :

প্রসাদ বলে হৃৎকমলে বেঁধেছি তোমারে।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে॥

মাতৃ-ভক্তির একতানতা থাকে বলিয়াই, সাধক সাংসারিক কোন দুঃখেই বিচলিত হন না। সুখ-দুঃখ তাঁহার নিকট সমান, মনের আগুনও নির্ব্বাপিত। বিষয়াসক্তি নয়, মাতৃভাবাসক্তিতে তিনি তন্ময়। তাই বিষয়-মধু তাঁহার নিকট তুচ্ছ:

বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উল্‌বো না গো!
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলবো না গো! (রামপ্রসাদ)

মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক কেবল ইষ্টের শক্তিই লাভ করেন না, তখন ইষ্টকে বশীভূত করার ক্ষমতাও তাঁহার জন্মে: প্রথমতঃ যে শক্তির নিকট সাধকের মিনতি, আত্মনিবেদন—শেষ পর্য্যন্ত সেই শক্তিই তাঁহার বশীভূত। তাই নির্ভয়ে তখন সাধক নিজের মায়ের সহিত 'সাধন-সমরে' অবতীর্ণ হন: তখন 'মায়ে-পোয়ে দ্বন্দ্ব', 'মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা', মা ও সন্তানের যুদ্ধ। সন্তানের আছে জ্ঞানের ধনু, ভক্তির ব্রহ্মবাণ, তাই অবশ্যম্ভাবী জয়ের প্রত্যাশায় তিনি বলেন,—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী
এইবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে
জিন্‌বো তোমারে। (রসিকচন্দ্র রায়)

সাধন-শক্তির চরম প্রকাশ জ্ঞান-প্রতিষ্ঠায়, বিবেক-খ্যাতিতে। তখন সাধক নিজেই বিরাট-স্বরূপে অধিষ্ঠিত: জ্ঞান-বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করে, এমন কেহই আর অবশিষ্ট থাকে না। সব ব্রহ্মময়। ইহা লয়-মুক্তির অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক বলেন, 'এবার কালী তোমায় খাব':

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব॥
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখাব। (রামপ্রসাদ)

ইহা চরম মুক্তির কথা, সাধকের স্ব-স্বরূপতায় লীন হইবার ইঙ্গিত। শক্তি-সাধনার ইহা শেষ অবস্থা হইলেও, যেহেতু শাক্তপদাবলীতে সন্তান ও মাতৃভাবরূপ দ্বৈতভাবের প্রাধান্য, তাই শেষ পর্য্যন্ত সাধক এ লয়-মুক্তির প্রত্যাশী হন নাই: তাঁহারা বলিয়াছেন, 'নির্ব্বাণে কি ফল বল না!' তাঁহাদের শেষ আকাঙ্ক্ষা,—

খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব॥ (রামপ্রসাদ)

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য

॥ এক ॥

ধর্ম্ম ও কাব্য

ঐশী উপলব্ধি মানব-জীবনের এক মহত্তম উপলব্ধি। যুগযুগান্ত ধরিয়া ইহা মানুষের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। বিরাট বিশ্বলীলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে, ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে, আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে। হৃদয় দিয়া তাহারা অনুভব করিয়াছে, এই বিরাট সৃষ্টি খামখেয়ালী নয়, সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন হইয়াই সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য। এই সৃষ্টির পশ্চাতে এক অলক্ষ্য মহাশক্তি ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছেন: ঋতুরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে, মহাম্বুধির তরঙ্গ-আন্দোলনে গগনের মেঘাঞ্জন নীলিমায়, কর্ম্মব্যস্ত প্রাণি-জীবনে সেই দুর্জ্ঞেয়, অদৃশ্য মহাশক্তির লীলা। তাঁহারই ইঙ্গিতে সূর্য্য কিরণ দিতেছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, মেঘ জলদান করিতেছে, অরণ্য বৃক্ষ-গুল্ম শ্যামশোভায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে:

> যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
> বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

তিনিই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে সূর্য্যে-সোমে, পর্ব্বতে-পয়োধিতে, জড়ে ও জীবনে লীলা করিতেছেন। এই মহাশক্তি একদিকে ভীষণ, ভয়ঙ্কর, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্', 'ভীষণং ভীষণানাং', অন্যদিকে 'আনন্দরূপমমৃতম্', 'মধুরং মধুরাণাম্'। সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে এই অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয় শক্তির স্বীকৃতিই জীবের আস্তিক্য বুদ্ধি।

জগতের অগণিত সাধক দুশ্চর তপস্যার পথে অগ্রসর হইয়া এই রহস্যময় শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সেই অনুভূতির প্রকাশ। এই অনুভূতিকে নিছক কপোল-কল্পনা বলা চলে না। যাহা হৃদয়ের অমৃত-রসায়ন, যাহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের প্রাণান্তকর প্রয়াস, যাহাতে এত শান্তি, এত আনন্দ, এত পরিতৃপ্তি, তাহাকে মিথ্যা বলা যায় কেমন করিয়া? যাঁহার জন্য মানুষের নয়ন মুহুর্মুহু অশ্রুসজল হইয়া উঠে, সুতীব্র পুলক-বেদনায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়—যাঁহাকে পাইয়া চিত্ত-ভ্রমর কমলমধু-পানোচিত তন্ময়তা লাভ করে, তাহা মিথ্যা নয়। এমনকি

আকুল-করা ক্রন্দন, এমন প্রগাঢ় ব্যাকুলতা, এমন সুগভীর চাওয়া-পাওয়ার কামনা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতেও মিথ্যা হইয়া পড়ে মানবীয় কামনা-বাসনা, মানুষের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার পুলক। জীবের জন্য জীবের আকর্ষণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অধিকতর সত্য মহাপ্রাণের জন্য প্রাণের আকর্ষণ। বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের আনন্দ, সুন্দরের সুন্দর, অখণ্ড মহাপ্রাণের জন্য মানুষের অভিলাষ, তাঁহাকে বুঝিবার প্রিয় চেষ্টা এবং তাঁহার উপলব্ধিই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু বলিয়াই ইহা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম বিষয়। প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মবোধ হইতেই সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছে। সংশয় যখন প্রশ্ন তুলিয়াছে, তখনও সেই সংশয়কে দূর করিবার জন্য ('Justify the ways of God to men) ধর্ম্ম-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সত্য, শিব ও সুন্দরকে অনুভব করিয়াই মানুষ ক্ষান্ত হয় নাই, সেই অনুভূতিকে কাব্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। বেদের কবিত্বময় সূক্ত, 'ব্রাহ্মণে'র আখ্যান, পুরাণের কাহিনী, অসংখ্য স্তোত্র, বাইবেলের Psalms ও সোলোমন-গীতি, সুফী সাধকের রুবাইয়াৎ বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি ধর্ম্ম-সাহিত্য হইলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহার কারণ, এগুলি আত্মিক কামনার সুন্দর বাণীরূপ। আর্ট সৌন্দর্য্য প্রকাশের বাহন বটে তাহা আবার আত্মার অনুভূতি প্রকাশেরও বাহন: "Art for Art's sake certainly—Art as a perfect form and discovery of Beauty, but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and the expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of beauty" (Sree Aurobindo on '*Art for Art's sake*')

রস-সৃষ্টি করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কাব্যরচনার অন্যতম লক্ষ্য। রসসৃষ্টির উপকরণরূপে 'ধর্ম্ম' বস্তুটিকে অনেকেই নীরস বলিয়া মনে করেন। তাহার কারণও যে না আছে, তাহা নয়। তবে ধর্ম্মকে সব সময় যতটা নীরস বলিয়া গণনা করা হয়, ততটা নীরস মনে করিবার হেতু নাই। ধর্ম্ম আচরণরূপে যাহাকে জ্ঞানের বিষয় করা হয়, যাঁহাকে যোগমার্গে অনুভব করিবার চেষ্টা করা হয় অথবা যাঁহাকে ভক্তির ডোরে বাঁধা হয়, তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মই হউন, ঈশ্বরই হউন বা লোক সম্পর্কে প্রেমিক বা জননীই হউন—সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার রস-সত্তা অম্লান। তাঁহার সাধনও শুষ্ক জ্ঞান মাত্র নয়, নীরস যোগ-যাগ নয়, কেবল আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চ্চনা নয়, বিশেষ করিয়া রাসেশ্বর বা রসেশ্বরীর সাধনা ভাবাশ্রয়ী ও রসাশ্রয়ী। অতএব সাধ্য ও সাধন উভয়ই যখন রস-কেন্দ্রিক, তখন তদ্বিষয়ক কাব্যও

স্বাভাবিক ভাবেই রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিবার দাবী রাখে। 'অখিল রসামৃতসিন্ধু'ই ধর্ম্মমূলক কাব্যে রসবিন্দুরূপে প্রকাশিত হন। এই জন্যই ধর্ম্মমূলক রচনা নিছক ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া থাকে না, কাব্যে রূপান্তরিত হয়।

কাব্যবিচারের মাপকাঠি 'জীবন'

কাব্যোৎকর্ষ বিচারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর 'জীবন'। জীবনের বহুবিচিত্র প্রকাশই সাহিত্য। যে সাহিত্য জীবনরসে পরিপূর্ণ, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য: 'We care for literature primarily on account of its deep and lasting human significance. A great book grows directly out of life; in reading it we are brought into large, close and fresh relations with life and in that fact lies the final explanation of its power' (Hudson)—এই দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে বিচার করিতে গিয়াও, অনেকে ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থকে কাব্যের বিষয়ীভূত করিতে দ্বিধাবোধ করেন। বিশেষ করিয়া ইউরোপে ধর্ম্ম জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, ইহা সেখানে রবিবারের আচরণীয় অনুষ্ঠান মাত্র। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের বিচারে ধর্ম্মমূলক গ্রন্থাদির কাব্যমূল্য সংশয়িত। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম সম্পর্কে এ অভিযোগ কোনক্রমেই খাটে না। এখানে ধর্ম্মবোধ জীবনের সহিত ওতপ্রোত, জীবন ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। ভারতীয় সাধক জীবনকে পরিহার করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের লেখনীতে 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ'-এর প্রকাশও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের মহাসৌভাগ্য যে, এ দেশের অধিকাংশ সাধক জীবন-দ্রষ্টা কবি। কবি অর্থেই এদেশে ঋষি শব্দ রূঢ়। বৈদিক ঋষি কবি, তাই বৈদিক সূক্ত কবিত্বময়; উপনিষদের ঋষি কবি, তাই ব্রহ্ম তাঁহাদের দৃষ্টিতে আনন্দস্বরূপ। তাঁহারা বলেন, আনন্দ হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', —এই আনন্দদ্বারাই জগৎ বাঁচে, এই আনন্দেই জগৎ লীন হয়। তাই তাঁহাদের নিকট 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু', 'সর্ব্বাশ্চ মধুমতী'। এই জন্যই উপনিষদের ঋষিগণ সকাম হইয়া, শ্রীকাম হইয়া এই জগতে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'জীবেম শরদঃ শতম্'।

তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে জীবন

তান্ত্রিক সাধকগণও এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জীব ও জগৎকে সন্দর্শন করিয়াছেন। আনন্দময়ী মা নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাজার সাজাইয়া রাখিয়াছেন, জীবনে সেই আনন্দময়ীরই লীলা। শক্তি-সাধনার বীজমন্ত্রগুলি একাক্ষরী ধ্বনি হইলেও, প্রত্যেকটী মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই নিহিত,—মায়েরই সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এই বিশ্ব পরিপ্লাবিত।

'হ্রীং' বীজমন্ত্রটির মধ্যে হ, র, ঈ, ँ (বিন্দু) এই চারিটি বর্ণ আছে। তান্ত্রিক বীজ নির্ঘণ্টুর মতে 'হ' আকাশের প্রতীক, 'র' বহ্নিবীজস্বরূপা স্থবর্ণাদিযুক্ত ভূমণ্ডলের প্রতীক, 'ঈ' অনন্তরূপ পাতালের প্রতীক, আর ँ (বিন্দু) অমৃতের প্রতীক। 'হ্রীং' বীজমন্ত্রের দেবতা 'ভুবনেশ্বরী'—তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের অধীশ্বরী, কেবল অধীশ্বরী নহেন, তাঁহারই অমৃতধারায় ত্রিভুবন পরিপ্লাবিত। 'হ্রীং' মন্ত্রের মনন এই মহাভাবের মনন, এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ উপলব্ধিই মন্ত্র-চৈতন্য, চিন্তায় ও কর্ম্মে এই মহাভাবের প্রতিফলনই সিদ্ধি। যাঁহারা এ মন্ত্রে সিদ্ধ হন, জীব ও জগৎকে তাঁহারা মহাশক্তি হইতে ভিন্ন মনে করেন না, তাঁহারাই এই সত্য উপলব্ধি করেন, জগতে ও জীবনে সেই শক্তিরূপা 'পরমানন্দময়ী', 'রসেশ্বরী'র লীলা চলিতেছে।

তন্ত্র-সাধনা রিক্ত বৈরাগ্যের সাধনাও নয়, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও জ্ঞান সাধকের প্রার্থনীয়। শক্তির আবির্ভাবে জীবদেহে অবশ্যই ইহাদের আবির্ভাব ঘটে। সাধকদের মধ্যে কেহ হন কর্ম্মী, কেহ হন অমিত শক্তিধর, কেহ হন জ্ঞানী। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের ঘোর রূপের উপাসক—তিনি কর্ম্মী সাধক। পরমহংসদেব জ্ঞানী। তাঁহার জ্ঞান জগৎ-কল্যাণে নিয়োজিত। তান্ত্রিক সাধকের চিত্ত ধ্যানানন্দে বিভোর, প্রজ্ঞালোকে সমুদ্ভাসিত, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সকল সামাজিক সমস্যা, দুঃখ ও প্রশ্নের উপর নিপতিত। ইহাই তন্ত্র-সাধনার বিশিষ্টতা। তান্ত্রিক সাধক জীবন-সাধক যোগী, তিনি গীতোক্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং কবি।

তান্ত্রিক সাধকগণ তাঁহাদের উপাস্যা কুণ্ডলিনীর শ্রবণ-মধুর ধ্বনিকে ছন্দোবদ্ধ চারু কাব্যাদির মূল উৎস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই দেবী নানা ছন্দে সুচারু কাব্য রচনা করিয়া, অব্যক্ত মধুর শব্দ তুলিয়া মূলাধারে বিরাজ করেন :

কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধ-রচনাভেদাতি ভেদক্রমৈঃ। (ষট্‌চক্রনিরূপণ)

তান্ত্রিক সাধকমাত্রই কবি

শক্তির উপাসক সাধকও স্বাভাবিক ভাবেই কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। পূর্ণানন্দ স্বামীর 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে, দেহস্থ ষট্‌চক্রের যে-কোন চক্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তির উপাসকমাত্রই 'বাচামিশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি'। আধার-কমলস্থিত শক্তির সাধক—'বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে', স্বাধিষ্ঠান পদ্মের শক্তির উপাসক, 'গদ্যৈঃপদ্যৈঃপ্রবন্ধৈর্বিরচযতি', মণিপুর চক্রের সাধকের সম্পর্কে বলা হইয়াছে 'বাণী তস্যাননাব্জে বিলসতি', অনাহত পদ্মের উপাসক, 'গদ্যৈপদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যাম্বুধারাবহঃ', বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যানী সাধক, 'কবি বাগ্মী জ্ঞানী চ ভবতি', আজ্ঞা চক্রে প্রমুদিত-মনা সাধক, 'সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা', —বাক্‌সিদ্ধি তাঁহার করতলগত। যে-কোন ভাবে শক্তি-সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল সুদুর্লভ কবিত্বশক্তি।

এইভাবে তন্ত্রের ধর্ম্ম ও উপাসনা, সাধককে জীবন-দ্রষ্টা কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। নিবৃত্তির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেও, প্রত্যেক সাধক জাগতিক দুঃখ ও আনন্দের প্রত্যন্ত সীমা সন্দর্শন করেন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে সম্ভোগের সুখ ও মুক্তির আনন্দ সমান সুরে বাজে। এ দেশের ধর্ম্মমূলক নীতিশ্লোকগুলি পর্য্যন্ত বহুপরীক্ষিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা ও দেবদেবীর স্তোত্রাবলী জীবনবাদের ভিত্তিতে রচিত। তাই ইহাদের কাব্যমূল্য উপেক্ষণীয় নয়। তন্ত্রশাস্ত্ররূপ ধর্ম্মগ্রন্থও জীবন-সাধক কবির রচনা, এই জন্যই এগুলি তথাকথিত তত্ত্বের কর্কশ উক্তি মাত্র নয়, বহু বিচিত্র জীবনের মধুমত্তমা কবি-বাণী। তন্ত্রের ধ্যান, স্তবস্তুতি, কুণ্ডলিনী-শক্তি ও শিবপুরীর বর্ণনা, অভিষেক ও অন্তর্যাগের মন্ত্র চমৎকার কবিত্বপূর্ণ।

শাক্তপদাবলী শক্তিসাধনা ও শক্তি-তত্ত্বের সঙ্গীত-মূর্ত্তি হইলেও কাব্য হিসাবে ইহাদের মূল্যও অবজ্ঞেয় নয়। ধর্ম্মকথার আবরণে মানবজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ আশা-কামনা, অভিজ্ঞতার কথায় এগুলি পরিপূর্ণ। ধর্ম্মের পথে পরিক্রমণ করিতে করিতেও সাধক কবি যে বস্তুনিষ্ঠা, যে মর্ত্ত্যপ্রীতির চিহ্ন এই গীতাবলীতে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতির পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

শাক্তপদাবলীর ত্রুটি

শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য-বিচারে কতকগুলি ত্রুটি অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয় ও প্রকাশভঙ্গী এই দুই লইয়াই রচনা। রচনার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ প্রধানতঃ নির্ভর করে মনোহর বিষয়ের ভঙ্গিমাময় প্রকাশে। শ্যামাসঙ্গীতের বিষয়বস্তু ধর্ম্মতত্ত্ব, বিশেষ করিয়া দুরূহ সাধনার তত্ত্ব; ইহা কাহাকেও আকর্ষণ করে, কাহাকেও করে না। শক্তির তত্ত্ব কি, তাঁহার প্রকৃতি কি, তাহাকে উপাসনা করিবার পদ্ধতি কি,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ব্যতীত তাহা জানিবার মাথাব্যথা কাহারও নাই। অর্থার্থী অর্থকামী হইয়া শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদের আকর্ষণ অন্যদিকে। শিল্প-রসিক কাব্যামোদীর নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব গুরুত্বহীন, কারণ সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে জ্ঞানের বিষয় গৌণ, ভাবের বিষয়েরই প্রাধান্য। ভাবের বিষয়েরও আবার ইতরবিশেষ আছে, উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। ভক্তির উপরঙ্গে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কাব্য রসিক তাহাকেও 'এহো বাহ্য' বলেন। শাক্তপদাবলীর আস্বাদ্যরস ভক্তিরস, শক্তি-সাধকের প্রার্থনীয় শ্মশানচারিণী, ভয়ঙ্করী ভৈরবীর করুণা, তাঁহাদের—'আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনীদিনে, কালীনামামৃতপীযূষপানে'। কাব্য-বিচারের কষ-পাথরে কোনটাই তেমন উজ্জ্বল রেখাপাত করে না।

ভাব-প্রকাশের দিক হইতেও শাক্ত পদকর্ত্তাগণ সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের পরিচয় প্রদান করেন নাই। শাক্ত সঙ্গীতে পল্লবিত বাক্যের প্রয়োগ নাই, 'রসনারোচন রুচির পদ'-এর বিন্যাস নাই, 'শ্রবণ-বিলাস' ছন্দ-স্পন্দনেও পদগুলি স্পন্দিত নয়। যে ভাষা ও ছন্দ সামান্য কথার মধ্যেও অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিবে, যাহা মানুষের জীর্ণ বাক্যকে—

> 'অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজসম
> উদ্দাম সুন্দর গতি—' (ভাষা ও ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ)

—তাহারও আশ্বাস শাক্তপদে নাই।

\/ সাধক কবিগণ সাধন-রহস্যকে প্রকাশ করিতে গিয়া শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বক্তব্যকে সরস করিতে গিয়া অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলঙ্কার-সজ্জায় বাণীকে সজ্জিত করিয়াছেন। অলঙ্কার-প্রয়োগের এই বাহুল্য যে-কোন সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই অলঙ্কার-প্রয়োগে সূক্ষ্ম রুচি বা সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় কোথায়? কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার গূঢ়তর সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত প্রদান করে, ভাষা-দেহকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত

করিয়া অনির্ব্বাচ্য ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এইজন্যই আলঙ্কারিকেরা বলেন, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' (বামন)। কিন্তু অলঙ্কার যদি তৎপরিবর্ত্তে কাব্য-দেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, তাহা হইলে অলঙ্কার-প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। অলঙ্কারের বহ্বাড়ম্বর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, ঔচিত্যবোধের অভাব ব্যঞ্জনার অবরোধক। শাক্ত গীতাবলীর বহু পদে অলঙ্কার সৌন্দর্য্যের সূচক না হইয়া গুরুভারে পরিণত হইয়াছে, কাব্য-দেহের প্রসাধক অঙ্গদ-বলয় যেন বন্ধন-শৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিলেই এ বিষয় স্পষ্টতর হইবে। যেমন,

(১) হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী।
মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণকারিণী॥ (অনুপ্রাস)

(২) ঘরে এলে চণ্ডী, শুন্‌বো আমরা চণ্ডী। (যমক)

(৩) মন সেতারে বাজা রে তার, তারা তারা বলে
কাল বন্ধন করিতে তোরে আসে বজ্জু নিয়ে করে॥ (রূপক)

—শাক্ত সঙ্গীতে এইরূপ অসার্থক অলঙ্কার-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বোপরি শাক্ত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে যে একটানা একঘেয়েমি আছে, তাহা আরও বিরক্তিকর। ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত একই ভাবের অসংখ্য পদ শাক্তপদাবলীতে পাওয়া যায়, এমন কি একই কবি একই ভাবের পদ-রচনা করিয়া চলিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। ভাবের বহু বিচিত্রতায় শাক্তপদাবলী বহুবিচিত্র হইয়া উঠে নাই, বরং বৈচিত্র্যের অভাবে তাহা অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছে। একই ভাবের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কান ও মন উভয়ই পরিশ্রান্ত হয়। কি জননীর ব্যাকুলতার চিত্রাঙ্কনে, কি ভক্তের আকৃতি বর্ণনে, কি জীবের বদ্ধাবস্থার দুর্গতি চিত্রণে, কি মায়ের রূপ ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—'extraordinary monotony' যে-কোন পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলির আলোচনা করিতে গিয়া অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতের কতিপয় দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন: 'কেবল উপমা, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুর্য্য এবং তত্ত্বের কচকচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে যে, আপাদমস্তক গহনামণ্ডিত দেহের মত, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য্য যে কেমন, তাহা বুঝিবার জো নাই।' (কাব্যপরিক্রমা)

শাক্ত সঙ্গীতাবলীর মধ্যেও প্রতিবাদী সমালোচক অনুরূপ দোষ-ত্রুটির সন্ধান পাইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাক্তপদাবলী কাব্যগুণ-বিরহিত নয়। সুধী সমালোচক ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত শাক্তপদাবলীর রস-বিচার করিয়া

দেখাইয়াছেন, শাক্ত গীতাবলীতে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্তরসের আস্বাদন লাভ করা যায়। 'শাক্ত সাধনার মূলে বিচিত্র তন্ত্রাচার ও যোগাচার থাকিলেও শাক্তপদাবলী যেন পঙ্ক ও সলিলের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা। যে দেখে, সে-ই মুগ্ধ হয়।' (কাব্যালোক)

এই উক্তিটি সমর্থন করিয়া লইয়াই অপর কয়েকটি দিক হইতে আমরা শাক্ত গীতাবলীর কাব্য-মূল্য-নিরূপণে ব্রতী হইতেছি।

॥ দুই ॥

শাক্ত সঙ্গীত জীবন-রসাশ্রয়ী কাব্য

যে-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দেহ ও জীবনাশ্রিত তাহাই শাক্তপদাবলীর উপজীব্য, এইজন্য শাক্তপদাবলী ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রধান হইলেও জীবন রসাশ্রয়ী কাব্য। শক্তির সাধক ভুক্তিও চাহিয়াছেন, মুক্তিও চাহিয়াছেন, তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী 'ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী'। শাক্তপদাবলীতে অবশ্য ভুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই, মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রবল, সাধক এখানে শ্রীকাম নহেন, মেধাকাম, বিশেষ করিয়া মাতৃরূপাই তাঁহাদের কাম্য। 'ঐহিকসুখে' তাঁহাদের বিতৃষ্ণা। কিন্তু তাই বলিয়া জগৎকে তাঁহারা পরিহার করেন নাই জগতের নিষ্পেষিত জনগণের প্রতি তাঁহাদের অসীম মমত্ব-বোধ। পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অভিজ্ঞতা, লোক-লৌকিকতা-জ্ঞান, সমাজ চেতনা—সবই তাঁহাদের আছে। লোক-জীবনের ক্রীড়া-কৌতুক, সমাজ-জীবনের উৎসব কলাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাশাখেলা, গ্রাবু খেলা, ঘুড়িওড়ানো, শিকারধরা—সব বিষয়েই শক্তির সাধক ও ভক্ত অভিজ্ঞ, এমন কি 'ভানুমতীর ভেল্কি,' 'কলুর বলদে'র ঘানিটানাও তাঁহারা দেখিয়াছেন। এইদিক হইতে শাক্তপদাবলীকে বহু বিচিত্র জীবনের চিত্রশালা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

পারিবারিক চিত্র

শাক্ত সঙ্গীতগুলিতে পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের রাগিণী বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। পিতার সংযত স্নেহ, মায়ের জন্য কন্যা-সন্তানের ব্যাকুলতা, স্বামী-প্রীতি, সর্ব্বোপরি স্নেহ-সর্ব্বস্ব মাতার বাৎসল্য—'আগমনী ও বিজয়া'র পদগুলিকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়াই কবিগণ মানব-

চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যেও শাক্ত সঙ্গীতাবলী অপূর্ব্ব। 'আগমনী ও বিজয়া'র পদাবলী লোক-জ্ঞানের ভাণ্ডার। স্বামীগৃহ-গতা কন্যার তত্ত্ব কি ভাবে করিতে হয়, জামাই ও মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের প্রতি কিরূপ লোক-লৌকিকতা করিতে হয়, মেয়ের তত্ত্ব না করিলে প্রতিবাসীরাই বা কি বলে, স্বামী কাছে না থাকিলে পিতৃগৃহে আসিয়াও কন্যার মনোভাব কিরূপ হয়—এইরূপ বহু তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সংবাদে শাক্তপদাবলী পরিপূর্ণ।

'আগমনী ও বিজয়া'র গানগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্যান্য শাক্ত সঙ্গীতেও জীবন-চিত্র দুর্লভ নয়। 'ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ে মায়ের প্রতি সন্তানের মনোভাবের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লৌকিকভাবে পরিপূর্ণ। স্নেহ আদায়ের ছলে সন্তানের অনুযোগ, অভিমান, ক্রোধ, সংশয়, একান্ত নির্ভরতা অতিশয় বাস্তব। সন্তান-চিত্র এখানে জীবন্ত। মায়ে-পোয়ে এমন স্নেহের লুকোচুরি, এমন মনের কথা বলাবলি, এমন মান-অভিমান, হাসি-কান্নার অভিনয় যেমন অকৃত্রিম, তেমনই রসপূর্ণ। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, 'Petty needs of childhood are no less related to the world-heart than the passion by which Othello slays Desdemona'[১]: বস্তুতঃ জীবনের বিচিত্র, সজীব ভাবরাজীর স্পর্শলাভ করিয়াই অলৌকিক ভক্তিরসাত্মক শাক্তগীতি লৌকিক ভাবাশ্রয়ী কাব্যের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'মনোদীক্ষা' অধ্যায়ের পদাবলী প্রবৃত্তিমুখী মানব-মনের বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব। 'সাধের ঘুমে ঘুমন্ত জীব' কোলে কামনা-কান্তা, গায়ে আশার চাদর; তাহার লোভ বিষয়-ভোগে, 'দিবানিশি ভাবছে বসি কোথায় পাবে টাকার তোড়া'। জীবের অবলম্বন 'সাতগেঁয়ে আর মামদোবাজী,' সে 'সেয়ানপাগল বুচকি আগল'। চমৎকার মানবচিত্র। শাক্তগীতির পাত্র মানব-জীবন-রসে উচ্ছল।

নিপীড়িত মানবের চিত্র

বিশেষ করিয়া মাতৃ-সাধক কবিগণ দুঃখ-ক্লান্ত, নিষ্পেষিত জন-জীবনের যে মর্ম্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তপদাবলী চিরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। অষ্টাদশ শতকের নির্ব্বিচার অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে বাঙলা দেশের নিপীড়িত জনসাধারণের যে ছবি শাক্ত কবিরা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা

১। Kali the Mother—Sister Nivedita

কোন দেশ-কাল-বাধিত জীবনের ছবি নয়, চিরকালের নির্য্যাতিত, অপাংক্তেয় গণ-জীবনের ছবি। মায়ের সাধক সন্তান যোগারূঢ় হইয়া সাধন করিতে করিতে উদার ও করুণাঘন নয়ন মেলিয়া এই জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; নির্ম্মম ব্যাধের শরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে আদি কবি বাল্মীকির হৃদয়-বেদনা যেমন অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোকমূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, জন-দরদী মাতৃসাধকের বেদনাবিদ্ধ অন্তরের বাণীও তেমনই ঝর্ঝর সঙ্গীতে ছন্দোমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহারা দুঃখজয়ের অভিযানে ব্রতী হইয়াছিলেন। জগৎ-পলাতকার মনোবৃত্তি নয়, জগৎ-প্রেমিকের মনোভাব থাকার জন্যই শাক্ত কবির রচিত সঙ্গীত দুঃখক্লিষ্ট জীবনের চিত্রে ও তাহার করুণ সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চিরকালের পীড়িত মানুষের মূর্ত্তি শাক্তপদাবলীতে উজ্জ্বল রেখায় পরিস্ফুট। সে মানুষেরা গরীব, জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। প্যায়াদা আসিয়া তাহাদিগকে' মসিল দিয়া তসিল করে।' রাজস্ব তাহারা দিবে কোথা হইতে? তাহারা কায়ক্লেশে ক্ষেত চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে: সে শ্রমের ফসলও তদ্রূপ হয়, কাহারও বা জাগা ঘরেই চুরি হইয়া যায়। কেহ দিন-মজুরী খাটিয়া খায়: মজুরীর অর্থ তাহাদের ঘরে আসে না, কিছু চোর-ডাকাতে কাড়িয়া লয়, কিছু অত্যাচারী প্যায়াদায় আত্মসাৎ করে। কখনও বা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে, পাইক-জমিদার বিনা পারিশ্রমিকে জোর করিয়া তাহাদের দিয়া বেগার খাটাইয়া লয়। এই ভাবে সর্ব্বস্বান্ত যাহারা, তাহারা খাজনা দিবে কেমন করিয়া? তাই তাহাদের সম্পত্তি নিলামে উঠে, 'দুঃখের ডিগ্রাজারি'র আসামী বলিয়া যমদূতের মত প্যায়াদা নির্ম্মম ভাবে অত্যাচার করিতে করিতে তাহাদিগকে টানিয়া কাঠগড়ায় লইয়া হাজির করে। জমিদার তাহাদের বিপক্ষে; স্বপক্ষে উকিল নিযুক্ত করিবার মত অর্থ-সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তাই বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হয়, সরকারী উকিল জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিয়া এমন ভাবে 'সওয়ালবন্দী' করেন যে, বেচারা প্রজারই হার হয়। ফলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, প্রবঞ্চনার দায়ে আসামীকে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। বন্দীর দুর্দ্দশাও অবর্ণনীয়। তাহার হাতে শৃঙ্খল, পায়ে বেড়ি, প্রহরীর কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ।

শাক্তপদে নানামুখী মানবীয় ভাব যত অধিক বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কোন পদাবলীতে তাহা হয় নাই। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ চারিটি লৌকিক ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রেমভক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন: বাউল গানে লৌকিক ভাব

একটি,—মনের মানুষের প্রতি মানবোচিত প্রেম। শাক্তপদাবলী মানবজীবনের বহুবিচিত্র চিত্র, চরিত্র, আশা-কামনা, ভাব-কল্পনার রূপায়ণ ; এগুলি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জীবনের অমর আলেখ্য , তাই কাব্য-হিসাবে ইহাদের মূল্য অপরিসীম

শাক্তপদাবলীর ভাষা

শাক্ত পদের ভাষা-সম্পদও অমূল্য। ইহার ভাব যেমন জীবনাশ্রিত, ভাষাও তেমনই জীবনের মর্ম্মমূল হইতে সংগৃহীত। ইহা 'খাঁটি বাঙলা কথায় খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব।' বিদগ্ধ জনের বাণী-বিলাসে শাক্ত পদ বিলসিত নয়, ইহা তথাকথিত মূক মানুষের মনের কথায় মুখর। বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মৌখিক ভাষাই শাক্ত পদের ভাষা। সাধারণ বাঙালী অষ্টপ্রহর যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, যে ঢংয়ে অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র কথা মুখে বলে, জীবন-যাত্রার সেই অতি পরিচিত ভাষার উপকরণ দ্বারাই মাতৃপূজার অর্ঘ্য রচিত হইয়াছে। বাঙলা দেশেরই প্রবাদ-প্রবচন, সূক্তি-সুভাষিতাবলী, বিশেষার্থবোধক বাক্য ও বাগ্বিধির স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাভাবিক প্রয়োগে শাক্ত গীতি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। 'বাপ সোহাগে মায়ের আদর', 'বাপের ধনে বেটার স্বত্ব', 'বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা', 'সেয়ান পাগল বুঁচকি আগল' প্রভৃতি প্রবচন এবং 'বুঝ রে মন ঠারে-ঠোরে', 'টাটে বা ডুবায় পাছে', 'বসে থাক ঘাপটি মেরে' 'তরকারি বানায়ে খাব' প্রভৃতি উক্তি দ্বারা বাঙলা দেশের লোক-জীবনটিই যেন প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। বস্তুতঃ 'চোখের ঠুলি', 'কলুর বলদ,' 'ঝুলি-কাঁথা,' 'ভূতের বোঝা', 'দেঁতোর হাসি', 'আলোচাল আর বুটভিজানা'—এই সকল অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র কথা দিয়াও যে অধ্যাত্ম-জীবনের বিরাট, গূঢ় ভাব প্রকাশ করা সম্ভব—শাক্তপদাবলীই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। কাব্যমূল্য-বিচারে জীবনের ক্ষুদ্র অথচ সূক্ষ্ম সংবাদ, মনের সরল ভাব এবং মুখের সহজ কথার এই অভিব্যঞ্জনা অবশ্যই গণনার যোগ্য।

প্রার্থনা-সঙ্গীতরূপে শাক্ত-সঙ্গীতের মূল্য

ধর্ম্মাশ্রয়ী কাব্য-হিসাবেও সাহিত্যের আসরে শাক্ত সঙ্গীতগুলির একটি আসন আছে। ধর্ম্ম-বিষয় লইয়া সব দেশেই বিস্তর কাব্য রচিত হইয়াছে। ইউরোপে Bible-এর The Book of Psalms, Songs of Solomon', টমাস এ কেম্পিসের ধর্ম্মসঙ্গীত, ব্লেকের কবিতা ও ইয়েট্সের নাটক ধর্ম্মকাব্য-হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান সুফী সাধকের গীতাবলীও সুন্দর আধ্যাত্মিক কবিতা। শাক্ত সঙ্গীতে জীবনের বহু বিচিত্র সুর থাকিলেও এগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক কবিতা।

পারমার্থিক কবিতাবলীতে ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদনের দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি দেখা যায়। যে অলক্ষ্য শক্তি সর্ব্বভূতে গূঢ় থাকিয়া বিশ্ব পরিচালনা করেন, ভক্ত সাধক তাঁহাকে দুইটি বিশিষ্ট রূপে মনন করিয়া থাকেন, একটি ঐশ্বর্য্য-ঘন রূপ, আর একটি মাধুর্য্য-ঘন রূপ। এই রূপ-কল্পনার পার্থক্য অনুযায়ী, উপাসনা, স্তোত্র, ক্রিয়া পৃথক পৃথক হয়।

যেখানে ইষ্টদেবতা ঐশ্বর্য্যের প্রতীক, সেখানে স্তোত্র কবিতায় সর্ব্বশক্তিমান্ (Almighty), পরমদয়ালু ও করুণাময় (Merciful) ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। এই ধরনের স্তোত্র কবিতায় অতি হীন, পাপসম্ভব, পাপাত্মা মানবের গভীর অনুশোচনা ও আর্ত্তির মর্ম্মন্তুদ সুর ধ্বনিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে পরমকৃপাল, ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের উপরে একান্ত নির্ভরতার আবেদনটিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। স্তোত্রগুলি উচ্চারিত হইবামাত্রই হৃদয়ে এক প্রকার ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়। একদিকে অনন্ত শক্তি-ঘন ঐশ্বরিক শক্তির মহিমা, অন্যদিকে আকণ্ঠ পাপ-নিমজ্জিত মানবের আর্ত্ত অনুতাপ —ইহা যে-কোন মানুষের মনে পাপ-বোধ জাগ্রত করিয়া যুগপৎ ভীতি ও শরণাগতির ভাব উদ্বোধিত করে।

এই প্রকারের ধর্ম্মসঙ্গীত বড় বেশি নিয়মতান্ত্রিক। এ গুলিতে মৌলিকতা প্রকাশের সুযোগ কম। যে-কোন দেশের যে-কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলির ভাব, কথা ও ঢং প্রায় এক প্রকারের। বাইবেলের প্রার্থনা-সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা হইতে বৈদিক সূক্তাবলী, পুরাণের স্তবস্তুতি, তন্ত্রের কীলক-কবচ, বৈষ্ণব পদাবলীর আত্ম-নিবেদন, শাক্তপদাবলীর 'ভক্তের আকূতি'র ভাব ও ভাষা স্বতন্ত্র নয়। সর্ব্বত্রই তাঁহার মহত্ব, আমার হীনতা; তাঁহার শক্তি, আমার দীনতা; তাঁহার বরাভয়, আমার ভিক্ষা। স্তোত্র কবিতায় Psalms, বৈদিকসূক্ত, 'নারায়ণীস্তুতি,' বিদ্যাপতির 'আত্মনিবেদন,' নরোত্তমের 'প্রার্থনা,' রামপ্রসাদের 'মাতৃ-নির্ভরতা' একাকার, একাত্ম, একাশ্রয়।

(২) স্তুতি-মূলক কবিতার সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ আবেগ, ভক্তি-ব্যাকুলতা, একান্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। প্রার্থনা যদি অন্তরের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত হয়, ভক্তের প্রণতি ও আবেদন যদি ঐকান্তিকতায় পূর্ণ হয়, তাহা হইলেই স্তুতি-কবিতা চিত্তহারী হইয়া উঠে। ভাবের অকৃত্রিমতায় প্রকাশটিও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও কবিত্বপূর্ণ হয়: Creation to be beautiful must be rythmical,

easy and spontaneous. The more easily matter yields itself to the form, the more beautiful it is ;[১] এই জন্যই ধর্ম্মবিষয়ক হইলেও, হৃদয়ভাবের সহজ, স্বাভাবিক, সুরেলা প্রকাশকে সুন্দর ও রসোত্তীর্ণ না-বলিবার হেতু থাকে না।

শাক্তপদাবলীতে স্তোত্র-গীতির সংখ্যা নগণ্য নয়। 'ভক্তের আকুতি,' 'মনোদীক্ষা,' 'করুণাময়ী মা,' 'কালভয়হারিণী মা' অধ্যায়ের পদাবলীতে মৃত্যুভয়-কাতর, মোহমুগ্ধ মানবের অসহায় আর্ত্ত ক্রন্দন যে-কোন শ্রোতার অন্তরে গভীর কারুণ্যের সঞ্চার করে, নিঃশেষে মাতৃচরণে শরণাগতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। ভক্ত এখানে অসহায়, বিপন্ন, শক্তিহীন; তাঁহার মুখে কেবল 'কুরু করুণা কুরু মে করুণা,' 'ত্রাহি মাং, পাহি মাম্' রব। জগজ্জননী 'কল্পলতিকা,' 'আপদুদ্ধারিণী,' 'কালভয়বারিণী,' 'কলুষনাশিনী' —আর ভক্ত 'বিষের কৃমি,' 'কলুষ-পৈত্তিকে দগ্ধ,' মূঢ়, ত্রাসিত। এসব স্থলে শাক্তগীতি, অন্যান্য স্তোত্রগীতি হইতে পৃথক নয়। রস-বিচারে এই সকল পদকে সম্পূর্ণরূপে রসোত্তীর্ণ পদ বলা না গেলেও ভাবের অকৃত্রিমতায়, মনোভাবের অকুণ্ঠ, স্বাভাবিক প্রকাশ হিসাবে এগুলিকে একেবারে কবিত্বহীনও বলা সঙ্গত নয়: 'Its treatment of the facts of religious experience is not less appealing, but all the more artistic because, it is so sincere and genuine, because it awakens a deep sense of conviction.'[২] শাক্ত স্তোত্রগীতি শুদ্ধভক্তির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, হৃদয়ের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ এবং সতত জ্ঞান-প্রহরায় সংযত।

অন্যান্য স্তোত্রগীতির তুলনায় এগুলির স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। Bible-এর Psalms-এর প্রার্থনা-কবিতায় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রচণ্ড শক্তির প্রতি ভক্তের ভীতি আছে: The voice of the Lord is powerful ; the voice of the Lord is full of majesty' (Psalm 29) ; তাহাতে শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার জন্য আভিচারিক প্রার্থনা আছে: 'Destroy thou them, O God ; let them fall by their own counsels ; cast them out in the multitude of their transgressions' (Psalm 7) ; শাক্তপদাবলীতে এরূপ আতঙ্ক অথবা আভিচারিক প্রার্থনা নাই। জননীকে সর্ব্বশক্তির আধার জানিয়া একান্ত নির্ভরতার ভাবই শাক্তপদে বর্ত্তমান। মায়ের নিকট শক্তিপ্রার্থনার কথা আছে, কিন্তু এই শক্তি

১। Eastern Lights : 'Beautiful'—Dr. Mahendra Nath Sircar.
২। Bengali Lit. in the 19th Century—Dr. S. K. De.

দেহস্থ অন্তর-শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার জন্য। Bible-এর ভক্ত বহিঃশত্রুর অত্যাচারে ত্রস্ত, তাঁহারা মানুষ-শত্রুদ্বারা পীড়িত, এই শত্রুর নিপাত তাঁহাদের প্রার্থনীয়; সে স্থলে শাক্ত সাধকের প্রার্থনা :

দেহের ভেদী ছজন কুজন
এবা বাদী ভজন-পূজন কাজে।
জ্ঞান-আসতে তার কর ছেদন
নিবেদন চরণ-সরোজে ॥ (দাশরথি রায়)

উপরন্তু জগজ্জননীর অসীম শক্তির প্রতি আতঙ্কের ভাব শাক্তগীতিকায় নাই। শক্তির সাধক বীর, অকুতোভয়, মায়ের দেওয়া দুঃখ দেখিয়া মাতৃচরণে তাঁহারা শরণ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু দুঃখে তাঁহারা নির্ভয়: 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?'—ইহাই বীর সাধকের নির্ভীক উক্তি। কালীনামের ডঙ্কা বাজাইয়া তাঁহারা মৃত্যুর চোখ-রাঙানিকে তুচ্ছ করেন, শ্যামাকে 'সর্ব্বনাশী' বলিয়া গালি দেন, তাহাকে ব্যঙ্গ করেন, মায়ের সহিত 'সাধন সমরে' অবতীর্ণ হন শ্যামা মাকে কয়েদ করেন, এমন কি তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন বলিয়াও ভয় দেখান। ধর্ম্মমূলক গীতি কবিতায় এই বীরভাবটি শক্তি-সাধকের নিজস্ব। অমিত উৎসাহে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে বলিয়াই বীররসাত্মক কবিতারূপে ইহাদের মূল্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভাব-মাধুর্য্যের দিক হইতে শাক্ত পদাবলীর মূল্য

ধর্ম্মমূলক কবিতায় সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব সঞ্চারিত হয় বিশেষ করিয়া ইষ্টদেবতার মাধুর্য্য-ঘন রূপের স্বীকৃতিতে। যখন ভগবান বা ভগবতী অনন্ত মাধুরীর আধার রূপে কল্পিত হন, তখন প্রকাশের মধ্যে স্বতঃই কাব্যরস সৃষ্টি হয়। তখন ঈশ্বরের অনন্ত প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের কথা আর মনে থাকে না মনে হয়, তিনি আত্মার পরমাত্মীয়: 'অন্তরতর যদয়মাত্মা': তখন মনে হয়,—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'—তিনি রস-স্বরূপ, এই রস আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দিত হয়। তিনি যদি আনন্দময় না হইতেন, তাহা হইলে কে বাঁচিতে চাহিত, কে প্রাণ-ধারণের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত? 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ।'

✓ আনন্দময়কে আনন্দদ্বারা, প্রেমময়কে প্রেমদ্বারা, রসময়কে রসদ্বারা আস্বাদন করিতে হয়, মন দিয়া তাঁহাকে মনন করিতে হয়—'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'। তাই লৌকিক সম্পর্কের মধ্যে অরূপের রসময় রূপ-কল্পনা। সুফী সাধকের নিকট

তিনি রসের খনি 'সাকী', বৈষ্ণবের নিকট তিনি প্রভু, সখা, সন্তান, স্বামী; প্রেমিক খ্রীষ্টানের নিকট তিনি 'Bridegroom of the soul', বাউলের নিকট তিনি 'মনের মানুষ'। লৌকিক ভাবের আলম্বনহেতু ভক্তিরস এ সব স্থলে লোক-জীবনের ছন্দে, সুরে, রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে বলিয়াই এই সকল ধর্ম্মমূলক কবিতা কাব্যগুণে মণ্ডিত হইয়া উঠে। যেমন বৈষ্ণব কবিতায়, তেমনই Old Testament-এর Songs of Solomon-এ—ঈশ্বর স্বামী, ভক্ত যেন তাঁহার প্রিয়তমা প্রেমিকা: ভগবান প্রিয়তম, পুত্র হইতে, কন্যা হইতে: তিনি সুন্দর,—অপরূপ তাঁহার সাজ-সজ্জা, কপোলে দোলে মণিকুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণমালা: 'Behold thou art fair, my beloved, yea pleasant Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold' (Songs of Solomon), যেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়। ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে মদন মূরুছা পায়॥' (বৈষ্ণব পদাবলী)। এই প্রেমিকের রূপে ও গুণে প্রেমিকা মুগ্ধ, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর',—ইহারই জন্য প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, ইহাকে পাইয়া আনন্দ-তন্ময়তা, না পাইয়া হাহাশ্বাস: 'I sought him, but I found him not I called him, but he gave no answer' (Songs of Solomon),—এ ক্রন্দন, এ বেদনা বড় গভীর, বড় মর্ম্মান্তিক, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'-এর মত। এই প্রেমের ধনকে পাইয়া আবার কি গভীর তৃপ্তি। প্রেমিকা আর তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, তাহাকে অন্তরে ভরিয়া রাখিবে: 'He shall lie all night betwixt my breasts' (Songs of Solomon),—'বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব। হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেইখানে লয়্যা থোব॥' (চণ্ডীদাস)।

ইহাই মধুর ভাবের সাধনা, ইহার সাধ্য প্রেম, সাধনও প্রেম। লৌকিক প্রেমের যেমন পূর্ব্বরাগ, মান, মিলন, বিরহ—এ প্রেমেও তাহা বর্ত্তমান। সকল আকৃতি, সকল চেষ্টা মানবীয় ভাবে পূর্ণ। 'দেবতারে প্রিয় করি' বলিয়াই মাধুর্য্যভাবের ধর্ম্মমূলক গান, পদ—কাব্য হিসাবে অপূর্ব্ব হইয়া উঠে। তাই যেমন Songs of Solomon, তেমনই বৈষ্ণব পদাবলী, প্রেমের কাব্য-হিসাবে অতুলনীয়।

শাক্ত পদের ভাব: মাতৃমহাভাব ও সন্তানভাব

শাক্ত পদগুলির মধ্যেও মাধুর্য্য ভাবের কথা আছে। এখানে জগজ্জননী ভগবতী লৌকিক সন্তান বা মাতারূপে কল্পিত হইয়াছেন। শক্তি-সাধকের মাতৃ-সাধনা সন্তান বা জননীভাবে। ভগবতী কোথায়ও স্নেহের দুলালী কন্যা—কন্যাকুমারী,

কোথায়ও আবার স্নেহময়ী জননী, সন্তান-পালিকা। ভক্ত যথাক্রমে জননী বা সন্তান। সম্পর্কের এই তারতম্য হেতু এখানকার প্রধান রস বাৎসল্য এবং প্রতিবাৎসল্য। শাক্তপদাবলী বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসের দ্বিবেণী ধারায় অভিষিক্ত। শাক্তের সাধ্য ও সাধনরূপ দুরূহতত্ত্ব এই দুই ভাবের আলম্বনে রসোত্তীর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র পদাবলী বাৎসল্য রসের অনন্ত নির্ঝর। মা মেনকার হৃদয় উৎস হইতে এই রসধারা নির্গত হইয়াছে, ইহার অবলম্বন একখানি অকৃত্রিম, বাস্তব, স্নেহপরিপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়, তাই ইহা গভীর, নিত্যপ্রবাহী ও বেগবান। কন্যা-সন্তানের জন্য এমন সুতীব্র স্নেহ-ব্যাকুলতা ও মমত্ববোধ অন্যত্র দুর্লভ। মেনকার স্নেহপূর্ণ হৃদয়-সাগরে মাতৃভাবের অসংখ্য ঊর্ম্মিমালা: সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, শঙ্কা, বিষাদ, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মা আকুল, 'বলিতে সে বচন, না সরে বচন,' মেয়েকে কাছে পাইবার জন্য কি অসীম ব্যাকুলতা, 'ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ', মেয়ের আগমন-সংবাদে উন্মাদিনী মায়ের চিত্র, 'চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী', মেয়েকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া 'প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়।' বিজয়ার পদাবলীতে এই মাতৃচিত্র আরও করুণ। বিরহ-বেদনায় বাৎসল্য আরও উত্তাল। চেতন-অচেতন-বোধ নাই, নবমী রজনীর প্রতিই মায়ের কি সকরুণ মিনতি। দশমী-প্রভাতের মর্ম্মভেদী হাহাকার শ্রবণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

আগমনী ও বিজয়ার যেমন বাৎসল্য, অন্যান্য অধ্যায়ে তেমনই প্রতিবাৎসল্যের বিচিত্র, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। 'ভক্তের আকূতি'—সন্তানেরই আকূতি। মাকে উদ্দেশ্য করিয়া সন্তানের আবদার, অভিমান, অনুযোগ, কখনও মান, কখনও মিনতি, কখনও ক্রোধ, কখনও কৃপা-কামনা, কখনও ব্যঙ্গ, কখনও বিনতি, কখনও সংশয়, কখনও একান্ত নির্ভরতা। সর্ব্বোপরি সন্তানের আকুল করা 'মা, মা' ডাক, অন্যান্য সকল প্রিয় সম্বোধনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। মা-পাগল সন্তান। অনুযোগ-অভিযোগ অন্তে তাঁহার শেষ প্রার্থনা: 'ধুলা ঝেড়ে কোলে নে মা', 'যা ভাল হয় তাই করো মা, তোমার পদেই দিলাম ভার।'

শাক্ত সঙ্গীতের এই মানবীয় ভাব দুইটি ইহাদিগকে কাব্যগুণে বিভূষিত করিয়া তুলিয়াছে। Dr S. K. De শাক্ত পদকে বলিয়াছেন—Transfiguration of the primeval instinct of filial affection...into a poetic rapture'—কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যান্য পদাবলীর তুলনায় শাক্তপদাবলী অন্য একটি দিক হইতেও স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব পদে কেবলই মাধুর্য্য, শাক্তপদে অবিমিশ্র মাধুর্য্য নাই, জননীর

ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়া এখানে মাধুর্য্যের বিস্তার। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ মিশ্রণে শাক্ত কাব্য লৌকিক ও দিব্য রসের পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে: এখানে স্বর্গ আসিয়া যেন আমাদের কুঁড়েঘরের পাশে দাঁড়াইয়াছে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-নিষ্ঠার দিক হইতে শাক্তপদাবলী যেন কবি Wordsworth-এর Skylark-এর মত

'Type of the wise, who soar but never roam,
True to the kindred points of Heaven and Home'.

॥ তিন ॥

এই তো গেল শাক্তপদাবলীর অবলম্বনভূত বিষয়বস্তুর কথা, প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে শাক্ত সঙ্গীতের দুইটি কাব্যরূপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—(১) নাটকীয় রূপ, (২) গীতিকবিতার রূপ।

শাক্তপদাবলীর নাটকীয়তা

বৈষ্ণব গীতাবলী যেমন রসানুসারে পালার মত সাজানো, শাক্তপদাবলী তেমনভাবে সাজানো হয় না। পাত্র-পাত্রীর অবতারণায়, উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের বিন্যাসে বৈষ্ণব পদাবলীর নাটকীয় রূপটি অতি স্পষ্ট। শাক্তপদাবলীও নাট্য-গুণ-বঞ্চিত নয়। যাত্রাওয়ালা, পাঁচালিকার এবং গীতাভিনয়-প্রণেতাদের মধ্যে অনেকেই, আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিকে নাটকের মত সাজাইয়া অভিনয় করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ নিজে 'কালী-কীর্ত্তন' রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্য 'শাক্ত-পদাবলী'র আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিও পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করিয়া গেলে নাটকীয় রস উপভোগ করা যায়।

আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে একাধিক পাত্র-পাত্রী আছে,—উমা, সখী জয়া, মা মেনকা, পিতা গিরিরাজ, নারদ, প্রতিবাসী ও মহাদেব। জননী মেনকার চরিত্রে ও হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নাটকীয়তা বর্ত্তমান, তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তায়-সংশয়ে সংঘাতপূর্ণ। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করিয়াই লীলাপর্ব্বের নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। গিরিরাজের প্রতি মেনকার কাতর অনুযোগ ও বিনতি নাটকীয় সংলাপের আকারে গ্রথিত হইয়াছে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া মায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। 'বাল্য-লীলা'-বিষয়ক পালাটি যেন মূল নাটকের 'প্রস্তাবনা' অংশ, এখানে মাতৃস্নেহের উন্মেষ।

মূল পালা আরম্ভ হইয়াছে স্বামীগৃহগতা কন্যার জন্য জননীর দুশ্চিন্তা লইয়া, রাত্রির দুঃস্বপ্ন, নারদের মুখে-শোনা কৈলাসসংবাদ এবং প্রতিবাসীদের অনুযোগে মাতৃহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের গতি তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত মেনকার গঞ্জনা ও দুঃখকাতরতায় গিরিরাজ কৈলাসে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দ্বিতীয় দৃশ্য কৈলাসের দৃশ্য। এখানে হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম রেখা টানা হইয়াছে। স্বামী মহাদেবের নিকট উমা পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। মহাদেবের উত্তর কৌতুকরস মিশানো। লীলা-পর্ব্বের করুণরসাশ্রিত নাট্যরঙ্গে এই দৃশ্যটি যেন Dramatic relief এর কাজ করিয়াছে। তাহার পর আবার হিমপুরীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে: মা ও মেয়ের মিলন-দৃশ্য। এ দৃশ্যটি মিলনের কৌতূহলে, অসম্বৃত ব্যাকুলতায়, মান-অভিমানে, অশ্রু-হাসির উচ্ছ্বাসে প্রাণময়। ইহার পর বিজয়ার পালা: দুইটি দৃশ্য, একটি নবমী রজনীর দৃশ্য, অপরটি দশমী-প্রভাতের দৃশ্য। অন্যান্য পাত্র-পাত্রী উপস্থিত থাকিলেও মেনকাই একমাত্র প্রবক্তা তাহারই ক্রন্দনে উতরোলে, দৃশ্য দুইটি পরিপূর্ণ। ভাবী ও ভবন্ বিরহের আর্ত্তনাদে দিঙমণ্ডল পরি-পূরিত: হৃদয় বেদনার উদ্বোধক সর্ব্বনাশা নবমী-রজনী ও দশমীর প্রভাত, ইহার উপরে 'দ্বারে ডমরুধ্বনি', মহাকালের 'হুঙ্কার'—'বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারবার।' বুকভাঙা ক্রন্দন, মহাকালের গর্জ্জন ও বিষাণ নিনাদ—সব মিলিয়া বিজয়ার দৃশ্য দুইটি অতি করুণ: 'বিজয়া' যেন করুণরসে উচ্ছল বিয়োগান্ত নাটক।

নাটকীয় ভাব শাক্তপদাবলীর অন্যত্রও দুর্লভ নয়: 'ভক্তের আকৃতি', 'মনোদীক্ষা', 'সাধন শক্তি'র অংশগুলিও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ। শাক্তপদাবলীর এই অংশগুলিকে দ্বিতীয় এক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক' বলা চলে। এই নাটকের পাত্র বদ্ধ জীব, সূত্রধারিণী অলক্ষ্যচারিণী মহামায়া। জীবের লক্ষ্য মুক্তি, অভিলাষ মাতৃস্নেহ, কিন্তু সে লক্ষ্যের পথে অন্তরায় ইন্দ্রিয়াদির তাড়না, ষড়রিপুর প্ররোচনা। জীব এই বাধা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চায়,—ইহার ফল সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব Tragedy-র অন্তর্দ্বন্দ্বের মতই জটিল, গভীর ও কারুণ্যপূর্ণ। ঝটিকা-সঙ্কুল, উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুভিত সাগরে অসহায়, বিপন্ন জীব। কিছুটা অগ্রসর হইতেই প্রতিকূল সংঘাতে আবার সে পশ্চাৎপদ হয়। নিয়তির কঠিন জালে সে আবদ্ধ। সে জাল অকাট্য, অলঙ্ঘ্য। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আত্মারাম বিবেকের আবির্ভাব, তিনি মনকে নানাভাবে প্রবুদ্ধ করেন, হয় 'মনোদীক্ষা'। এই দীক্ষা জীবকে নব শক্তিতে বলীয়ান করিয়া তোলে, জীব-হৃদয়ে অমিত তেজের সঞ্চার হয়। গুরুর কঠিন বাণী-সংঘাতে জীবের সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যায়; তখন সে বীর, দিব্যভাবে সঞ্জীবিত। তখন কোন প্রকার

বাধাই আর তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে পারে না, আরম্ভ হয় 'সাধন-সমর'। এবার নিজ মায়ের সহিত সংগ্রামেও সে পরাঙ্মুখ নয় : সে বলে,—

আয় মা সাধন-সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে। (রসিক রায়)

জয় হয় জীবেরই। বিজয়ী বীরের মত তখন তাঁহার আনন্দ, উল্লাস, বলিষ্ঠ বিশ্বাস : 'এবার বাজি ভোর হোল' বলিয়া যে একদিন নৈরাশ্যজনক উক্তি করিয়াছিল, এখন তাঁহার কণ্ঠে বলিষ্ঠ বীরের বাণী : 'আমি সিদ্ধ সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে?'

শাক্তপদাবলীর এই পালাটিকে সার্থক High Tragi-Comedy বলা যায়। ইহা জীবনের বিবিধ জটিল সমস্যায় পূর্ণ, তাই High, ইহাতে প্রতিকূল পক্ষের শক্তি অপরিসীম এবং সংঘাত প্রচণ্ড, নায়কের জীবনে দুঃখের অভিঘাত অতি প্রবল, —তাই মধ্যপথে ইহা Tragic, শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল সংঘাতকে অতিক্রম করিয়া নায়ক সিদ্ধকাম, বিপক্ষ পরাজিত, তাই ইহা Comedy বা হর্ষান্ত। এ নাটকের দ্বন্দ্ব বাহিরের নয়, সম্পূর্ণরূপে মনের—ইহাই খাঁটি অন্তর্দ্বন্দ্ব, এ অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রমত্ত ঝটিকা হইতেও প্রচণ্ড। 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র মাতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব হইতেও বদ্ধজীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুতীব্রতর, ইহার জয়-পরাজয়ের কাহিনী আরও চিত্তাকর্ষক ও গূঢ়ভাব ব্যঞ্জক। রিপুর তাড়নায়, ইন্দ্রিয়াদির প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত, চঞ্চল, ঘূর্ণ্যমান জীবনের সংগ্রাম ও সিদ্ধি—উৎসাহে ও উত্তেজনায় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলে। অবশ্য এ নাটকের সংলাপ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক নয়, স্বগতোক্তি (Soliloquy) জাতীয়। ইহাকে monologue বা একক নাটক বলা যাইতে পারে। অদৃশ্য পাত্র বা পাত্রীর উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লইয়াই এই আত্মভাষণমূলক নাটকের রস-সিদ্ধি।

গীতিকবিতারূপে শাক্তপদাবলীর দাবি

(সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে শাক্তপদাবলীর নাটকীয় রূপটি যেমন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, খণ্ড-ক্ষুদ্র ভাবে বিচার করিলে তেমনই ইহার গীতিকবিতার রূপ ও স্বরূপটিও দৃষ্টি-বহির্ভূত থাকে না। অধিকাংশ শাক্তসঙ্গীত রূপে ও রসে সংহত এক একটি নিটোল গীতিকবিতা। রসিক সমালোচকের বিচারে, 'শাক্তপদ খাঁটি গীতি কাব্য। ইহাতে ভক্ত-চিত্তই মুখ্য বা একমাত্র আলম্বন।'[1]

১। কাব্যালোক—ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

সাধারণতঃ গীতিকবিতা বলিতে সঙ্গীতধর্মী কবিতাকেই বুঝায়। গাহিবার উদ্দেশ্যে সার্থক এবং শ্রুতিমধুর কথায় যে গান রচিত হয় স্থূলভাবে তাহাই গীতি-কবিতা। সঙ্গীতের প্রাণ সুর-সুরলিত সুষমামণ্ডিত ধ্বনি, তাহাতে কথা না থাকিলেও ক্ষতি নাই, ধ্বনিই নানা গ্রামসঞ্চারী হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করে। এই ধ্বনি, এই সুর-ঝঙ্কারই তাল লয়-যুক্ত হইয়া 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে কথাই থাকে না, থাকে কেবল সুরের খেলা, স্বরের লীলা। ব্যঞ্জনাময় এই সুর-ধ্বনিই গীতের মধ্যে এক-একটি অমূর্ত্ত ভাবকে প্রমূর্ত্ত করিয়া তোলে।

গীতিকবিতার ধর্ম্ম সঙ্গীতের ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন হইলেও গীতিকবিতা কথা-প্রধান। কথা ছন্দে বিধৃত হইয়া, আলঙ্কারিক পরিভাষায় যখন 'ধ্বনি' হইয়া উঠে, যখন তাহা একটি বিশিষ্ট ভাবকে সুসংহত বাণীরূপ প্রদান করে, তখনই তাহা হয় গীতিকবিতা। গীতিকবিতা সঙ্গীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও আহিত-লক্ষণ। গীতিকবিতার গীত যেন শেক্সপীয়রের 'Spherical music', তাহাকে অন্তঃকর্ণে শ্রবণ করিতে হয়।

গীতি কবিতা প্রধানতঃ কবির ব্যক্তিগত হৃদয় ভাবের ব্যঞ্জনাময় বাণী-মূর্ত্তি। ব্যক্তি-চিত্তের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি আধুনিক গীতিকবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ : ব্যক্তি চিত্তই ইহার মুখ্য আলম্বন। কবি এখানে একটি বস্তুকে নিজের মনের অনন্ত মাধুরী মিশ্রিত করিয়া নিজের অন্তরে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে গীতোচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিয়া তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করেন। বস্তু যাহাই হউক, বিশেষ একজন ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাহা কি রূপে দেখা দিয়াছে, তাহার হৃদয়ে কি বিশিষ্ট অনুভূতি জাগ্রত করিয়াছে, তাহারই গীতময় প্রকাশ আধুনিক Lyric poetry বা গীতিকবিতা। ইহা ব্যক্তি-মানসের অনুভূতির স্পর্শে প্রোজ্জ্বল : তাই সমালোচক ইহাকে বলেন, 'Personal or subjective poetry or The poetry of self delineation and self expression.'[১]

কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ হিসাবে শাক্তপদাবলী খাঁটি গীতিকবিতা। গীতিধর্ম্মিতা তো ইহাতে অবশ্যই বর্ত্তমান : গানে না শুনিলে ইহার অর্দ্ধেক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। উপরন্তু কবির নিজস্ব মনন, আত্মগত ভাব-চিন্তার স্পর্শে ইহা মনোময়। ভাব-তন্ময় সাধকের আত্মোচ্ছ্বাসে প্রত্যেকটি গীত পরিপূর্ণ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শাক্তপদাবলীই সত্যকারের গীতিকবিতা। চর্য্যাপদাবলীও গীতিকবিতার ধরনে রচিত, এগুলি যে গীত-প্রধান

১। An Intro. to the Study of Lit —Hudson (Chap II)

তাহা 'পটমঞ্জরী,' 'মালসী,' 'কামোদ' প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দ্বারাই সূচিত হয় ঃ কিন্তু দুই-একটি পদ ব্যতীত ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ এখানে সুলভ নয়। বৈষ্ণব পদাবলীরও লিরিক-সৌন্দর্য্য অনুপম। শ্রুতিমধুর ব্রজবুলির প্রয়োগে, সুরভিযুক্ত নির্ব্বাচিত শব্দের ব্যবহারে, ধ্বনি-প্রধান ছন্দের সুষমায়—সর্ব্বোপরি রসের আদি শৃঙ্গার রসের স্থায়িত্বে বৈষ্ণব-পদ স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবনের সম্ভোগ-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য, শ্রীরাধার ভাব-তন্ময়তা, রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল-লীলা স্বতঃই ভাব-মধুর। ইঁহাদের মুহুর্মুহু অশ্রু-কম্প-পুলক-স্বেদ, 'কোটি সমুদ্র-গম্ভীর' ভাবের বিচিত্র বিলাস, যে-কোন দর্শকের চিত্তে ভাবাবেগ সঞ্চার করে। তথাপি মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণ লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া আত্মগত ভাব অপেক্ষা সংস্কার-প্রসূত, প্রথাগত ভাবকেই অপরূপ বাণী-সজ্জায় প্রমূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য কবি বিদ্যাপতির 'আত্ম-নিবেদন' ও 'বিরহ,' চণ্ডীদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য,' গোবিন্দদাস কবিরাজের 'অভিসার,' বাসু ঘোষের 'গৌরচন্দ্রিকা' ও নরোত্তম দাসের 'প্রার্থনা' প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র, কারণ, এ সব স্থলে কবিগণ যাবতীয় সংস্কারের মোহবন্ধন অতিক্রম করিয়া আত্মগত মনোভাবকেই পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাই গীতিকবিতার সাবলীল মন্ময়তায়, ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসে এ সকল বৈষ্ণব পদ শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র কবিগণ যেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া, সম্প্রদায়গত সাধন-তত্ত্বকেই গীতচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি-চিত্ত মুখ্য অবলম্বন নয়, গোষ্ঠী-চিত্তই মুখ্য অবলম্বন।

শাক্তপদাবলীতেও সংস্কারগত ভাব, সম্প্রদায়গত ধ্যান-ধারণার প্রকাশ অল্প নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভাব কবি-চিত্তের বিশিষ্ট মনন-প্রভায় সমুজ্জ্বল। শাক্তপদে 'আমি,' 'আমাকে,' 'আমার'—এই আত্মবাচক সর্ব্বনামগুলির প্রয়োগ যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সর্ব্বনামগুলি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক নয়, কবির নিজস্ব 'অহং'এ-র প্রকাশ ঃ শক্তি-সাধনার বিশ্বজনীন গূঢ় তথ্যগুলিও কবির ব্যক্তিগত ধারণার অনুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া বিশেষ ভাবে ও রস-মাধুর্য্যে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আয় মা দুটো কথা বলি' বলিয়া যাঁহারা কাব্য-রচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা পরের মুখে ঝাল খান নাই, নিজের অনুভূতি ও আস্বাদনের কথা নিজস্ব ভাবে, নিজস্ব কথায়, নিজস্ব ঢংয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভক্তের আকুতি' পর্য্যায়ের কবিতায় কেবল নিজের কথা ঃ 'মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি,' 'আমায় দে মা পাগল পাগল করে,' 'আমি যে আর পারি নে শ্যামা,' 'কোলে তুলে নে মা কালী'। শাক্তপদাবলী সাধক কবির আত্মভাষণ ঃ নিজ নিজ-

অন্তরের কল-কাকলিতে ইহা পূর্ণ। 'জগজ্জননীর রূপ' নির্ম্মাণ করিতে গিয়াও কবিগণ 'মনোময় প্রতিমা' গঠন করিয়াছেন : তাই কাহারও দৃষ্টিতে মা করালী কালী, কাহারও দৃষ্টিতে তিনি মনোমোহিনী, করুণাময়ী, কাহারও নিকট তিনি 'হৃদি-বৃন্দাবনের' প্রেমময় কৃষ্ণ। এই প্রতিমার পূজাও মানস-পূজা। নিজের হৃদয় হইতে ভক্তি-পুষ্প, নিঃশ্বাস-চন্দন, প্রাণ-ধূপ আহরণ করিয়া শক্তির সাধক কবি মাতৃপূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন। সবই সাধকের নিজস্ব, এমন কি কথাগুলি পর্য্যন্ত ধার করা নয়—একান্তভাবে নিজের। তাই শাক্তগীতি খাঁটি গীতিকবিতা।

অকৃত্রিম হৃদয়-ভাবের আবেগোচ্ছল প্রকাশ হিসাবেও শাক্তপদ গীতিকবিতার সমধর্ম্মী। কবি Wordsworth কবিতাকে বলিয়াছেন, 'Spontaneous overflow of powerful feelings' : শাক্তগীতি কবির নিজস্ব প্রগাঢ় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। সাধক কবি মাতৃনামের অনুধ্যানে তন্ময় :

আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে।
কালীনামামৃত পীযূষপানে ॥

অধ্যাত্মজগতের এই ভাব-তন্ময়তা সত্ত্বেও কবির মন সৃষ্টির জন্য উন্মুখ, আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যাকুল : তিনি বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি' তাই মাতৃনামামৃত পীযূষ মাখাইয়া তিনি আবেগকে রূপায়িত করেন। সে মুহূর্ত্তে 'ঢুলু ঢুলু আঁখি'তে রূপজগতের যাবতীয় চিত্র ধরা পড়িতে থাকে। অন্তরের অনুভূত গান, অধ্যাত্মলোকের স্বরতরঙ্গ, বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হাসি-কান্না—সব মিলিত হইয়া যেন সীমা ও অসীমের, রূপ ও ভাবের, মর্ত্ত্য ও স্বর্গের উদ্বাহ-উৎসব ('Bridal of the Earth and Sky') সম্পন্ন হইতে থাকে : শাক্তগীতি এই মিলনোৎসবের ছন্দিত রূপ। তাই শাক্তপদাবলীর কবি কখনও মাতৃরূপ দর্শনে তন্ময়, কখনও দুঃখক্লান্ত জীবনের বেদনায় অধীর, কখনও আত্মধিক্কারে উন্মাদ, কখনও মাতৃকৃপাভিখারী, কখনও সমরোত্তেজনায় উৎসাহিত, কখনও মাতৃ-চরণ-কমল-মধুপানে বিহ্বল। একদিকে অধ্যাত্ম জগতের সংবেদন, ভক্তির আবেগ, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধির আনন্দ—অপরদিকে মর্ত্ত্যলোকের অভীপ্সা, মানুষের দুঃখ-সুখ, আকুতি-মিনতি, উত্তেজনা সংকল্প। এই বিচিত্র ভাবের আত্মোচ্ছ্বাস সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ, শাক্তপদগুলি এই লক্ষণাক্রান্ত

॥ চার ॥

অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিতা হিসাবে শাক্তপদের বিভাগ

শাক্তপদাবলী জীবনাশ্রয়ী কবিতা, পারমার্থিক স্তোত্রসঙ্গীত রূপেও ইহাদের বিশিষ্ট স্থান আছে, মাধুর্য্য-ভাবের প্রকাশ হিসাবে সঙ্গীতগুলি বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসে পূর্ণ, ইহাদের নাটকায় প্রকাশভঙ্গী ও গীতিকবিতার রূপ ও গুণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নানাপ্রকার রূপ ও গুণ বিভূষিত হইয়াও শাক্ত গীতাবলী যে ত্রুটি-বিহীন নয়, আলোচনার প্রারম্ভে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ শাক্তপদে কাব্যগুণ-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট পদের অভাব নাই, আবার অপকৃষ্ট পদাবলীও দুর্লভ নয়। উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারপূর্বক এগুলির একটি স্থূল বিভাগ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

শাক্তপদাবলীতে (১) অনুবাদাশ্রয়ী (২) রূপকাশ্রয়ী এবং (৩) ভাবাশ্রয়ী—এই তিন প্রকারের পদ পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত ধ্যান, পূজা, স্তব বা শাস্ত্রীয় তত্ত্বের অনুবাদ হিসাবে যে পদগুলি পাওয়া যায়—সেগুলি অনুবাদ-কবিতা। কতকগুলি কবিতায় শক্তি-তত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্বের দুরূহ তথ্য এক একটি রূপকের মধ্যে বিধৃত,—এগুলি রূপকাশ্রয়ী কবিতা। ইহা ছাড়া কতকগুলি পদ আছে, যেগুলিতে তত্ত্ব, পৌরাণিক বিবিধ উপাখ্যান, মানব জীবনের বিচিত্র অনুভূতি কবির ব্যক্তিগত মনোভাবের স্পর্শে সমুজ্জ্বল, এইগুলিই ভাবাশ্রয়ী কবিতা।

১ অনুবাদাশ্রয়ী কবিতা

মহাতাবচাঁদ মহারাজ-বিরচিত কালী, ষোড়শী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা ও ভদ্রকালীর রূপ, শিবচন্দ্র রায় মহারাজ-রচিত 'তারা'র রূপ এবং শিবচন্দ্র সরকার-অঙ্কিত ভুবনেশ্বরী দেবীর বাণীমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রোক্ত মাতৃ-ধ্যানের অনুবাদ। মহারাজ নন্দকুমারের—'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে' (ভক্তের আকূতি)—পদটিও তান্ত্রিক ভূতশুদ্ধি বা ষট্‌চক্রভেদ-প্রক্রিয়ার অনুবাদ। রামকুমার নন্দী মজুমদারের—'হৃৎকমল মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে। প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে॥'—কবিতাটি তন্ত্রোক্ত মানসপূজার হুবহু রূপান্তর। নন্দকুমার মহারাজের—'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী॥'—পদটিতে বিবিধ রাগরূপে শারীর-যন্ত্রে মায়ের যে গ্রাম-সঞ্চারিণী

নাদমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'সঙ্গীত-দামোদর'-ধৃত এই শ্লোকটির প্রভাবে রচিত :

আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লারসংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরাগশ্চ ততঃ পশ্চাদ্বসন্তস্তদনন্তরম্‌ ॥
হিল্লোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগা ষডেব তু ॥১

এইরূপ অনেক পদ আছে, যাহা বিভিন্ন শাস্ত্রপুরাণের অংশবিশেষের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের বা তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের নামাবলী মূলক স্তোত্রগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। এই অনুবাদাশ্রয়ী পদগুলিতে মৌলিকতা তো নাই-ই, উপরন্তু মূলের রস-ব্যঞ্জনাও বাঙলা অনুবাদে রূপান্তরিত হয় নাই। সংস্কৃত মাতৃ-ধ্যানগুলির মধ্যে যে কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, রূপান্তরের ফলে ধ্যানগুলি তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। ভাবের দিক হইতে মূলের প্রতি অক্ষরিক আনুগত্য থাকিলেও অনুবাদাশ্রয়ী পদাবলীর কোনটিই রসোত্তীর্ণ কবিতা হয় নাই। নামাবলীরূপ স্তোত্রগুলি আরও বৈচিত্র্য-হীন। নামের পর নাম সাজাইয়া অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষা করিলেই যে কবিতা হয় না, ভক্তগণ বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। মনে হয়, শাক্তপদাবলীতে এই কবিতাগুলি অধম কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত।

রূপকাশ্রয়ী কবিতা

শাক্তপদাবলীর সাধক কবিগণ নিজেদের সাধনার গূঢ় রহস্য এবং উপলব্ধির কথা প্রকাশ করিতে গিয়া কতকগুলি রূপক প্রয়োগ করিয়াছেন। এইগুলিকেই আমরা রূপকাশ্রয়ী কবিতার অন্তর্ভুক্ত করিতেছি। শাক্ত গীতিতে রূপকধর্ম্মী কবিতার সংখ্যা অসংখ্য : তন্মধ্যে রামপ্রসাদের 'ভবের আসা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল', 'আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী কল্পতরুতলে গিয়া চারিফল কুড়ায়ে খাবি ॥', 'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি ভব সংসার বাজারের মাঝে', রামচন্দ্র রায়ের 'তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, কি করি এখন।' রসিকচন্দ্র রায়ের 'সাধন-রূপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন, খেলিয়ে নে রে'—প্রভৃতি পদ বিখ্যাত। এই সকল পদে পাশাখেলা, ভ্রমণ, ঘুড়ি উড়ানো, ব্যাধিগ্রস্ত জীবন, গ্রাবুখেলা (=বিস্তি খেলা) ইত্যাদির রূপকে উপাস্য ও উপাসনা-তত্ত্বের ভাব ও ক্রিয়াগুলিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দুইটি অংশ পাওয়া যায়—প্রথমতঃ মূল বক্তব্য এবং দ্বিতীয়তঃ সেই বক্তব্যকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আর একটি প্রতিবস্তু। রূপকধর্ম্মী রচনার

১। শব্দকল্পদ্রুম, 'রাগ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ : রূপের পার্শ্বে একটি প্রতিবস্তু সৃষ্টি করিয়া মূল রূপ ও বস্তুর ধর্ম্মকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা। আক্ষিপ্ত প্রতিরূপটি নিহিতার্থ-ব্যঞ্জক : ইহা দ্বারা কোন বিশেষ মত, নীতি, বা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়। এ হেন রূপক-প্রয়োগের সুস্পষ্ট দুইটি উদ্দেশ্য থাকে : প্রথমতঃ ইহা দুরূহ তত্ত্বকে সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে সাহায্য করে, এবং দ্বিতীয়তঃ শুষ্ক ও নীরস বিষয় এই রূপক-সজ্জায় সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কাব্য-সাহিত্যে যে রূপক প্রয়োগ করা হয়, বাচ্যকে সুস্পষ্ট, সরস ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া তোলাই তাহার অন্যতম লক্ষ্য। অন্যান্য অলঙ্কারাদির যে কাজ, সাহিত্য-শিল্পের অঙ্গরাগ সম্পাদনে রূপকেরও সেই কাজ।

ধর্ম্মমূলক সাহিত্যে রূপক-প্রয়োগের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ধর্ম্মের বিচিত্র উপলব্ধি, রহস্যময় ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করিতে রূপকের ব্যবহার অপরিহার্য। ধর্ম্মবোধকে জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়াই প্রকাশ করিতে হয়। অধ্যাত্ম-বোধ জীবন-বোধ হইতে পৃথক নয়। অধ্যাত্ম-জীবনের কথা প্রকাশ করিতে গেলে বাস্তব জীবনের রূপক দিয়াই তাহা ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাই স্বভাবতঃই এই সকল রচনা রূপকাশ্রয়ী হইতে বাধ্য। দার্শনিক Santayana বলেন, "Religion is human experience interpreted by human imagination···The idea that religion contains a literal, not a symbolic representation of truth and life, is simply an impossible idea."[১]

তাহা ছাড়া, অধ্যাত্ম-জীবনের অনুভূতি স্বভাবতঃই রহস্যময়, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধের অতীত। সাদা কথায় সে অনুভূতিকে ব্যক্ত করা অসম্ভব। অথচ সে অনুভূতিকে প্রকাশ করার তাগিদ অপরিসীম। অরূপ রতনের যে দ্যুতি সাধকের হৃদয়ে একবার ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, যে অব্যক্ত আনন্দে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বাণীবদ্ধ না করিয়া কি থাকা যায়? তাই তাহাকে প্রকাশ করিতে গিয়া সাধক স্বাভাবিক ভাবেই রূপক অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে Underhill বলেন 'The experience of the Mystic is inexpressible except in some side-long way, some hint or parallel which will stimulate the dormant intuition of the reader, and convey as all poetic language does, something beyond its surface-sense. Hence enormous part is played in all mystical writings by symbolism and imagery',[২]

১। The Story of Philosophy—Will Durant. ২। Underhill's Mysticism.

রহস্যময় অধ্যাত্ম-সাধনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাই প্রত্যেক দেশের সাধক রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া গুহ্য সাধন-পন্থী খ্রীষ্টান মিস্টিক, সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, নাথপন্থী যোগী ও মরমিয়া আউল-বাউল তাঁহাদের রচনায় প্রচুর রূপক প্রয়োগ করিয়াছেন। শাক্তগীতির কবিরাও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করেন নাই।

রূপকাবরণটিও সর্ব্বত্রই প্রায় একপ্রকার অর্থাৎ প্রথাবদ্ধ। নৌকাবাওয়া, দাবাখেলা বা পাশাখেলা, শিকার ধরা—এইগুলিই রূপকের বহিরঙ্গ। 'চর্য্যা'-গীতিকার একাধিক পদে নৌকা-চালনার রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে: 'ভবণঈ গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী' (৫নং চর্য্যা), 'বাহঅ কায় কাহ্নিল মাআজাল' (১৩নং চর্য্যা)। বাউল গানেও বলা হইতেছে, 'এ নায়ের ভরসা নাই পলকে ডুবি যাইব। সুজন কাণ্ডারীর নায়ে উড়াল বৈঠা বাইব ॥' (ভেলা শাহ)

শাক্তপদাবলীর রূপকগুলিও প্রথাবদ্ধ; সেই পাশাখেলা, শিকার ধরা বা নৌকা-চালনা: 'মন পবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে' (কমলাকান্ত), অথবা,

একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ (রঘুনাথ রায়)

কিন্তু শাক্তপদের সব রূপক গতানুগতিক নয়। সাধনার কথা প্রকাশ করিতে গিয়া সাধকের লক্ষ্য ছিল এই মাটির পৃথিবীর প্রতি, ধূলি-ধূসরিত জীবনের প্রতি। যাহারা চাষবাস করিয়া, কলুর বলদের মত স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত হইয়া, মজুরি খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের কথা সাধক ভক্তগণ ভুলিতে পারেন নাই। তাই রূপক নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যে পরিবেশের মধ্যে তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেই জীবন হইতেই তাঁহারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মানব-জীবনের বহুবিচিত্র চিত্র দ্বারা রূপক-কথা নির্ম্মিত হওয়ায় শাক্তগীতি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবন-নিষ্ঠা ও মর্ত্ত্য-প্রীতি শাক্তপদাবলীতে অসামান্য জীবন-রস সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি কতকগুলি পদে তত্ত্বকে ছাপাইয়া জীবনের চিত্রটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি কথা। চর্য্যাপদ বা বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীতে দুরূহ সাধন-তত্ত্বের কথা প্রকাশ করিতে গিয়া কবিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলিই তত্ত্বের মতই হেঁয়ালী হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের ভাষাকে বলা হয়, 'সন্ধ্যাভাষা' অর্থাৎ সঙ্কেতময় ভাষা, তাহা ব্যক্তাব্যক্ত আলো-আঁধারি ভাষা। চর্য্যাপদের টীকায় এই হেঁয়ালিকে বুঝাইতে গিয়া টীকাকার একাধিকস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, 'সন্ধ্যা ভাষয়া বোদ্ধব্যম্' অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষার গূঢ়ার্থদ্বারা বুঝিতে হইবে। সন্ধ্যাভাষার নিহিতার্থ জানা না থাকিলে, পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। সাধনার উপলব্ধি, বিশেষ

করিয়া গোপনায় সাধনার উপলব্ধি অতিশয় রহস্যময়। সাধকের অনুভূতি একান্তভাবে ব্যক্তিগত। সেই অনন্ত ও অরূপ কি ভাবে আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে লীলা করিতেছেন, কি ভাবে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' তাঁহার নিকট বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছেন, কি ভাবে সাধকের দেহস্থ পদ্মদল তাঁহার ছোঁয়ায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া অনির্ব্বচনীয় নিত্যানন্দধারায় তাঁহার সকল অনুভূতি আনন্দ-বিভোর হইয়া যাইতেছে—সে রহস্য অন্যে বুঝিবে কেমন করিয়া? ইহা যে 'Flight of alone to alone'—একের প্রতি একের অভিসার: সান্তের সহিত অনন্তের রস সম্ভোগ। তাহার আনন্দ অসামান্য (অত্যন্তং সুখম্), তাহার আস্বাদনও অনির্ব্বচনীয়। সে মিলনের রসকুঞ্জে বহিরঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্যে তাহার আনন্দ বুঝিবেই বা কেমন করিয়া? যিনি সে মিলনানন্দ অনুভব করেন, তিনিই যে বলিয়া উঠেন, 'বাক্‌পথাতীত কাহী বথাণি'—বাক্‌পথের অতীত অনুভূতিকে কিরূপে ব্যাখ্যা করিব? তাই এ অনুভূতির প্রকাশ স্বতঃই রহস্যময় হইয়া উঠে। এই অজ্ঞেয় রহস্যময়তা হইতেই সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্-এর উদ্ভব।

গুহ্য সাধনার মধ্যেই এই মিষ্টিক ভাব অধিক। অতি রহস্যময় আধ্যাত্মিক সঙ্গম-যোগ যাহার সাধন, তাহার প্রকাশও রহস্যময়। তাই সাধক—'Variety of images', 'Suggestive qualities of words', 'Desperate paradoxes'—দিয়া সেই সাধনরাজ্যের কথা কিছুটা আভাসিত করিতে চেষ্টা করেন। রূপক, প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াও সাধক যেন সম্পূর্ণ বুঝাইতে পারেন না, তিনি নিজেই যেন রহস্যের মধ্যে থাকিয়া যান। 'জোইণি জালে বএণি'—পোহানোর অনির্ব্বচনীয় মহাসুখ, 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি'-এর দুর্ব্বোধ্য কৌশল ব্যক্তাব্যক্ত সন্ধ্যাভাষায় আরও রহস্যাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন গুরু বোবা, শিষ্য বধির: বহিরঙ্গ জন তো 'বহু বহু দূর।'

চর্য্যাগীতিকা ও বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীতে এই দুরধিগম্য ভাব ও ভাষার প্রকাশ অনেকস্থলেই দুর্ব্বোধ্য। 'কণ্ঠের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ'—ইহার অর্থ যে, 'কুম্ভক করিলে দেহের মল পরিশোধিত হয়',—তাহা বুঝাইয়া না দিলে এ সন্ধ্যাভাষা ভেদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'সুমেরু উপরে ভ্রমর বসিল', বা 'মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে এ রস মিলএ তারে' প্রভৃতি ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। চর্য্যাগীতিকা ও বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীর কবিদের আধ্যাত্মিক অজ্ঞেয়তা দুর্ভেদ্য, তাঁহারা যেন 'Inscrutable Mystic'

শাক্তপদাবলীতে এই দুরধিগম্য রহস্যময়তা নাই। অবশ্য তাঁহাদের সাধনরাজ্যও

রহস্যময়, 'যে দেশেতে রজনী নাই'—এমন দেশ। তাঁহাদের সাধনার মর্ম্মও দুরূহ, 'মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না'—এমনই দুরবগাহ। কিন্তু এই দুরবগাহ তত্ত্ব ও ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করিতে গিয়া সাধক কবিগণ যে রূপক, যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলি সহজবোধ্য। রূপকের আবরণ উন্মোচন করিলে বক্তব্যও উন্মোচিত হয়। রূপকগুলি প্রাঞ্জল বলিয়াই শাক্তপদাবলীর বাচ্য অস্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট নয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য বিচারে এই অকুণ্ঠ, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গীর স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কতকগুলি রূপকের রস-ব্যঞ্জনাও অদ্ভুত। আমরা ভাবাশ্রয়ী কবিতার প্রসঙ্গে তাহাদের আলোচনা করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া শাক্তপদাবলীর রূপক-প্রয়োগ সর্ব্বত্র সার্থক নয়, কেবল মাত্র দুরূহ তত্ত্বের ভাবার্থ পরিস্ফুটন বা ব্যাখ্যা করিলেই রূপক সার্থক হয় না। কাব্যের আত্মা রস, রূপকাদি সাজ-সজ্জা সেই রস-সৃষ্টির উপকরণ। রূপক যখন ব্যঞ্জিত বাচ্যরূপ রসাত্মক বাক্য-নির্ম্মাণে সহায়তা করে, তখনই তাহা সার্থক হয়। শাক্তপদাবলীর বেশির ভাগ রূপক তত্ত্ব-ব্যাখ্যার সহায়ক, রূপক যেন তত্ত্বের সহযোগী প্রচারক। তত্ত্বকে প্রকাশ করিতে গিয়া উপমা-রূপকে যে অপ্রস্তুত বিষয় কল্পনা করা হয়, তাহাও যদি তত্ত্ব হইয়া উঠে, তবে রূপকের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। শাক্তপদের বহু রূপক এই দোষে দুষ্ট। কোন কোন স্থলে তত্ত্ব ও রূপকের বহিরাবরণের পার্থক্য পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গিয়াছে। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল'—পদটিতে শেষ পর্য্যন্ত গারদ কয়েদীর কোন উল্লেখই নাই, রূপক ও তত্ত্ব এখানে একাকার। রামপ্রসাদের 'আয় মন বেড়াতে যাবি,' পদটিতে ভ্রমণের যে রূপক কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে 'ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি'—এ প্রসঙ্গ অবাস্তব। তবে রামচন্দ্র রায়ের 'তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, কি করি এখন', রঘুনাথ রায়ের 'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী', রসিকচন্দ্র রায়ের 'সাধনরূপ প্রাবৃ খেলা এই বেলা মন, খেলিয়ে নে রে' এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের বহু পদের সাঙ্গরূপক ও মালারূপকের সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। শাক্তপদাবলীর রূপকাশ্রয়ী কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে মধ্যম, ভালয়-মন্দে মিশানো।

ভাবাশ্রয়ী কবিতা

রসোত্তীর্ণ রচনা হিসাবে শাক্তগীতির ভাবাশ্রয়ী কবিতাগুলি সত্যই সুন্দর। এই সকল কবিতার তত্ত্বের সুর উচ্চগ্রামে বাজিয়া উঠে নাই, উঠিলেও তাহা অতি মৃদু, অতি

সুকুমার। জীবনের বহুবিচিত্র অধিবাসনে তত্ত্বও এ সকল ক্ষেত্রে কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত কবি-প্রতিভাকে বলিয়াছেন, 'অপূর্ব্ব-বস্তু-নির্ম্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'; কবি সত্যই অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ-কুশলী, তিনি বিশ্বলোকে প্রজাপতি সদৃশ। কবির ভাব ও কল্পনা যেন স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণময় হইয়া উঠে। কবির হৃদয়-জগতের ভাব-স্পর্শে যে কবিতা জন্মলাভ করে, তাহাই ভাবাশ্রয়ী কবিতা। শিল্পী-সমালোচক Addison-এর ভাষায় বলিতে গেলে, এইরূপ সৃষ্টিকেই 'Pleasure of Imagination' বলিতে হয়।

শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র অধিকাংশ গান ভাবাশ্রয়ী কবিতার অন্তর্ভুক্ত। এখানে কবিগণ পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া মনোরম জীবন-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন: কবির হৃদয়-ভাবের ছোঁয়ায় মেনকা হইয়াছেন বাৎসল্যময়ী গৃহজননী, রুদ্র মহেশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন গৃহ-জামাতা, আর ত্রিলোকমান্যা জগজ্জননী উমা হইয়াছেন ঘরের মেয়ে। পৌরাণিক সংস্কারগুলি পর্য্যন্ত লৌকিক ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'জগজ্জননীর রূপ' অঙ্কন করিতে গিয়া সাধক কবিগণ যখন তন্ত্রোক্ত ধ্যানের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, তখন জননী ভাবময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। কবির মানস-প্রসূত সে রূপ অপূর্ব্ব! তখন তাঁহার গতানুগতিক মূর্ত্তি নয়, তাঁহার 'চপলা জিনি দন্তশ্রেণী', 'অমিয়া জিনি মুখশোভা', কেশরী জিনি বিক্রম': তখন তাঁহার,—

রাঙা কমল রাঙা করে, রাঙা কমল রাঙা পায়।
রাঙা মুখে রাঙা হাসি, রাঙা মালা রাঙা গায়॥ (গিরিশচন্দ্র)

সে কি অপরূপ রূপ! কে বলে, তিনি 'শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী', কে বলে, তিনি 'অসুর-সংহারে উদ্যত অশনি?'—এ যে 'সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সুন্দরী!'—

ঐ মনোমোহিনী!
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা
মণি-মরকত-কান্তি ছটা!

এ মূর্ত্তি তন্ত্রের ধ্যানের মূর্ত্তি নয়। মাটিতেও এ মূর্ত্তি গড়া যায় না। তাই সাধক বলেন, 'মা য়র মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে!' কোন মৃৎশিল্পী এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। এ মূর্ত্তি ভক্তের হৃদয়-ভাবে গড়া মূর্ত্তি, ভাব-তন্ময় রূপকার-নির্ম্মিত মানস প্রতিমা

'ভক্তের আকূতি' পর্য্যায়ে 'মা বলে কাঁদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয়!' (বিষ্ণুরাম চট্টো); 'সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা' (চন্দ্রনাথ দাস);

করুণাময়ী মায়ের প্রশংসায় 'কে তুমি শিযরে বসি জাগিতেছ গো জননী' (পুণ্ডরীক মুখো)—প্রভৃতি চমৎকার ভাবাশ্রয়ী কবিতা: এগুলি বিশুদ্ধ লৌকিক ভাবের রস-রূপায়ণ। রামপ্রসাদের অধিকাংশ পদ তত্ত্ব-বিলসিত হইয়াও ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিবিড়তায় ভাব-সমৃদ্ধ: মাতৃমহাভাব-সাগরে এগুলি যেন কবির মানস-জাত ভাবের অসংখ্য ঊর্মি। প্রত্যেকটি কবিতা নিজস্ব মনন-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হৃদয়-ভাবের পরিমণ্ডলে ভক্তের আকুতিও বৈচিত্র্যময়: কেহ বলেন, 'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি' (রামলাল দাস দত্ত), কেহ বলেন 'হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে' (নবাই ময়রা)।

এমন কি কতকগুলি রূপকাশ্রয়ী কবিতাও ভাবাশ্রয়ে রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে: কমলাকান্তের 'মজিল মন-ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে' পদটি সাধকের ভাব-তন্ময় অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না, 'মিলনে নিখিল হারা' ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। রামপ্রসাদের 'মাগো, তারা ও শঙ্করী। কোন্ অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রীজারী'—পদখানি একজন সর্ব্বস্বান্ত বিপন্ন আসামীর কাতরতার মধ্যে প্রতিবাৎসল্য রসের অনুযোগাত্মক ক্ষুব্ধতার ভাব অভিব্যক্তি করে। এইরূপে যেখানেই কবির হৃদয়-ভাবের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেইখানেই তত্ত্ব-মুখর শাক্তগীতি রসোত্তীর্ণ কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ভাবের উপরেই শাক্ত কবির অধিক আকর্ষণ। তাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে এই কথাই বলেন, 'ভাব না হলে অভাবে কি ধরতে পারে?' এই ভাব দিয়াই তাহারা 'মনোময় প্রতিমা' গড়াইয়া, হৃদি-পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া মানসিক উপচারে মায়ের পূজা করিয়াছেন, অন্তরে তাহার 'অনন্ত বেশ' উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের মনোজগতের পরিমণ্ডলে আসিয়া সাধারণ বস্তুও অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে, নীরস বিষয়ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তপদাবলীর এই ভাবাশ্রয়ী কবিতাগুলিই কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট: এইগুলিই উত্তম কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত।

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

কবি-প্রসঙ্গ

॥ এক ॥

শাক্তগীতিব ক্রম-বিবর্ত্তন

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী যেমন বৈষ্ণব পদাবলার স্মুবর্ণ-যুগ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী তেমনই শাক্তপদাবলীব স্মুবর্ণ-যুগ। শাক্ত-সঙ্গীতেব সম্যক উৎসাব, প্রসাব ও সমৃদ্ধি এই দুই শতকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ

অবশ্য অষ্টাদশ শতকেব পূর্ব্বেও যে শাক্ত সঙ্গীত বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমবা পূর্ব্বে আলোচনা কবিযাছি। হব-পার্ব্বতীব দাম্পত্য জীবন পার্ব্বতীব খেদোক্তি, নায়িকা-প্রশস্তি ছলে চণ্ডিকাব প্রশস্তি বর্ণনা কবিযা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায প্রকীর্ণ কবিতা বচিত হইযাছিল। আঠাবো শতকের পূর্ব্বে যে-সকল তান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধক বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাবাও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায বচিত হইলেও তাঁহাদেব বচনা সুন্দব ও প্রাঞ্জল এবং মাঝে মাঝে কবিত্বও চিত্তাকর্ষক। বাঙলা ভাষায বচিত শাক্তপদাবলীব অঙ্কুব ইহাদেব মধ্যেই নিহিত। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও 'ঠাকুবাণী বন্দনা,' 'চৌতিশা' স্তব প্রভৃতি অংশে 'জগজ্জননীব রূপ,' মাতৃকা-প্রশস্তি এবং বিপন্মুক্তি কিংবা ঋদ্ধি লাভের কামনায 'ভক্তেব আকূতি' বর্ণিত হইযাছে। উপবন্তু চর্যাপদে ও বৈষ্ণব সহজিয়াদেব পদাবলীতে শক্তি-সাধনাব ইঙ্গিত-বহ পদ বহিযাছে। প্রাদেশিক ভাষায বৈজু বাওয়া, মিঞা তানসেন শাক্তপদাবলীব অনুরূপ সঙ্গীত বচনা কবিযাছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও কবিবাজ গোবিন্দদাসেবও শাক্ত-সঙ্গীত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্ব্বে বচিত এই সকল পদ বা সঙ্গীতই শাক্তপদাবলীর আদিরূপ। এগুলিকে শাক্তপদাবলীব বীজাবস্থা বলা যাইতে পাবে। এখানে গীতধ্বনি অস্পষ্ট, চেতনাও অস্ফুট : ইহাদেব ভাব পশুভাব, আচার অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণাচার। বীর ভাবের সাধনা তখন গোপন পথ ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব তাহা ভাষায়

অপ্রকাশিত। পদাবলীরও স্বতন্ত্র রূপ নাই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাক্তপদ কাহিনী-কাব্যের অঙ্গীভূত: শিবায়ন, কালিকামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 'জগজ্জননীর রূপ', 'মাতৃ-নামাবলী', 'ভক্তের আকুতি' কোন প্রকারে জোড়া লাগিয়া আছে। বৈজু বাওয়া কিংবা মিঞা তানসেনের কতিপয় সঙ্গীতে দেবীর নাদশক্তিরূপে সঙ্গীতের স্বরগ্রাম-সঞ্চারিণী মূর্তির আভাস পাওয়া যায়: কতকগুলি গানে দেবীর নামাবলী ও সরস্বতী-স্তোত্র বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজের পদে শিব-শক্তির যুগনদ্ধ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল পদ ও সঙ্গীত শাক্তগীতির উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহা মানিতেই হইবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর ভক্তির অতিনিবিড়তা হৃদয়ভাবের অকৃত্রিম সরলতা, মা মেনকার প্রগাঢ় বাৎসল্য এবং দিব্যভাবানুগ শক্তি-সাধনার কথা সেগুলিতে স্থান লাভ করে নাই, শক্তিসাধকের দুর্দ্দম তেজ, জগজ্জননীর প্রতি সুতীব্র অনুযোগ এবং ভক্তের অসমসাহসিকতার সুর ও এই সকল সঙ্গীতে ধ্বনিত হয় নাই। সহৃদয় আত্মস্পর্শেরও অভাব আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শাক্ত কবি হিসাবে স্থূলভাবে—বিদ্যাপতি, বিজয় গুপ্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, দ্বিজ মাধব, দ্বিজ বংশীদাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। মায়ের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে মাতৃ-সঙ্গীত গান করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় শাক্তপদাবলীর ভাবের অঙ্কুর থাকিলেও, শাক্তগীতির বিশিষ্ট ঢং অনুপস্থিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সঙ্গীত

অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগ। সাধক কবি রামপ্রসাদ শাক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধনার প্রত্যক্ষ অনুভূতির আনন্দ সংবাদে, ভক্তির নিবিড়তায়, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। আবেগে ও আকুলতায় সরলতায় ও অকৃত্রিমতায়, ভালবাসার অসমসাহসিকতায় তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীত জনজীবনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। রামপ্রসাদই শাক্ত গানের গোমুখী।

রামপ্রসাদের সরণি অনুসরণ করিয়া কত কবি যে ভক্তিরসাত্মক শক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শতাব্দীর রাজা, মহারাজ, কুমার, দেওয়ান সকলেই মায়ের ভক্ত, সকলেই কবি। তৎকালীন মাৎস্য ন্যায়ের জালে সকলেই আবদ্ধ এবং অত্যাচারিত। বাদশাহ রাজস্বের জন্য নবাব ও রাজাদের উপর চাপ

দেন, নবাব অধীনস্থ জমিদারের উপর জুলুম করেন, জমিদার প্রজাদের 'মসিল দিয়া তসিল' করেন। এই পরিস্থিতিতে জগজ্জননীর বরাভয় মূর্ত্তি বেদনাবিদ্ধ, উৎপীড়িত জীবনে অভয় ও শান্তি প্রদান করিয়াছিল। দলে দলে সকল লোক জননীর চরণে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য ভয় হইতে যে ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে কাহারও কাহারও মধ্যে যে পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্ক্ষা না ছিল এমন নয়, কিন্তু মাতৃচরণে শরণাগতির আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। প্রায় প্রতিটি সঙ্গীতে এই শরাণাগতির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।

এই শতাব্দীতে শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। শক্তিপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—মহারাজ, রাজা, দেওয়ান প্রভৃতি। ভৌতিক অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের কামনাতেই তাঁহারা শক্তি-ব্যূহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্য-লিপ্সাও তাঁহাদের মধ্যে ছিল। এই কামনাবশে তাঁহারা জাঁকজমকে শক্তিপূজার আয়োজন করিতেন—ডাকের গহনায় প্রতিমা-সজ্জা, ঢাকের বাজনার আড়ম্বর, ঝাড়লণ্ঠন রোশনায়ের জৌলুষ ইত্যাদির মধ্যে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের প্রকাশ হইত। রাজসিক উপচারে মায়ের পূজা জমিয়া উঠিত। অবশ্য সমারোহের মধ্যে আন্তরিকতাও থাকিত। মহারাজ হইয়াও নাটোরাধিপতি রামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগী মহাপুরুষ, সিদ্ধ সাধক—দেওয়ান রঘুনাথ রায় ছিলেন সংসার-বিরাগী ভক্ত। অনেকে আবার পার্থিব ঋদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূজায় ব্রতী হইয়া পারমার্থিক সিদ্ধির স্তরে উঠিয়া গিয়াছেন।

রাজা-মহারাজ-দেওয়ান-রচিত শাক্ত গীতাবলীর মধ্যেও আন্তরিকতা ও গভীর ভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান, কাহারও কাহারও সঙ্গীত হৃদয়ের গভীর হইতে উৎসারিত। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত পালিত হইয়াও অনেকে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ছিল, সাধনার অতি দুরূহ তত্ত্ব তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। রাজাদের মধ্যে অনেকেই অতি সুন্দর নামাবলী-স্তোত্র রচনা এবং তন্ত্রোক্ত মাতৃ-ধ্যানের অনুবাদ করিয়াছেন।

শাক্তপদাবলীর মধ্যে পশুভাব ও বীরভাবকে অতিক্রম করিয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে আকূতি দেখা যায়, প্রথমদিককার শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যেও তাহার সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা সাধক শ্রেণীর কবি, তাঁহাদের রচনায় কেবলই দিব্যভাবের কথা। শাক্ত সঙ্গীতগুলি দিব্য জীবনাভিলাষের মহিমায় পরিপূর্ণ। সকল সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক হীনতাকে পরিহার করিয়া সাধক কবিগণ

সমুন্নত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে শুষ্ক পাণ্ডিত্য নিন্দিত, নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবহেলিত, পূজার আড়ম্বর-সমারোহ অবজ্ঞাত। দলাদলি বা প্রচারোন্মাদনায় শাক্ত কবিগণ বিভ্রান্ত হন নাই; অনাবিল ভক্তির নিবিড়তায় তাঁহাদের কণ্ঠে মাতৃ-গীতি ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

এই যুগের শাক্ত গীতাবলীর মধ্যে কবির সহৃদয় আত্মস্পর্শ, ব্যক্তিগত মননের চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে বর্ণনা, স্তবস্তুতি ছিল বস্তুনিষ্ঠ—এ যুগে তাহা একান্তভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদাদি সাধক কবিদের রচনায় আত্মগত মননের প্রভাবে গীতিকবিতার এই মন্ময়তার লক্ষণটি অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'আগমনী বিজয়া'র গানে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া ভক্তের হৃদয়-ভাবকে উদ্ঘাটন করিবার সূচনাও এই সময় হইতেই হইয়াছে।

শাক্ত সঙ্গীতের বিশিষ্ট কেন্দ্র

অষ্টাদশ শতকে শাক্ত সঙ্গীত রচনার কয়েকটি বিশিষ্ট কেন্দ্রও এ দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রগুলির পোষ্টা ছিলেন দেশীয় রাজা, মহারাজ অথবা দেওয়ান বংশ। সকল কেন্দ্রের প্রেরণামূলে ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, নাটোর—সর্ব্বত্রই শাক্তসঙ্গীত রচনার বিপুল উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল। নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শাক্ত সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজে শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন, কবিদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছেন। বংশানুক্রমে মহারাজের বংশে শাক্ত সঙ্গীত রচনার ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বর্দ্ধমান-রাজসভাও শাক্ত সঙ্গীত রচনার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ, তেজশ্চন্দ্র, মহাতাবচাঁদ সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের দেওয়ান বংশ শাক্ত সঙ্গীত রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়, তৎপুত্র নন্দকিশোর রায় এবং রঘুনাথ রায় সকলেই শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তেজশ্চন্দ্র মহারাজের গুরু ও সভাসদ ছিলেন সাধক কবি কমলাকান্ত। মহাতাবচাঁদ মহারাজ মাতৃকা-ধ্যানগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। নাটোর-কেন্দ্রের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ রামকৃষ্ণ ছিলেন এই কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক; তিনি নিজে সিদ্ধ সাধক ও সুকবি। কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াও এই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া শক্তি-প্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা ও মহারাজদের

প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও প্রেরণায় শক্তি সাধনা ও শাক্তসঙ্গীত রচনার প্রভাব এদেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কবিদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ভক্ত ও সাধক। তাই ইহাদের রচনায় আন্তরিকতার সুরটিই প্রধান। সাধন-মার্গের গূঢ় ইঙ্গিতগুলিও ইঁহাদের গানে প্রমূর্ত্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শাক্ত গীতির রূপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কোন কবির আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। দেশময় কুরুচি-বিলাসের উদ্দাম লীলা চলিয়াছিল। কোম্পানীর বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন অভিজাত রাজা-মহারাজের রাজত্ব নিলামে উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল—অখণ্ড জমিদারী ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতেছিল। এই সুযোগে নামহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, বহু ব্যক্তি রাতারাতি জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং হঠাৎ বাবুর দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের অনেকেরই না ছিল চারিত্রিক আদর্শ, না ছিল উন্নত লক্ষ্য। প্রাণহীন বিলাস, বাবুয়ানা, মেজাজ ও আমোদ সম্বল করিয়া ইঁহারা দেশের কর্ণধার হইয়া উঠিতেছিলেন। এ দেশের সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্বও পড়িয়াছিল ইঁহাদের উপর। ফলে উন্নত ধরণের কোন কাব্য-সাহিত্যই এ যুগে রচিত হইতে পারে নাই। চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণ-কাশীদাস সবিত বাঙলা ভাষার তখন অত্যন্ত দুরবস্থা।

এই যুগের কাব্য-সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন কবিওয়ালা, টপ্পাওয়ালা, পাঁচালীকার, যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি। যুগটি ছিল আসর-সঙ্গীতের যুগ। বড় লোকের গৃহে, গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মজলিসে আসর করিয়া ওস্তাদী গান—আখড়াই এবং কবির গাহনা হইত। কোন শুভকার্য্যে বা উৎসব উপলক্ষে বর্দ্ধিষ্ণু লোক বাড়িতে এই সব গান বসাইবার নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। আশে-পাশের সহস্র সহস্র লোক সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিন্তু এই সকল গানে উন্নত ধরনের কবিত্ব কিছুই থাকিত না। ভাব অপেক্ষা বাক্য-কৌশল ছিল কবিত্ব-বিচারের মাপকাঠি; সস্তা চটকদার কথায় লোকের মন আকৃষ্ট হইত এবং বাহবার সাড়া পড়িয়া যাইত। লোকে স্থূল ছাড়া কিছু বুঝিতে চাহিত না: "There was hardly any leisure for serious writing , what was wanted was trifles capable of affording excitement, pleasure and song' (Dr S. K. De)

এই রুচি-বিকৃতির যুগে শাক্ত সঙ্গীতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শাক্ত সঙ্গীত তখন এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, কবিওয়ালা, আখড়াই-গায়ক, পাঁচালীকার, যাত্রাওয়ালা—সকলকেই এই গানগুলিকে গাহনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। আখড়াই গানের আরম্ভই হইত দেবী-বিষয়ক মালসী গান গাহিয়া, কবিওয়ালারাও গুরুবন্দনার পরিবর্ত্তে ভবানী-বিষয়ক গান গাহিতেন। পাঁচালীকার এবং যাত্রাওয়ালারা আগমনী ও বিজয়ার পালা গান করিতেন। 'চণ্ডীযাত্রা' জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।

কিন্তু কবিওয়ালাদের হাতে পড়িয়া শাক্ত সঙ্গীতের রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। শ্রোতার মুখ চাহিয়া ইঁহাদের গান গাহিতে হইত, শ্রোতাদের রস-পিপাসা মিটাইতে হইত: শ্রোতৃবর্গ সাধন-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, সূক্ষ্ম রুচি-বোধও তাহাদের মধ্যে ছিল না। অতএব কবিয়ালগণও সাধন-তত্ত্বের দিকে না গিয়া 'লীলা'-গানের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ধর্ম্মবিষয়কে মানবীয়ভাবে পূর্ণ করিয়া, অতি সাধারণ ভাবের তন্ত্রীতে ঘা দিয়া তাঁহারা রসসৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন। মানবজীবনের বহুবিচিত্র রস স্থূলভাবে গানে গানে রূপ ধরিত। সস্তা অলঙ্কার, কিছুটা আবেগ, স্থূল রসিকতা—এইগুলিই ছিল রস-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

কবিওয়ালা বা যাত্রাওয়ালা, কিংবা টপ্পা-গায়কদের অধিকাংশই ছিলেন পেশাদার গায়ক। জন-চিত্তানুরঞ্জন করাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য। তাঁহারা যে উন্নত দরের ভক্ত ছিলেন, তাহাও বলা যায় না। এই জন্যই ইঁহাদের গানে ভক্তি অপেক্ষা মানবজীবনের সুরগুলি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বেশির ভাগ গায়ক আগমনী ও বিজয়ার গানই গাহিয়াছেন। লীলার স্তর অতিক্রম করিয়া দুরূহ সাধন-রাজ্যের কথা তাঁহারা বলেন নাই। ইঁহাদের স্মৃতি ও শ্রুতি-জ্ঞান স্বাধ্যায়-প্রসূত নয়। কবিওয়ালাদের মধ্যে কেহই পাণ্ডিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নহেন। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান লোক-প্রচলিত শাস্ত্রজ্ঞান। এই জন্য ইঁহাদের সঙ্গীতে গভীর ধর্ম্মভাব বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই। অবশ্য সকলের সম্পর্কেই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। পাঁচালীকারদের মধ্যে অনেকেই ভক্ত, পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন। পাঁচালীকার দাশরথি রায়, রসিক রায় একাধারে কবি, সুগায়ক, ভক্ত ও পণ্ডিত।

লোক-সঙ্গীতের পরিবেশকবর্গের হাতে শাক্ত গানগুলির নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল: (১) আগমনী ও বিজয়া গানের প্রাধান্য (২) সঙ্গীতগুলিতে পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম ও কৌতুকোজ্জ্বল ঘটনার সমাবেশ (৩) আন্তরিক ভক্তিভাব অপেক্ষা স্থূল আবেগ-প্রবণতা (৪) সন্তান ও জননীর মধ্যে বলিষ্ঠ মানাভিমান,

অনুযোগ-অভিযোগের পরিবর্তে আবেগোচ্ছল দুর্ব্বল ভাবালুতা (৫) সামাজিক চিত্র অপেক্ষা পারিবারিক চিত্রগুলির বিস্তার (৬) সহজ ও সাধারণ অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ-বাহুল্য এবং (৭) বিবিধ রাগ-রাগিণীর সমারোহ।

এই ধরনের শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে—কবিওয়ালা হরু-ঠাকুর, এ্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গি, রাম বসু—টপ্পা-গায়ক নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী-মির্জ্জা—পাঁচালীকার দাশরথি রায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস দত্ত এবং যাত্রাওয়ালা মদন মাষ্টার, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের গান যে শ্রোতার হৃদয়ে কিরূপ বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। শত সহস্র শ্রোতা পরিবেষ্টিত গীতের আসরে ইঁহারা গান গাহিতেন; কি নগরে, কি পল্লীতে সর্ব্বত্রই এই সকল গীতের সমাদর ছিল। গান শুনিয়া লোকের আমোদের পরিসীমা থাকিত না। কোন কোন আসরে এত লোক জমিত যে পিপীলিকা চলিবার স্থান পর্য্যন্ত থাকিত না। আগমনী বা বিজয়ার গান শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যুগপৎ করুণ ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইতেন। "সেই মূর্ত্তিমান রাগপূরিত চমৎকার সুর ও অপূর্ব্ব গাহনায়, বাহবার চোটে বাড়ীর থাম যেন কাঁপিয়া উঠিত, বাড়ী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত।"[১]

ইউরোপীয় কাব্যকলার স্পর্শে শাক্ত গীতিকার রূপান্তর

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট। এই শতাব্দীতে ইউরোপীয় কাব্যকলার সংস্পর্শে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য নব-কলেবর ধারণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে বাঙলাদেশের চিরাচরিত কাব্যের বিষয় ও রচনা পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কারিগরিতে 'জলে স্থলে তরী চলে', এক প্রান্তের সংবাদ মুহূর্ত্তে অন্য প্রান্তে গিয়া পৌঁছায়। ইহা যেন এক অপার বিস্ময়! ইউরোপীয় জাতির ঐহিক সমৃদ্ধি, তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা, তাঁহাদের স্বজাতি-প্রীতি ও ব্যক্তিত্ব চমকপ্রদ। এই চমকপ্রদ বিস্ময়-বিমূঢ়তার মুহূর্ত্তে বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্যভাবকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিবার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল। সাহেবী-কায়দায় দুরস্ত 'বাবু' সমাজের সৃষ্টি এই অনুকরণের ফল। 'বাবু'দের পরানুকরণ-প্রবৃত্তি, ইংরাজি বুলি, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা।

১। অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই সঙ্কটকালে দেশের ধর্ম্ম, কাব্য, দেশীয় রীতি-নীতির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে সংরক্ষণ ও সমন্বয় দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একদিকে দেশীয় ভাবরক্ষার দাবি, অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা। এ দেশের কাব্য-সাহিত্যে এই দুই ভাবের প্রতিফলন দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

যে কাব্য-সাহিত্য ছিল একান্তভাবে দেব-নির্ভর, পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে তাহাতে মানবোচিত ভাব প্রবিষ্ট হইল। মানব-জীবনের সুখদুঃখের বিচিত্র সুর কাব্যের মধ্যে গভীরভাবে বাজিয়া উঠিল। বিচার, বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা এদেশীয় কাব্য-সাহিত্য নব কলেবর ধারণ করিতে লাগিল।

প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও কাব্যে নূতনত্ব দেখা দিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের স্থলে নূতন ধরনের মহাকাব্য রচিত হইল। সর্ব্বোপরি কাব্যদেহে নব আত্মসচেতনতার স্পর্শ সঞ্চারিত হইল। ফলে এ দেশের সাহিত্যে নূতন ধরনের অন্তরঙ্গ গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত হইল। পূর্ব্বে চর্য্যাপদাবলীতে বা বৈষ্ণবপদাবলীতে বা শাক্ত-গীতাবলীতে সম্প্রদায়গত চেতনার প্রভাবে যে গোষ্ঠি-নিষ্ঠা বর্ত্তমান ছিল, তাহার স্থলে ব্যক্তিগত মননের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে এদেশে বাঙলা নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই নাটকে গীতিরসের প্রাচুর্য্য লইয়া ক্রমে 'অপেরা'-জাতীয় গীতাভিনয় রচিত হইতে লাগিল।

নূতন নূতন সাহিত্য-রচনার প্রেক্ষাপটে শাক্ত সঙ্গীতেরও বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কবিওয়ালাদের সময় হইতে কাব্যে যে মানবীয় ভাবরসের পরিবেশন সুরু হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। উমা ও মেনকার কাহিনী লইয়া প্রচুর গীতাভিনয় ও যাত্রা রচিত হইল। নব পদ্ধতির যাত্রাগানে নব ভাব ও রসের শাক্ত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইল। মনোমোহন বসু নাটকের মধ্যে যে ভক্তি-রসের প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে যাত্রার গানগুলির মধ্যেও সংক্রামিত হইল। সর্ব্বোপরি ব্যক্তি-মানসের মনন-ক্রিয়ায় সঙ্গীত-দেহে গীতিকবিতার দ্যুতি ঝলমল করিতে লাগিল।

এই সময়ে পরানুকরণের প্রবৃত্তি হইতে আত্মসংরক্ষণের চেষ্টায় এদেশীয় লোকের মধ্যে দেশীয় দ্রব্যের প্রতি যে মমত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহাতে মায়ের প্রসাদ শাক্তপদাবলীও অবহেলিত হয় নাই। যে সঙ্গীতগুলি অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তিনি সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাবচাঁদ সাধক কবি

কমলাকান্তের পদাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্ত্য অভিব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে 'দশমহাবিদ্যা'-রূপগুলির নূতনতর ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শক্তি-মূর্ত্তির নূতন নূতন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতরচনায় শাক্ত গীতি স্বদেশপ্রীতির প্রেক্ষাপটে নূতন তাৎপর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

শাক্ত ভাবের এই পুনর্জাগরণের দিনে আবির্ভূত হইলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি আজন্ম সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার আকুল করা 'মা মা' ধ্বনিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের মত পদাবলী আস্বাদন করিয়া তিনি শাক্ত সঙ্গীত রচনার বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁহার বহু সংখ্যক নাটকে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত যোজনা করিয়া দেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজেও মাতৃ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনার প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবি, যাত্রাওয়ালা ও নাট্যকার শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ছিলেন কবিদলের বাঁধনদার। তাঁহার শক্তি বিষয়ক পারমার্থিক সঙ্গীতগুলি সুন্দর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিগণও শাক্তপদাবলী রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অতি সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাতৃ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

এই সময়ে কতিপয় সাধক কবিরও আবির্ভাব হইয়াছিল। আন্দুলের মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ছিলেন সাধক, ভক্ত, প্রেমিক। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্দুলে 'কালীকীর্ত্তন' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বগুড়া-সেরপুরের ভক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরীর মাতৃ-সঙ্গীত সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বিপুল উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার 'বাউল' গানের ধরনে মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে সংখ্যাহীন মাতৃপদাবলী রচিত হইয়াছে। খ্যাতনামা এবং অজ্ঞাতনামা শত সহস্র কবির রচনায় শাক্তপদরত্নভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমরা কতিপয় কবির পরিচয় ও কাব্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি মাত্র।

॥ দুই ॥

মাতৃ-সাধক ও ভক্ত কবি

রামপ্রসাদ

শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। ভারতীয় ঋষিগণ যে অর্থে 'কবি' সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই অর্থেই তিনি কবি। কবি সিদ্ধপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা—তিনি ঋষি। তাই তাঁহার ধ্যানে যে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাহা অপৌরুষেয়। তাহা যেন মানুষের রচনা নয়, অলৌকিক। সে মন্ত্রের শক্তি ও বিভূতি অসাধারণ। এইজন্য ঋষিরা বলিলেন, 'কবির্মনীষা'—কবিই জ্ঞানী। যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারাই জ্ঞানী, তাঁহারাই কবি। এই অর্থেই রামপ্রসাদ কবি।

রামপ্রসাদের পূর্ব্বে অনেক মহাপুরুষ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সাধক-পণ্ডিতও বাঙলা দেশে অনেক আবির্ভূত হইয়াছেন। মেহারের সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, মিতরার রাঘবরাম, ঢাকার রত্নগর্ভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেহ এক রাত্রিতে দশমহাবিদ্যার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ পরাশক্তিকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, কেহ বা সাধন-বলে মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তান্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ তান্ত্রিক সাধনার পুঁথি লিখিয়া অমর হইয় আছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণ সাধনার সিদ্ধি ও ফলকে হয় গোপন রাখিয়াছেন, নয় সংস্কৃতের বন্ধনে সেই শাম্ভবী বিদ্যার আনন্দকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেখানে সিদ্ধির আনন্দ ও সিদ্ধি লাভের সঙ্কেতকে গৌড়ীয় ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া গৌড়জনের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অকৃপণ দানে বাঙলাদেশ ধন্য হইয়াছে।

শক্তি-বিষয়ক কবিতা ও কাব্য পূর্ব্বে রচিত হইলেও, রামপ্রসাদের গানের মত তাহা এমন করিয়া মানুষকে মাতাইতে পারে নাই। একদিন মহাপ্রভুর অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদাদিযুক্ত উদ্দণ্ড কীর্ত্তন যেমন করিয়া বঙ্গবাসীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, রামপ্রসাদের 'মালসী'ও তেমনি এ দেশের শিরায় শিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছে। এই দিক হইতে রামপ্রসাদ হইতেই শ্যামাসঙ্গীতের সম্যক স্ফূর্ত্তি। রামপ্রসাদ শাক্তপদতরঙ্গিণীর গোমুখী।

বন্ধুবর ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিখ্যাত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'[১] গ্রন্থে রামপ্রসাদ-সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। আগ্রহবান পাঠক তাহা পাঠ করিবেন। আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আনুমানিক দ্বিতীয় দশকে রামপ্রসাদ হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়া'—তৎসুত রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের বংশ বংশপরম্পরায় মায়ের কৃপাধন্য; পিতার প্রতি যেমন অভয়া সদয় ছিলেন, তেমনই পিতামহ রামেশ্বর ছিলেন 'দেবীপুত্র'। কবি হয়তো 'গণ্ডযোগে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবেই মাতৃহীন হন। তাঁহার বিমাতা ছিল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম নিধিরাম।

রামপ্রসাদের জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টায় যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও লৌকিক-অলৌকিক জনশ্রুতি মিশানো। ইহা হইতে জানা যায়, রামপ্রসাদ প্রথমে কোন জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরীর কার্য্য করিতেন। কিন্তু মন তাহার মুহুরীর কাজে নয়, মায়ের চিন্তায় বিভোর। তাই তাঁহার হিসাবের খাতা মায়ের সঙ্গীতে ভরিয়া উঠিত। 'আমায় দাও মা তবিলদারী' গান নাকি এই সময়ের রচনা। জমিদার ইহা জানিতে পারিয়া রামপ্রসাদকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি দেন এবং বৃত্তি দিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দেন।

দেশে আসিয়া রামপ্রসাদ নিজ গৃহে মায়ের ধ্যানে তন্ময় হন এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি এই যে, কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ্ঞায় তিনি কালিকামঙ্গল 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। রাজসভার কবিরূপে তাঁহার আহ্বান আসে, কিন্তু রামপ্রসাদ সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি, বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি দান করেন।

রামপ্রসাদের নামে আর একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা 'কালীকীর্ত্তন'। দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের অনুজ্ঞায় তিনি এই 'কালীকীর্ত্তন' রচনা করেন। গ্রন্থখানি কবিগানের চঙে লেখা। কেহ কেহ বলেন, রামপ্রসাদের একটি খেড়ুগানের দল ছিল—সেই খেড়ুর দলের গান হিসাবে হয়তো কাব্যখানি রচিত। অযোধ্যা গোস্বামী বা আঁজু গোঁসাইর সঙ্গে যে তাহার 'কবির লড়াই-এর ধরনে লড়াই হইত, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

রামপ্রসাদ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যু সময় আসন্ন জানিয়া

১। দ্রষ্টব্য ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

তিনি গঙ্গাজলে অবতরণ করেন এবং বক্ষজলে দাঁড়াইয়া, 'ওমা, আমার দফা হল রফা' গানটি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়।)

জীবনের এই সকল ঘটনা এবং তাঁহার রচিত কাব্য দিয়াই রামপ্রসাদকে বিচার করিতে হইবে।

রামপ্রসাদ গৃহী সাধক। পত্নী, পুত্র, কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার। কন্যার জামাতার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সকলের সঙ্গেই স্নেহের সম্পর্ক। পারিবারিক এই মমত্ববন্ধন কবির নিকট বন্ধনমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই, তাহার কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির স্নিগ্ধচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতিও তিনি অন্ধ ছিলেন না: জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি জীবনের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মাটির বন্ধন তাঁহার নিকট মা-টির বন্ধন। আনন্দময়ী মায়ের অনুধ্যানে সহস্রারে মন রাখিয়াও তিনি বাস্তবকে বিস্মৃত হন নাই: বাস্তব সুখ দুঃখের বিচিত্র মূর্চ্ছনা তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার সুরে অপরূপ ঝঙ্কার তুলিয়াছে। জীবনের গ্লানি-মালিন্যের মধ্যে মাটির সম্পর্ক, বাস্তব অনুভূতি তাঁহার গানে করুণ মধুর সুরে রণিয়া উঠিয়াছে। মায়ের স্নেহ, সন্তানের আকুল আর্তি, নিষ্পেষিত জীবনের আর্তনাদ রামপ্রসাদের কবিতায় যেমন করিয়া মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে, এমনটি আর কোথায়? রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি গৃহী অথচ ত্যাগী, তিনি ভোগী অথচ যোগী। তান্ত্রিক সাধনার এই বিচিত্র সমন্বয়ের মর্ম্মবাণীই তাঁহার কবিতার মর্ম্মব[illegible]।

রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন প্রথম বয়সে। কালিকামঙ্গলেও কবির কবিত্ব ও সাধকত্ব প্রস্ফুট। সাহস করিয়া তান্ত্রিক শব-সাধনার কথা ভাষায় রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই, কবি সেই দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন। "বিষম বিষয় কালসর্প নিয়ে খেলা',—সেই কালসর্প লইয়াই তিনি খেলা করিয়াছেন। এ 'অসম্ভব সাহস' একমাত্র শক্তিসাধকেরই আছে, তাই শক্তি-সাধক 'বীর', 'বীরাচারী'। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গলে এই বীরাচার এই পার্থিব ভোগের সাধনা। এখানে শৃঙ্গারাত্মক মাল্যরচনা, যার 'দৃষ্টি মাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভাব', এখানে 'কামকলা'র পূজা, ঐহিক সুখ-কামনা।

তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে 'এহোত্তম', কিন্তু তন্ত্রের শেষ লক্ষ্য, 'তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্'। রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলীতে সেই অতি সুন্দর দিব্যভাবেরকথা। রাজসিক স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক এখানে সাত্ত্বিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে রাজসিক ভাবে অনাস্থা, স্থূলের প্রতি বিরক্তি। এই স্তরের শেষ কথা,—

মন, তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥

রামপ্রসাদ কালীকীর্তন রচনা করেন পরের গরজে, দেওয়ানের অনুজ্ঞায়। তাই কবি এখানে জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, চিকিৎসক বৈদ্যের মত কালীকীর্তনরূপ আধ্যাত্মিক দাওয়াই 'মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন' তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন হৃদয়ের আবেগে, নিজের গরজে। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত সুতীব্র অনুভূতির স্পর্শে এই সঙ্গীতগুলি প্রাণময়। ইহাতে কেবল নিজের কথা, প্রাণের কথা। 'আয় মা দুটো কথা বলি'—ইহাই এ সঙ্গীতের প্রধান রাগ।

এইজন্যই রামপ্রসাদের 'মানসী' একান্তভাবে আত্মভাষণ, গীতিকবিতার মন্ময়তায় বিহ্বল। আবেগে-আবেদনে, অনুরাগে-অভিমানে, অনুযোগে আত্মনিবেদনে সর্ব্বত্রই এই মন্ময়তা। এমন কি শব্দপ্রয়োগ পর্যন্ত মনোভাবের প্রখরতাব্যঞ্জক। এই দিক হইতে রামপ্রসাদের মায়ের গান এক-একটি সুডোল গীতিকবিতা।

এ কথা সত্য যে, রামপ্রসাদের গান তত্ত্ব-প্রধান। আলঙ্কারিকের বিচারে এগুলিকে 'চিত্র-কাব্য' বলাই সঙ্গত, হয়তো অনেকে বলিতে পারেন, এই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্ম্মমতের প্রচার, অতএব শিল্প-বিচারে গানগুলিকে বড়জোর অধ্যাত্ম-সঙ্গীত বলা চলে, কোনক্রমেই রস-প্রধান কবিতা বলা চলে না। 'ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল। মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো'—এ তো সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বকথা। তত্ত্বই যেখানে লক্ষ্য, রস নয়—রস-সৃষ্টিও নয়, তাহা অকাব্য তো বটেই। কিন্তু 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। রামপ্রসাদ সম্পর্কে এহেন মতবাদ সকলেই পোষণ করেন না। রামপ্রসাদের কতকগুলি সঙ্গীত কঠিন আবরণ-বিশিষ্ট নারিকেলের মত, খোলস ছাড়াইবার কৌশল না জানিলে তাহাদের সুমিষ্ট আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কবি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া Sister Nivedita বলিয়াছিলেন, : 'It takes the whole history of Rome and Florence to make the Divinia Comedia comprehensible. In fact we can never

understand any poet without some knowledge of the culture that produced him.'—রামপ্রসাদের কবি-প্রকৃতি যে সংস্কারদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সংস্কার, সেই ধর্ম্মের সহিত পরিচয় না থাকিলে রামপ্রসাদের পদাবলী অর্থহীন, কবিত্বহীন বলিয়া মনে হইবেই। কিন্তু যাঁহারা সেই সংস্কারের সহিত পরিচিত, তাঁহারা বলিবেন: It is not transcendental, nor beyond the sphere of artistic expression, because the inspired artist makes us feel the reality and universality of his individual passion, and the mystery of his mystery stands clear and visible in its own familiar light before our eyes.'[১]

অন্য একজন সমালোচক বলেন: 'রামপ্রসাদের ভক্তি-প্রগাঢ়তা বেদান্ত ও আগমের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রকটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা সে গভীরতায় ডুবিতে পারেন, তাঁহারা সেই সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হন। দেখেন কত ভাব কত অল্প কথায় কেমন সুন্দর ভাবে প্রকটিত।'[২]

কোন কোন আচার্য্য রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃত সাধক সম্পর্কে এ অভিযোগ অলীক। সত্যকারের সাধকের দৃষ্টিতে 'স্বদেশোভুবনত্রয়ম্', তাঁহার হৃদয় উদার, তিনি সম্বিদগ্নিতে মায়ামোহকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন—তাঁহার মনে কখনও ভেদবুদ্ধি, দ্বেষাদ্বেষি থাকিতে পারে না। সাধনার চরমস্তরে পৌঁছিয়া যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কাছেই শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য একাকার হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিকট কালা ও কালী, রাধা ও শ্যামার কোন পার্থক্যই থাকে নাই, শিব-শক্তিও তাঁহাদের নিকট অর্দ্ধনারীশ্বর। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির অতীত হইয়া বলিয়া উঠেন,

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।

রামপ্রসাদের গানেও এই পরম উদারতার ভাব। বৈষ্ণব-বিদ্বেষবশতঃ তিনি শ্যামাকে দিয়া রাসনৃত্য করান নাই। হর-গৌরীর রাস বা হিন্দোল এদেশে প্রচলিত ছিল (দ্রষ্টব্য—কর্পূরমঞ্জরী নাটক—রাজশেখর); হর-গৌরীর হিন্দোল-লীলার প্রাচীন

১। Bengali Lit. in the 19th Century—Dr. S. K. De.
২। রামপ্রসাদ—পূর্ণচন্দ্র বসু

প্রথা অনুসরণ করিয়াই রামপ্রসাদ 'কালী-কীর্ত্তনে' ভগবতীর রাসলীলা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদ ছিলেন পরম কৌল। কুলচূড়ামণিতে তান্ত্রিকের আচার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'উদারচরিত্রঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ'—তান্ত্রিক উদারচরিত্র ও বৈষ্ণবাচারসম্পন্ন হইবেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষবশতঃ নয়, উদারতাবশেই রামপ্রসাদ কালীর কালাভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ রামপ্রসাদের গানে বিদ্বেষ নাই, প্রচারের উগ্রতাও নাই। উদার মৈত্রী-বুদ্ধিতে বিশ্বভুবনের দিকে তাকাইয়া তিনি সব শ্যামাময় দেখিয়াছেন। ষড়্দর্শনে যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, প্রগাঢ় ভক্তির বলে তিনি তাঁহাকে দেহস্থ ষট্চক্রে আপন করিয়া পাইয়াছেন। মা-পাগল সন্তানের মত মায়ের সহিত তিনি কথা কহিয়াছেন, তাঁহার কাছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সিদ্ধির আনন্দে বিভোর হইয়া, সাধন-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তিনি অনন্ত শক্তিময়ীর সম্মুখেও উদ্ধত সন্তানের মত তেজ দেখাইয়াছেন। ইহাই 'প্রসাদী সঙ্গীত', 'প্রসাদী সঙ্গীত' মায়ের প্রসাদ—পবিত্র, নির্ম্মল, সবল ও আন্তরিক। ইহা শাক্তপদাবলীর 'আদিগঙ্গা হরিদ্বার'। শাক্তসঙ্গীতের যাবতীয় সম্ভাবনা, সৌন্দর্য্য ও শক্তি, বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য ইহাতে নিহিত। আগম-তন্ত্রের গুপ্ত সাধন-সঙ্কেতকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া রামপ্রসাদ ভগীরথের মত শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকে বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াসে মৃত জীবনে জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে, নিপীড়িত মানব স্বীয় মনোবেদনা মাতৃচরণে নিবেদন করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাঁহারই দৃষ্টান্তে সহস্র প্রাণে সহস্র গান হিল্লোলিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদের সাধনায় যেন সমগ্র দেশ-দেহের সুপ্ত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হইয়াছে : এই কুণ্ডলিনীর মত্তালির মত মধুর শ্বাসোচ্ছ্বাস শাক্তপদাবলীর সুমধুর সঙ্গীত-লহরী।

আঁজু গোঁসাইয়ের মত শ্রদ্ধাহীন সমালোচক রামপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে পারেন,—

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি।

কিন্তু রামপ্রসাদের মত শ্রদ্ধাশীল ভক্ত সাধক অনন্ত মাতৃ-নির্ভরতায় বলিবেন,—

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মিলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে ডুব দিয়ে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে॥

রামপ্রসাদ নিজে এই বস্তু আহরণ করিয়াছেন, সে সম্পদ বঙ্গবাসীকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাই বাঙালীর কণ্ঠে অতীতেও যেমন বাজিয়াছে রামপ্রসাদের গান, আজও যেমন ধ্বনিত হইতেছে তাঁহার সঙ্গীত-লহরী, ভবিষ্যতেও তেমনই ঝঙ্কৃত হইবে তাঁহারই পরম আত্ম-নিবেদনের সুর :

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত॥

কমলাকান্ত

শাক্তপদাবলীর অন্যতম প্রধান কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কমলাকান্তও অতি উচ্চস্তরের শক্তি-সাধক এবং কবি। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকা-কালনা ইঁহার নিবাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর, মাতার নাম মহামায়া, পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতুলালয় চান্নায় চলিয়া আসেন। চান্নার প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরেই তাঁহার সময় কাটিত। মায়ের প্রেমে তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এইখানেই কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক তাঁহাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেন। সাধন-বলে তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেন। গোপকন্যার বেশে ও নারী বাগ্‌দীর বেশে দেবী তাঁহাকে দেখা দেন। এইরূপে সাধক কমলাকান্তের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের সাধন-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি তেজশ্চন্দ্র মহারাজের 'গুরু' ছিলেন, কেহ বলেন—তিনি ছিলেন মহারাজের 'আশ্রিত' কবি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কমলাকান্ত অম্বিকা-কালনা হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। বর্দ্ধমানের অনতিদূরে কোটাল-হাট নামক স্থানে তাঁহার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হয়। সাধক কবি এইখানেই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, পঞ্চমুণ্ডির আসনে মাতৃসাধনা করিতেন। এই সাধন-আসনেই তিনি দেহরক্ষা করেন। কমলাকান্তের দেহ রক্ষার কাহিনীও অলৌকিক।

কমলাকান্তের সাধনা ও কবিত্বের খ্যাতি পূর্ব্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত আছে, অম্বিকা-কালনায় বসবাস করিবার সময়েই তেজশ্চন্দ্র মহারাজের অন্যতমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মহারাজ প্রতাপচাঁদ ইঁহার সবিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মহারাজ মহাতাবচাঁদ কমলাকান্তের

স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে প্রায় আড়াই শত মাতৃপদাবলী মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। [১]

মাতৃভাবের পারমার্থিক সঙ্গীত রচনায় সাধক কবি রামপ্রসাদের পরেই কমলাকান্তের স্থান। শ্যামা মায়ের প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তি ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের নিদর্শন হিসাবে কমলাকান্তের সঙ্গীতগুলি পরম আদরের সামগ্রী। হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে সঙ্গীতগুলি পরিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার মাতৃগীতি হৃদয়গ্রাহী। কমলাকান্তের সঙ্গীতে যে স্নেহ, যে আবদার, যে মান-অভিমানের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যে কোন মানুষের হৃদয়েই তাহা গভীর রেখাপাত করে। রামপ্রসাদ মায়ের গান গাহিয়া প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় অস্থির নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্তরকে অভিভূত করিয়াছিলেন কমলাকান্ত মাতৃসঙ্গীত দ্বারা হিংস্র, জিঘাংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর দস্যুদলের হৃদয় মোহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে শিষ্যবাড়ী হইতে চান্নায় ফিরিবার পথে তিনি দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং তাহার গান শুনিয়া দস্যুর হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া যায়। ঐকান্তিক ভক্তি এবং প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বিগলিত বলিয়াই ভক্তসাধকদের সঙ্গীতের এই অসাধারণ শক্তি।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য, শাক্ত পদাবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যেও সেই পার্থক্য। একজন ভাবতন্ময়, আত্মহারা—অন্যজন সচেতন শিল্পী, একজন সরল, অনাড়ম্বর—তাহাতে ছন্দোনৈপুণ্য নাই, বাকচাতুরী নাই—আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারা ভাব; অপরজন আত্মমগ্ন হইলেও আত্মহারা নহেন, তাহার বিচার আছে, সংযমবোধ আছে—তাই ছন্দের মাধুরী, শ্রুতিমধুর শব্দ-ঝঙ্কারের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি, 'রসনা-রোচন, শ্রবণ-বিলাস, রুচির পদ'-এর প্রতি আকর্ষণ।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মাতৃপদাবলী কয়েকটি দিক হইতে সাধারণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও গুরুতর। শক্তি-সাধনার নানা স্তর আছে। রামপ্রসাদ সিদ্ধির যে উর্দ্ধস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কমলাকান্ত হয়তো ততদূর পৌঁছিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ মাতৃ-সাধনার সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই 'এবার কালী তোমায় খাব' বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। যে সাধন-শক্তি আয়ত্ত হইলে সাধক লয়মুক্তি লাভ করিতে পারেন, রামপ্রসাদ তাহার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি লয়মুক্তি কামনা করেন নাই, বলিয়াছেন, 'নির্ব্বাণে কি ফল বল না'

১। সাধকপ্রবর ভুলুয়াবাবার শ্রীশ্রীসদ্ভাব তরঙ্গিণী (১ম খণ্ড) গ্রন্থে কমলাকান্তের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অথবা 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।' কমলাকান্ত এই 'চিনি খেতে ভালবাসি'র স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, তদূর্দ্ধে উঠেন নাই। তাঁহার 'মজিল মন-ভ্রমরা কালী-পদ নীলকমলে'—পদটিতে মাতৃ-চরণ-কমল মধু পানের আবিষ্টতা ও তদ্গতচিত্ততার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

সন্তান বলিয়া মায়ের উপর জোর জবরদস্তিতে রামপ্রসাদের অন্য প্রকারের। যে শক্তির নিকট তাঁহার আত্মসমর্পণ, সেই শক্তি যেন সাধন বলে তাহার করতলগত। তাঁহার অন্তরে শক্তির দৃপ্ত বিকাশ। তাই মায়ে পোয়ে এমন বিবাদ-বিসম্বাদ, এমন চোখ-রাঙানি :

প্রসাদ বলে, হৃৎকমলে বেঁধেছি তোমারে।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন, রামপ্রসাদের গিরে॥

কমলাকান্তের স্নেহের লুকোচুরি খেলা আছে, কিন্তু তাহা একটা উদ্দাম, একটা উদ্ধত নয়। তাহা স্নিগ্ধ, অনেকাংশে প্রশান্ত : তাহাতে যেন বৈষ্ণবোচিত কোমলতা মাখানো রহিয়াছে। কমলাকান্তের অনুযোগ :

জানি জানি গো জননি, যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারি অন্তরে থাক মা আমারে লুকায়ে।

অথবা,

শুনেছি দীন দয়াময়ী লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে॥

কমলাকান্তের শাক্তসঙ্গীতে বৈষ্ণব ভাব অধিক। রামপ্রসাদে বৈষ্ণব প্রভাব গৌণ : তাঁহার ভক্তি, আকূতি, ভণিত শক্তির ছন্দে স্পন্দিত—বলিষ্ঠ, অকুতোভয়। সন্তান হইলেও তিনি 'আটাশে ছেলে' নন। মায়ে পোয়ের দ্বন্দ্ব ও মোকদ্দমায় তিনি নির্ভয়। তিনি 'সিদ্ধ সেবায় বদ্ধ', তাই বলেন, 'ঐ পদে জোর করে ফিরি, থাকি জোরে জোরে।' কমলাকান্তের পদে এ ঔদ্ধত্য নাই। তাহার পদাবলীতে বৈষ্ণব ভাবের বিনতি ও আর্তি। এমন কি কমলাকান্তের ভণিতাগুলির মধ্যেও বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ভণিতার প্রতিধ্বনি বাজে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা যেমন রাধাকৃষ্ণ লীলা-কুঞ্জের দ্রষ্টা, উপদেষ্টা, দূতী বা দাসরূপে লীলা-ভাবনা করিয়া থাকেন, কমলাকান্তও 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র সঙ্গীতে এই ভাব অবলম্বন করিয়াছেন : কখনও মেনকাকে উপদেশ দিয়াছেন, কখনও বা বৈষ্ণব কবি যেমন ভাবে 'যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানুই হাতে দিও, বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়'—বলিয়া দাস্যভাবের কথা বলিয়াছেন, তেমনই ভাবে বলিয়াছেন—

কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—
বোলে যাই আসির ত্রিদিনে।

কখনও বা 'ব্রজবুলি'তেই গাহিয়াছেন,

কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুর সহচরী সঙ্গে,
আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায়॥

অবশ্য সাধক হিসাবে কমলাকান্ত যে স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা দিব্যভাবেরই স্তর। দিব্যমন্ত্রীর পূজা মানস পূজা, দেহ তাহার সাধন ক্ষেত্র, তাঁহার তীর্থস্নান ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার সঙ্গম স্নান। কমলাকান্তের পদে এই সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে,—

(১) আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই কেউ না দেখে॥

( ) আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে।
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥

রামপ্রসাদে যে 'আগমনী' গানের সূচনা, কমলাকান্তে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার। মাতা, পিতা, কন্যা ও স্বামীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কমলাকান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কমলাকান্তের আগমনী গান ভরা-ভাদরের নদীর মত বেগবতী—উচ্ছল, উদ্বেল, তাঁহার 'বিজয়া' সঙ্গীত বিজয়ার সানাইয়ের মত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। কমলাকান্তের 'আগমনী'র—

শরত-কমল মুখে আধ আধ বাণী।
ভবের ভবন সুখ ভণয়ে ভবানী॥

—কেবলমাত্র উপমায় ও অনুপ্রাসে সুন্দর নয়, বুদ্ধিমতী কন্যার চিত্র হিসাবেও অভিরাম। 'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান', 'কি হোলো নবমী নিশি হৈলো অবসান গো', 'ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি'—প্রভৃতি সঙ্গীত বিজয়া-পদাবলীরূপ শতনরীর মণিরত্ন-স্বরূপ।

কমলাকান্ত সাধক হইয়াও সচেতন শিল্পী। সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সোনার কাঠি যে সংযম, তাহা কমলাকান্তের আছে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত সুরে সমর্পিত হইবার অপেক্ষা রাখে, গানে না শুনিলে তাহার অর্দ্ধেক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু কমলাকান্তের পদাবলী গীতিকবিতার মত আস্বাদ্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও

তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভব। সুনির্ব্বাচিত শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কার স্বভাবতঃই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। কমলাকান্ত রচিত—

(১) শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥

(২) মজিল মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥

(৩) নব জলধর কায়।
কালোরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥

—পদগুলি সত্যই 'Best words in best order'; এগুলি এক একটি নিটোল গীতিকবিতা। শিল্পীর সৌন্দর্য্য বোধ, সুনির্ব্বাচিত শব্দের প্রীতি অনুরাগ, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য্য কমলাকান্তের এই ধরনের পদাবলীকে গাঢ়বন্ধ, ভাবগূঢ় গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এইখানেই শাক্ত কবি কমলাকান্ত ও বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দদাস কবিরাজ সমধর্ম্মী: উভয়েই ভক্ত অথচ সচেতন শিল্পী।

কমলাকান্ত রাজসভার কবি। কিন্তু তৎকালীন রাজসভার আড়ম্বর-জৌলুষ, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-কলা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের তো কথাই নাই, রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া এড়াইতে পারেন নাই; বিগর্হিত রুচির স্পর্শ তাঁহাদের কাব্যে আছে। কমলাকান্ত এদিক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, অশ্লীলতার সামান্য ছোঁয়াও তাঁহাতে লাগে নাই। গ্রাম্য কবির গ্রাম্যতা-দোষ হইতেও তিনি মুক্ত ছিলেন। রস-বোধ তাঁহার ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া তিনি 'ভাঁড়ামি' বা 'কেচ্ছা' রচনা করেন নাই। কমলাকান্তের মন 'প্রফুল্ল কমলপ্রায়' মাতৃচরণের মধু-লোভী ভ্রমর: 'কামাদি কুসুম সকল' তাঁহার নিকট তুচ্ছ। এমন কি শাক্ত কবিদের অন্যতম বিশিষ্টতা সার্ব্বিক সমাজ চেতনা হইতেও তিনি দূরে অবস্থিত। 'চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে' যে সম্পদ রহিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া তিনি গ্রামীণ জীবনের প্রতিও দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই। রামপ্রসাদের গানের মত পল্লী ও সমাজ-জীবনের বহুবিচিত্র সুর তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত না হইলেও, সুরুচি, সংযমবোধ, ভক্তির নিবিড়তা ও জ্ঞানের প্রহরা কমলাকান্তের রচনায় যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কবিতা গাম্ভীর্য্যের সুদুর্লভ মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই কমলাকান্তের স্বাতন্ত্র্য। সমাজ জীবন নয়, পারিবারিক

জীবন এবং আত্মোপলব্ধির পটভূমিকায় তিনি আগম-নিগমের গূঢ়তত্ত্ব লইয়া উমা ও শ্যামার গান রচনা করিয়াছেন।

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (১৮৪৩-১৯০৮)

হাওড়া জেলার অন্তর্গত পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তটাবস্থিত বহুবিখ্যাত আন্দুল গ্রামে প্রেমিক কবিরত্ন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। মহেন্দ্রনাথ শৈশবে পিতার চতুষ্পাঠিতে পাঠারম্ভ করিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হয় এবং তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। স্থানীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য লইয়া তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু শিক্ষক হইলেও সাধক বৃত্তি প্রবলতর ছিল বলিয়া, অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন।

মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যকারের ভক্ত সাধক। তিনি গৃহী হইলেও গৃহের আকর্ষণ তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। স্বগৃহের পূজা-মণ্ডপে তিনি অহরহ মাতৃ আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তিনি বীরভূমের 'জটেমার' নিকট শাক্তাভিষিক্ত এবং কলাবধূত পূর্ণানন্দনাথের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের সমগ্র লক্ষণ মহেন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনায় দিব্য সাধকের আকৃতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্রনাথ সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্যাস ও নাটকও আছে। তাঁহার সঙ্গীত লইয়াই শিবপুরের 'বাউল সম্প্রদায়' এবং আন্দুলের 'কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত হয়। কবি গানের মধ্যে নিজের ভণিতা দিতেন না, কিন্তু বন্ধু ও অনুরাগীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পরে স্বরচিত গীতাবলিতে 'প্রেমিক' ভণিতা দিয়াছেন।[১]

'প্রেমিকে'র গান প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ, ভক্তের নিকট ইহা চির সমাদরের সামগ্রী। প্রেমিক মাতৃপ্রেম-পাগল সন্তান, মায়ের নামে তিনি আত্মহারা, মাতোয়ারা: 'যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বলব কালী কালী'। সুধাভরা মাতৃ-নামের মহিমায় পাগল বলিয়াই প্রেমিকের গানে গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। 'পারি না ক্ষ্যাপা মায়েরে ক্ষ্যাপার মত না ক্ষেপিলে'—ইহাই প্রেমিকের

১। দ্রষ্টব্য 'আন্দুল কালীকীর্ত্তন'-এর ভূমিকা

অভিমত। মা ভাবের অধীন, প্রেম পাগলের অধীন। আসল পাগল হইলে মা অবশ্যই কৃপা করেন—এই দৃঢ় প্রতীতিতে কবি প্রতিষ্ঠিত।

প্রেমিকের সঙ্গীতাবলীতে অভিমান ও অনুযোগের সুরটি যেমন চড়া, আত্ম-নিবেদনের সুরটিও তেমনই গভীর। তিনি একদিকে যেমন মাকে অনুযোগ করিয়া বলেন, 'ব্যাভাবেতে জান। গেল, তুমি যে অতি কৃপণা', যেমন অভিমান করিয়া বলেন, 'কি ব'লে তনযে বে'দ সাজালি?'—তেমনই তাবার অসীম মাতৃ-নির্ভরতায় বলিযা উঠেন,—

মান-অপমান সবই সমান মাথায দিযে জলাঞ্জলি।
সার করেছি বাঙ্গা চরণ ভবের কথায আর কি ভুলি?

কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। আগম-তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে তাঁহার অধিকার ছিল। তান্ত্রিক সাধন মার্গের অতি গূঢ় তত্ত্বগুলি প্রেমিকের গানে গানে ভাষারূপ লাভ করিযাছে। কিন্তু তত্ত্বকও তিনি ভক্তি ও ভাব দ্বারা কমনীয করিযা তুলিযাছেন: প্রেমিকের সঙ্গীত নীরস হৃদযেও ভক্তিরসের সঞ্চার করে। তাঁহার 'ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে', 'ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমায কি ভাব দেখাইলি' —গানগুলি জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

গোবিন্দ চৌধুরী

সমগ্র উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গ সাধকপ্রবর গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীত অসীম উদ্দীপনার সঞ্চার করিযাছে। গোবিন্দ চৌধুরী সাধক, ভক্ত, পণ্ডিত ও সুকবি। একাধারে এতগুলি গুণ সন্নিবিষ্ট হওযায চৌধুরী মহাশযের গীতাবলি কেবল ভক্তগণের আদরের সামগ্রী নয, কাব্য রসিকেরও আস্বাদনের বস্তু। তাঁহার গান বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতের মত এমন ভাবপূর্ণ ও কবিত্ব-পূর্ণ পদাবলী সমগ্র শাক্ত গীতি সাহিত্যে সুলভ নয। তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত বলিযা শাক্ত সঙ্গীতাবলীর দুর্নাম আছে, কিন্তু তত্ত্বকে যথাযথ রাখিযাও যে মনোরম, কবিত্বময পদ রচিত হইতে পারে, গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতাবলী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বগুড়া সহরের ছয ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সেরপুর নগরে, ব্রাহ্মণ-বংশে সাধক ভক্ত স্বনামধন্য কবি গোবিন্দ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্যবতী করতোযার তটস্থিত বগুড়া-সেরপুর অঞ্চল সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক—ইহাই

প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের 'পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন'। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই অঞ্চল মাতৃসাধনার বিখ্যাত কেন্দ্র। মাতৃ-পীঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণ-সন্তান সুউচ্চ সাধন রাজ্যের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধক কবি রামপ্রসাদের মত ইনিও প্রথমতঃ সেবপুর মুন্সীবাড়ীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ চৌধুরীর গান ভক্তজনের হৃদয়ে সুধা সিঞ্চন করে, ভাবুকের অন্তরে গভীর ভাব উদ্দীপিত করে। তাঁহার শাক্তসঙ্গীত দিব্যভাবের মাধুরীতে পূর্ণ। চৌধুরী মহাশয় সাধন-বলে তন্ত্রের অতি গভীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন: এইজন্যই স্থূল উপাসনা হইতে সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপাসনা, স্থূল মূর্ত্তিপূজা হইতে মায়ের সূক্ষ্ম রূপের অনুধ্যানকে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। জগজ্জননীর 'ব্রহ্মময়ী' রূপের প্রতিই তিনি বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন: 'ওঙ্কার মূরতি রে মন জান না কি উহারে। ওই তো করেছে বিশ্ব রচনা'—এই সঙ্গীতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, গানটি জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার অধিকাংশ গানে রূপ অপেক্ষা স্বরূপের অভিব্যক্তি। 'কি খেলা খেলাও তুমি জীবন্ত পুতলি সনে'—পদটির মধ্যে ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মহামায়ার মোহপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দ চৌধুরীর গান তন্ত্র ও বেদান্তের তত্ত্বে পরিপূর্ণ,—শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন কিন্তু এই পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্রই কবিত্বের স্পর্শে সমুজ্জ্বল বলিয়া অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

গোবিন্দ চৌধুরীর প্রত্যেকটি রচনা কাব্যগুণে বিভূষিত। 'গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?'—গানটিতে শারদ প্রকৃতির পটভূমিকায় কন্যা বিরহিত জননীর অন্তর্বেদনা করুণ সুরে অনুরণিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া এ ধরনের 'আগমনী' গান শাক্তপদাবলীতে বেশি রচিত হয় নাই। আভরণ-হীনা কন্যার দুঃখে কাতর জননীকে সান্ত্বনা দিবার ছলে, উমার প্রত্যুত্তর-মূলক এই গানটি চৌধুরী মহাশয়ের সুদুর্লভ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন: আমরা সঙ্গীতটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

নাই আভরণ এমন কথা, মুখে এনো না মা আর।
আমিই শুধু করতে পারি অলঙ্কারের অহঙ্কার॥
এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার-সাজানো থাল,
প্রাতর্মধ্য-সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল,
আবার নিশাকালে বদলে পরায়, তাতে আলো-আঁধার দুইই দেখায়
বল মা ভবে কার বা আছে, এমন অলঙ্কার॥

কে বলে মা, তোমার উমার আভরণের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সূতায় গাঁথা তারার ফুল,
পরে থাকি বলে বলি, ইন্দ্রধনুর একাবলী
তাই বৈ জয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়ন্তী হার ॥ * * *

বরাভয় মোর হাতের বলয়, সে তো সবার জানা কথা
অমি করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তি ফলের মুক্তা-গাঁথা,
মায়া বস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি
নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ॥

আমি অষ্ট-সিদ্ধির নূপুর পরি তাতেই বেশি অনুরাগ
পুণ্য গন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ,
ব্রহ্মা আমার অলক্তর জল, কেশব আমার চোখের কাজল
কালান্তক তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারংবার ॥

গোবিন্দ দেখেছে মাগো, শুধালেই বলবে সেই ;
বাছা বাছা কালো মেঘের আমলাবাটা কেশে দেই ;
পোহালেই মা বিভাবরী, শিশু সূর্য্যের সিন্দুর পরি
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

হুগলী জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চোংখণ্ড আলিপুর গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার মবারকপুর।[১] এই গ্রামে তাঁহার স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন এখনও বর্তমান। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত মাতৃভক্ত। মধ্য বয়স হইতে তিনি মাতৃসাধনায় নিযুক্ত হন। ইনিও গৃহী সাধক, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির, মায়াবদ্ধ জীবের অতি করুণ চিত্র তাঁহার কয়েকটি গানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবের মোহবন্ধের কারণও তাঁহার অজ্ঞাত নয়, মহামায়াই মোহের মূল। বাসনা বিনষ্ট না হইলে মুক্তির উপায় নাইঃ তাই উপদেষ্টার মত তিনি মনকে বুঝাইয়াছেন, 'বাসনাতে দাও আগুন জেলে'। 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-

১। দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক—শ্রীশিবচরণ মিত্র

মোক্ষয়োঃ—এ সত্যটি কবি জানেন। জানেন বলিয়াই মন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মনের পর কি শত্রু আছে, সে হয় ত সোনা নয়ত মাটি।'

'তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল'—পদটির বৈরাগ্যের সুর আন্তরিকতায় পূর্ণ। মাতৃনাম-মহিমার উপরে কবির সুদৃঢ় বিশ্বাস। 'সংগীতসার-সংগ্রহ' গ্রন্থে—'কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল' পদটি নরেশচন্দ্রের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহা নীলাম্বরের বচন।

সাধক কবি ১২৭৭ সালে গঙ্গাগর্ভে যোগাসনে দেহত্যাগ করেন।

রামলাল দাসদত্ত

রামলাল দাসদত্ত বালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃভাবের সাধক ছিলেন। কথিত আছে, একবার তিনি দিনাজপুর যাইতেছিলেন, পথে দৈবাদেশ হয়, 'কাশীতে গিয়া মা অন্নপূর্ণাকে গান শুনাও'। দৈবাদেশ পাইয়া তিনি কাশীধামে যান এবং সেইখানেই সাধকের ন্যায় দেহত্যাগ করেন। রামলাল দাস দত্তের শ্যামাসঙ্গীত ভক্তি ও আন্তরিকতা পূর্ণ। অকৃত্রিম ভক্তি স্পর্শে সঙ্গীত গুলি প্রাণময়। মায়ের কৃপায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি মাতৃস্নেহে আত্মহারা। দাসদত্তের ভক্তির বিশেষত্বই এই, তাহার মধ্যে অভিমান নাই, অভিযোগ নাই, ভাব-পরিপূর্ণতা আত্মনিবেদনে তন্ময়। 'আমার মা' বলিতে তিনি অজ্ঞান তাহার দৃষ্টিতে মা করুণাময়ী। 'সন্তান মঙ্গলতরে জননী তাড়না করে'—মায়ের দেওয়া দুঃখও সন্তানের মঙ্গল হেতু। ভক্ত তাই বলেন,

> বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
> সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।

মায়ের কৃপা ধন্য এই সন্তানের ধ্যান জ্ঞান সবই মা। মায়ের বড়, মায়ের বাড়া কেউ নাই, 'আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে'।

মা পাগল সন্তান হইয়াও রামলাল দাস দত্ত মায়ের অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি 'সর্ব্বেশ্বরী', সকলেই মায়ের চরণ-ভিখারী, 'দেবর্ষি মহর্ষি কত আছে মায়ের পদ চেয়ে।' মায়ের অপার লীলা, তিনি ইচ্ছাময়ী। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্রঃ তিনি 'কভু কাল কভু বা কালী,' চতুর্ভুজা মুণ্ডমালীই 'মোহনমুরলীধারী'। মাকে বিশ্বব্যাপিনী জানিয়াই কবি সর্ব্বাত্মক মিলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন,

> ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
> সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।

মাকে হৃদয়ে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ভক্তের দুর্দ্দমনীয়। তিনি শ্মশান-বাসিনী, চিতা ভালবাসেন। মায়ের বিলাস-ভূমি হইবে বলিয়া ভক্ত স্বীয় চিত্তে চিতার আগুন অনির্ব্বাণ রাখিয়াছেন। রামলাল দাস দত্তের এই বিশিষ্ট আকূতি-মূলক গানটি অতিশয় জনপ্রিয়ঃ—

শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ওমা, চিতাভস্ম চারিদিকে—
রেখেছি, মা আসিস যদি॥

রাজ-বংশীয় শাক্ত কবি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

'কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়'—বলিয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন। প্রশস্তি স্তাবকতা মাত্র নয়, সত্য। J B Long সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে ইউরোপের রাজা অগাস্টাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বস্তুত মহারাজের শিল্পানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত সহযোগিতা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ রঘুরামের পুত্র। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে নবাব মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম, কাব্য, সঙ্গীত ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার কলঙ্ক আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার গুণাবলীতে সে কলঙ্ক ঢাকিয়া গিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তির উপাসক। ইঁহারই প্রত্যক্ষ পোষকতায় অষ্টাদশ শতকে শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাংলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। শাক্তকাব্য রচনার পশ্চাতে মহারাজের উৎসাহ প্রশংসনীয়। ভারতচন্দ্র তাঁহারই সভাকবি, সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট, তাঁহার রাজসভা ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মতই 'নবরত্ন'-শোভিত।

মহারাজ নিজেও কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুধারিণী' গানটি সুপ্রচলিত। কবিতাটি রসোত্তীর্ণ না হইলেও তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যের

পরিচয় বহন করে। ত্রিভুবন বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন, দেবী মহামায়া; তিনিই আবার মহাবিদ্যা, মোহমুক্তির কারণ। মোহপাশ হইতে মুক্তি ও প্রকৃত জ্ঞানানুবোধ লাভের আকুতি সঙ্গীতটির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। নিজে কবিতা রচনা করা অপেক্ষা কাব্যরচনায় উৎসাহ দানেই মহারাজের সমধিক কৃতিত্ব।

মহারাজ শিবচন্দ্র

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত সন্তান মহারাজ শিবচন্দ্র রায়। ইনিও কতিপয় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। শিবচন্দ্রের রচনা অনুবাদাশ্রয়ী। ইনি তারা, ছিন্নমস্তা, ভুবেনশ্বরী, কালী, মহালক্ষ্মীর তন্ত্রোক্ত ধ্যান বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। 'জয় গণেশ-জননী, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী' পদটি ভগবতীর নামাবলী-মূলক স্তোত্র। শিবচন্দ্রের পদাবলীতে সংসারের প্রতি বিরক্তি, মাতৃপদে নির্ভরতা এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্য আকুতি দৃষ্ট হইলেও, তাঁহার রচনা গতানুগতিক ও বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত। শাক্তপদাবলীতে উদ্ধৃত 'ভুবনেশ্বরী মার রূপে ভুবনে নাহিক সীমা' পদটিকে অনেকে শিবচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে করেন।

কুমার শম্ভুচন্দ্র রায়

কুমার শম্ভুচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি যে শাক্তসঙ্গীতাবলী রচনা করেন, তাহাতে কবিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে। 'মন, তুমি এ কাল মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলে বল'—পদটিতে কবি কালো মায়ের রূপের আভায় মুগ্ধ হইয়াছেন: পদটির শেষাংশ কবিত্ব পূর্ণ—

> অরুণ যেমন প্রভাতকালে তেমনি মায়ের চরণতলে
> দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে, (ওপদে) জবা দিলে সাজে ভাল।

'তীর্থবাসী হওয়া মিছে' পদটিতে মায়ের চরণ-তীর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। লোকে তীর্থ করিবার জন্য অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে যায়। কিন্তু এই সকল তীর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা রাম, কৃষ্ণ, শিব—সকলেই মাতৃকৃপা লাভ করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন; শিব নিজে মায়ের শ্রীচরণ ধারণ করিয়া আছেন: অতএব অযোধ্যা, বৃন্দাবন, কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ মায়ের চরণ-তীর্থ। কুমার শম্ভুচন্দ্রের হৃদয়ের আর্ত্তি অনুযোগ-মিশ্রিত হইয়া করুণ সুরে ধ্বনিত হইয়াছে এই পদটিতে—'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি? নামে জগৎ-চিন্তাময়ী ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি!'

কুমার নরচন্দ্র

নবদ্বীপ-রাজবংশের শক্তিশালী শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা কুমার নরচন্দ্র রায়। তিনি অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন। পদগুলিতে ব্যক্তিগত মননের ছাপ সুস্পষ্ট। নরচন্দ্রের গানগুলি সরল ভাষায় রচিত এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। মায়ের স্নেহ আদায় করিবার ছলে, অনুযোগ ও নির্ভরতা-মিশ্রিত এই পদটি বিখ্যাত ঃ

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।

কুমার নরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব পড়িয়াছে। 'কিঙ্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে' পদটিতে রামপ্রসাদের 'আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে'—এই গানটির প্রভাব অতি স্পষ্ট। ব্যথাহত সন্তানের বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশের মধ্যেও রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

কুমার নরচন্দ্রের অনেক রচনা নাম-সাদৃশ্যহেতু 'জামদোনিবাসী নরচন্দ্র', কিংবা নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নবাই ময়রা, এমন কি রামদুলাল নন্দী দেওয়ানের রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

(১) 'যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে' পদটিকে অনেকে নবাই ময়রার রচনা বলিয়া অনুমান করেন।

(২) 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'—কবিতাটিকে দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর রচনা বলিয়া মনে করা হয়।

(৩) ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন, 'দ্বিজ নবচন্দ্র'-ভণিতাযুক্ত পদগুলি জামদো-নিবাসী নরচন্দ্র বা নরেশচন্দ্রের রচনা। যেখানে স্পষ্টতঃ 'জামদো-নিবাসী,' বলিয়া নরচন্দ্রের উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলি অন্যের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু 'দ্বিজ নরচন্দ্র' ভণিতা থাকিলেই তাহা কুমার নরচন্দ্রের রচনা নয়, এমন মনে করা অযৌক্তিক। নবদ্বীপ-রাজবংশের অনেকেই রচিত পদে 'দ্বিজ' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন। 'দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে,' 'দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে'—এরূপ বহু উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তমাত্রই পূর্বসংস্কার মোচন হেতু দ্বিজত্ব অর্জন করেন। এই অর্থেই যেন রামপ্রসাদ দ্বিজ রামপ্রসাদ।

কুমার নরেশচন্দ্র

নবদ্বীপ-রাজবংশের কুমার নরেশচন্দ্রও শ্যামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন ; তিনিও 'দ্বিজ' ভণিতা দিয়াছেন' যেমন,

যদি বাজা হত হব সেই দি'ন
দীনহীন দ্বিজ নবেশচন্দ্রে কয়।

কুমাব নবেশচন্দ্রেব বচনায উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই, বচনা গতানুগতিক।

মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র (১৮৪৮-১৮৮৬)

নবদ্বীপাধিপতি মহাবাজ গিবিশচন্দ্রেব দত্তক-পুত্র মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র বায। ইনি ৩৮ বৎসব মাত্র জীবিত ছিলেন। ইঁহাব সঙ্গীতে গতানুগতিকভাবে পাবমার্থিক জ্ঞানলাভেব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইযাছে 'তোমাবি অনন্ত মায কে জানে' পদটিতে মহামাযাব অচিন্ত্য তত্ত্ব বর্ণনা কবা হইযাছে গানটিতে শাস্ত্রীয জ্ঞানেব পবিচয পাওযা যায।

মহাবাজ নন্দকুমাব (১৭০৫-১৭৭৫)

মহাবাজ নন্দকুমাব ইতিহাস বিখ্যাত পুরুষ স্বীয কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিব গুণ তিনি সামান্য তসিলদাব হইতে আমীন ও পবে বঙ্গ বিহাব-উড়িষ্যাব দেওযান হন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, শক্তিব উপাসক।

মহাবাজেব পিতাব নাম পদ্মনাভ। মহাবাজেব প্রপিতামহ তাহাদেব আদি বাসস্থান মুর্শিদাবাদেব জকলগ্রাম হইতে বীবভূমেব অন্তর্গত ভদ্রপুব গ্রামে ভিটা পবিবর্তন কবেন। নন্দকুমাব এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ কবেন। ভদ্রপুব গ্রামেব সন্নিকটে অবস্থিত ব্রাহ্মণী নদীব তীবে আকালিপুব গ্রামে প্রসিদ্ধ গুহ্যকালীব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা তান্ত্রিক পীঠস্থান। নন্দকুমাব এইস্থানে বাপুদেব শাস্ত্রীব নিকট হইতে তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইযাছিলেন।

কর্ম্মব্যপদেশে মহাবাজকে অধিকাংশ সময মুর্শিদাবাদে থাকিতে হইত। মুর্শিদাবাদেব অনতিদূবে 'কিবীটেশ্ববী' দেবীব মন্দিব তান্ত্রিক সাধনাব বিখ্যাত কেন্দ্র। 'কিবীটেশ্ববী' দেবীব প্রতি মহাবাজেব অগাধ বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে, নবাব মীবজাফবেব মৃত্যুকালে তিনি কিবীটেশ্ববী দেবীব চবণামৃত নবাবেব ওষ্ঠে সেচন কবিযাছিলেন।[১]

নন্দকুমাব ছিলেন সত্যকাবেব তান্ত্রিক যোগী। ওযাবেন হেষ্টিংস ও তাঁহাব কতিপয তাবেদাবেব ষড়যন্ত্রে মিথ্যা জালিযাতিব অভিযোগে মহাবাজেব প্রাণদণ্ডাদেশ হয, এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেব ৫ই আগস্ট তাবিখে তাঁহাব ফাঁসী হয। এই সময তিনি যে স্থৈর্য্য ও

১। Gholam Hossain has a story that when Mirjafar was dying, Nanda Kumar gave him water that had bathed the image of Kiriteswari'—H Beveridge

ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্থিতধী তান্ত্রিক যোগীর উপযুক্ত। কলিকাতার তদানীন্তন শেরীফ ম্যাক্রেবী সাহেব, মহারাজের ফাঁসীর সময়ের দুই দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার তান্ত্রিক যোগি-সুলভ নির্ব্বিকার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাক্রেবী সাহেব বলিতেছেন,—

"তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কল্য যে তাঁহাকে এ জগৎ হইতে চির-বিদায় লইতে হইবে, তাহা কি তিনি অবগত নহেন? মহারাজ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বধ-মঞ্চোপরি উঠিলেন, আমি তাঁহার প্রশান্ত বদনে কোনরূপ ভাব-বিকৃতি দেখিলাম না।...কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, মহারাজের হস্তদ্বয় যেরূপ ভাবে প্রথমে বদ্ধ ছিল, সেই রূপ ভাবেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন নাই।"[1]

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি জপে নিযুক্ত ছিলেন। মাতৃকার ধ্যানে এই তন্ময়তা অর্জ্জন করাই শাক্ত সাধকের লক্ষ্য। ইহা দ্বারা সকল দুঃখকষ্ট এমন কি মৃত্যু-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত জয় করা সম্ভব। ইহাই তান্ত্রিক সাধনার ফলশ্রুতি। এই ধ্যানেই ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি নিরুদ্ধ হয়, সুখদুঃখের অতীত আনন্দময় অবস্থা আসে (তুলনীয়:—'দশ সুখদুঃখ সমান মানা, আনন্দ সাগর ডুবানা'—কমলাকান্ত)। এ অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণাও তুচ্ছ হইয়া যায়। তাই ত মাতৃ-ধ্যান সাধক বলেন, 'কাল ভয়ে কি ভয় আমার', বলেন, 'যা রে শমন এবার ফিরি,—নন্দকুমারও বলিয়াছেন,—

কবি শিবা শিব বোধ বিনাশিবে ভবরোগ।
দূরে যাবে ভয় [illegible] ঘর্ষিত সুধার সনে॥

ফাঁসীমঞ্চে দাঁড়াইয়া এই যোগ-শক্তিবলেই মহারাজ অবিচলিত ছিলেন, অবিকৃত বদনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতগুলির মধ্যে সংসার-বৈরাগ্য ও মাতৃপদে শরণ গ্রহণ করিবার আকূতি প্রকাশ পাইয়াছে। 'কালীপদ-সরোজরাজে সহস্র ভৃঙ্গ হও না মন', 'অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়'—গানগুলির মধ্যে শরণাগতির আকুল আগ্রহ লক্ষ্য করিবার মত।

শাক্তপদাবলীতে দুইটি গান আছে: (১) 'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী॥' (২) 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।' দুইটি গানের মধ্যেই সুগভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমান। প্রথম পদটিতে নাদ

১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়।

শক্তিরূপে ব্রহ্মময়ী মায়ের দেহ-চক্র-বিহারিণী মূর্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে শক্তির স্ফুরণ হয় নাদে। মানব-দেহের মূলাধারে এই নাদ 'অব্যক্ত' থাকে, মণিপুর ও অনাহতে উঠিয়া তাহা যথাক্রমে 'পশ্যন্তী' ও 'মধ্যমা' রূপ ধারণ করে এবং ক্রমে কণ্ঠে আসিয়া তাহা 'বৈখরী' নাদে পরিণত হয়। 'সঙ্গীত-দামোদরে'র রাগ-রাগিণীর বর্ণনা অনুযায়ী কবি পদ্মদল-বিহারিণী এই নাদ-শক্তির নব নব রাগমূর্তি কল্পনা করিয়াছেন; শরীর যেন যন্ত্র, নাড়ীগুলি যেন সেই যন্ত্রের তন্ত্রী, সত্ত্ব-রজ-তমঃ গুণত্রয় যেন উদারা-মুদারা-তারা তিন গ্রাম। নাদরূপিণী শক্তি এই দেহ-যন্ত্রে বিচরণ করেন: মূলাধারে তিনি ভৈরব রাগ, স্বাধিষ্ঠানে তিনি শ্রী রাগ, মণিপুরে মল্লার, অনাহতে বসন্ত, বিশুদ্ধ চক্রে হিল্লোল, আর আজ্ঞাচক্রে তিনি কর্ণাটক রাগ। এইরূপে ছয় রাগ, একুশ মূর্চ্ছনা ('ত্রি-সপ্ত-সুরভেদিনী') রূপে তিনি বিচিত্র সুর সৃষ্টি করিয়া জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। মায়ের এ সূক্ষ্মতত্ত্ব দুর্বোধ্য। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থায় ব্রহ্মদ্বার (=কাকীমুখ) আচ্ছাদন করিয়া তিনি অতি সূক্ষ্ম, অব্যক্তরূপে অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় গানটিতেও ('কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে') সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সংসার প্রপঞ্চসার, ইহাতে পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের খেলা। ইহাদিগকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত; তবে জীব যদি প্রাণায়াম করে, কুণ্ডলিনী-যোগ অভ্যাস করে, তাহা হইলে প্রপঞ্চ জয় করিতে পারে। কুণ্ডলিনী-জাগরণ হইলেই মোহভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, তখন মনে হয়, 'পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে'। এই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া জীবাত্মার সহিত মূলাধার-স্বাধিষ্ঠানাদি চক্র ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এক পরাপ্রকৃতিতে লয় পায়। তখন দেখা যায়, এক আত্মা বা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহাই 'আপনে আপনে'-দেখা, ইহাই সমাধি কিন্তু এই সমাধির স্তরে পৌঁছানো বড় শক্ত।

দুইটি গানের মধ্যেই দুরূহ তত্ত্বের কথা। কবিতা হিসাবে রসোত্তীর্ণ না হইলেও পাণ্ডিত্যের দিক হইতে, সাধ্য ও সাধন-তত্ত্বের দিক হইতে পদ দুইটির মূল্য আছে। দুইটি পদেই 'শ্রীনন্দকুমার' ভণিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, গান দুইটি নন্দকুমার দেওয়ানের রচনা, কেহ বলেন, 'ভুবন ভুলাইলি গো হরমোহিনী' গানটি মহারাজ নন্দকুমারের, আর 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে' গানটি নন্দকুমার দেওয়ানের রচনা। পদ দুইটির ভাব ও ভঙ্গী এক প্রকারের—অতএব মনে হয়, পদ দুইটি একই কবির রচনা। দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের পুত্রের নাম 'নন্দকিশোর', 'নন্দকুমার' নয়। সুতরাং

পদ দুইটি মহারাজেরই রচনা হওয়াই সম্ভব। দুইটি পদের মধ্যেই প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও গুহ্য সাধনার সঙ্কেত রহিয়াছে, মহারাজ নন্দকুমারের জীবন, কার্য্যাবলী এবং মৃত্যুর পূর্ব্বের অবস্থা চিন্তা করিলে, এই গুহ্যসাধন-সম্বলিত পদ দুইটি তাঁহার রচনা বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

মহারাজ রামকৃষ্ণ

নাটোরের মহারাজ রামকান্ত রায়ের পত্নী ভারত-বিখ্যাত বুদ্ধিমতী, পুণ্যবতী, মহীয়সী মহিলা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র শক্তি-সাধক রাজর্ষি রামকৃষ্ণ। ইনিও 'মহারাজ' উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু জগজ্জননীর কৃপা ও সাধনার সিদ্ধি যাঁহার কাম্য, বিষয়-লিপ্সা তাঁহার নিকট তুচ্ছ। শক্তি-চিন্তা, মাতৃ-ধ্যান—ইহাই ছিল মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি সাধক চূড়ামণি, রাজা হইয়াও যোগী।

রাণী ভবানী রামকৃষ্ণের উপর রাজ্যের ভার দিয়া কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। 'কিন্তু এ ধারে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যাঁহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহাকে রাজ্য শাসন করিবার জন্য পাঠান নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। অন্তরে বাহিরে, চিন্তায়-ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী। রাজস্ব-অনাদায়ে এক এক জমিদারী নিলামে উঠিতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মচারীরা নিলামে এই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল, আর তিনি যেই শোনেন যে, একটি জমিদারী নিলামে উঠিয়াছে, অমনি কালীর সম্মুখে আনন্দে ছাগবলি দিতে থাকেন, আর বলেন 'মাগো, বাঁচিলাম, আর একটি বন্ধন খুলিয়া গেল'। সে এক অপরূপ দৃশ্য। জমিদারীর পর জমিদারী নিলামে উঠিতে থাকে, আর দেবীর পূজার ধুম ততই বাড়িয়া যায়। বাহিরের বন্ধন যতই খসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের অন্তরে ততই বৈরাগ্য প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাণী ভবানী কাশী হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, 'তুমি সূর্য্য-বংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু চাহি না।"[১]

নাটোর হইতে রাণী ভবানী মুর্শিদাবাদের বড়নগরে বাস পরিবর্ত্তন করেন। নাটোরে থাকার সময় মহারাজ রামকৃষ্ণের বেশির ভাগ সময় কাটিত ভবানীপুরের মায়ের মন্দিরে। বড়নগরে আসিয়া তিনি 'কিরীটেশ্বরী'র মন্দিরে গতায়াত করিতেন। বড়নগরেও তাঁহার সাধনার আসন ছিল। রাণী ভবানীর স্থাপিত সিংহবাহিনী রাজরাজেশ্বরীর

১। রাণীভবানী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মন্দিরের একটি শুষ্ক বিল্ববৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করিয়া তিনি সাধনা করিতেন। "বেদীর চিহ্ন আজিও দেখা যায়। রাজা রামকৃষ্ণ যে শবে বসিয়া সাধনা করিতেন, একটি খর্জ্জুর বৃক্ষের তলায় তাহা প্রোথিত আছে বলিয়া বড়নগরের লোকেরা গল্প করিয়া থাকে।"[১] দিনের বেলায় রাজা এইখানেই সাধনা করিতেন, কিন্তু প্রতি রাত্রিতে তাঁহার সাধনা চলিত কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে।

মহারাজ রামকৃষ্ণ উদাসীন মাতৃ-সাধক, তিনি সিদ্ধকাম যোগী। মহারাজের সঙ্গীতগুলির মধ্যে সাধন-শক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। মাকে যিনি হৃদয়ে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তীর্থভ্রমণাদি মিথ্যা, দিব্য মন্ত্রীর এই জ্ঞান ও বিশ্বাস তাঁহার ছিল, তাই তিনি বলিতেন :—

'ভবে সেই সে পরমানন্দ,
যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে,
কালী-কথা বিনা না শুনে কানে।
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥

দিবস-রজনীতে 'কালী-নামামৃত পীযুষ-পানে' যাঁহার আঁখি ঢুলুঢুলু, বিষয় তাহার নিকট তুচ্ছ। মৃত্যুকেও তিনি ভয় পান না। 'জয়-কালী জয়-কালী' বলিয়া যদি প্রাণ যায়, তাহা হইলে মোক্ষ নিশ্চিত। এই মোক্ষই শেষ পর্য্যন্ত তিনি চাহিয়াছেন, 'অন্তে চরণে সমাধি, মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে'।

পার্থিব ভোগ-বাসনার জগতে, বিশেষ করিয়া রাজার পক্ষে, বিষয়-উদাসীন থাকা গৌরবের কথা নয়। উদাসীন বলিয়াই রামকৃষ্ণের অনেক জমিদারী নিলামে উঠিয়াছে। জননী রাণী-ভবানী তাঁহাকে 'রঘু-বংশের রাজাদের মত হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেও লোক-নিন্দা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। সংসারের এই দুঃখ-যন্ত্রণার অভিঘাতে সন্তানের মত বিশ্বাস-ভক্তি লইয়াই তিনি মায়ের চরণে অভিযোগ জানাইয়াছেন :

এখনো কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত।

'জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্নসংশয়ঃ' এই শিব-বাক্যে মহারাজের দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। মৃত্যুকালেও 'বালিব শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে'—এই আকুতি

১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়।

তিনি জানাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সাধক বলিয়াই তিনি মৃত্যু-লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন: 'মন যদি মোর ভুলে' গানটি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের রচনা। গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া কালীর নাম জপ করিবার সময়েই সকলের সম্মুখে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়। মাতৃনাম জপিতে জপিতে সজ্ঞানে এইরূপে দেহত্যাগ একমাত্র সিদ্ধ মাতৃ সাধকই করিতে পারেন। অতুল রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একজন রাজার এই বৈরাগ্য সাধনার দৃষ্টান্ত, বাঙালীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

কোচবিহারের রাজদরবার বহু দিন হইতেই সাহিত্য ও শিল্পচর্চ্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। রাজবংশের বহু রাজা কবি ও পণ্ডিতদের উৎসাহ দিয়া কাব্য রচনা করাইতেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার আনুকূল্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পদ্ম, স্কন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণের অংশবিশেষ অনূদিত হইয়াছিল। মহারাজ ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিত্য হোম, নিত্য পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য তণ্ডুল ও স্বর্ণদান ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম্ম।[১] তিনি যে সকল দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাদের মধ্যে জয়তারা ও আনন্দময়ী কালীর মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। তিনি কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত যে গীতাবলী পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেক শ্যামা সঙ্গীত আছে। মহারাজের—

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
অসির করে করাল, শোভিছে ভাল, করবাল যেন দামিনী॥

প্রভৃতি পদ সংস্কৃত ধ্যানের গতানুগতিক অনুবাদমাত্র নয়, ইহাতে কিছুটা মন্ময়তার অভিব্যক্তি আছে। দুই একটি পদে ছন্দের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয় যেমন,

ভয়ে দিতিকুল সব রৈল দূর
ভয়ে ঢুল ঢুল সজল আঁখি,
ভাবে ঢুল ঢুল সজল আঁখি,
ভূপে কয় মোর মনে লয়,
তারার বরণ তারায় রাখি
তারার বরণ তারায় রাখি।

১। দ্রষ্টব্য কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী, সংখ্যা ১

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

মেদিনীপুর নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান। ইনি বহু সৎকার্য্য করিয়া ইংরাজ সরকারের সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 'মানমিলন' ও 'শারদোৎসব' এই দুইটি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার সঙ্গীতগুলি বহুল-প্রচলিত। ইঁহার রচনায় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব দেখা যায়: 'ওগো উমা, আয় গো মা' গানটির মধ্যে দেখা যায়, যশোদা যেমন গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত শ্রান্ত কৃষ্ণের মুখে ক্ষীর-সর তুলিয়া দিতেন, তেমনই মেনকাও পতিগৃহাগত কন্যা উমার মুখে ক্ষীর-সর তুলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন:

পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর
যত্নে ক্ষীর-সর রেখেছি মা, ধর
—দিব বদন-কমলে।

রাজা মহেন্দ্রলালের রচনায় স্নেহের গভীরতার বিশ্লেষণ আছে। সুলভ অনু প্রাসাদিরও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ

বর্দ্ধমানের রাজবংশ নানাদিক হইতেই অশেষ গুণসম্পন্ন। লাহোরের কাপুর ক্ষত্রিয় বংশের সঙ্গম রায় এই বংশের একজন আদি পুরুষ। ব্যবসায় ব্যপদেশে এই দেশে আসিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমানের অধিপতি হন এবং এই দেশেরই অধিবাসী হইয়া পড়েন। এই বংশের সহিত অনেক কিংবদন্তী জড়িত হইয়া আছে। সৎকীর্ত্তি-সম্পাদনে ইঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবার যোগ্য। দানে-ধ্যানে, বিদ্যোৎসাহিতায়, বীরত্বে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় ইঁহাদের কীর্ত্তি অবিস্মরণীয়। এই বংশের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রয়ে কবি ঘনরাম তাঁহার বিখ্যাত ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেন, সাধকপ্রবর কমলাকান্ত ছিলেন মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আশ্রিত।

এই তেজশ্চন্দ্র মহারাজের দত্তক-পুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ রায়বাহাদুর। ইনিও নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ভারতেশ্বরীর মর্ম্মরমূর্ত্তি ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। সাধক কমলাকান্তের রচনাবলী ইঁহারই উৎসাহে প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

মহারাজ মহাতাবচাঁদ নিজেও কবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি শক্তি-বিষয়ক পদ রচনা করেন। দশমহাবিদ্যার যে মূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ পূজিত হয়, মহারাজ মহাতাবচাঁদ তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুবাদ করেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ও কমলার ধ্যান ছাড়াও শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, আদ্যাকালী, মহাকালী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুটা, অষ্টকুটা, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, ত্রিপুর-ভৈরবী, পারিজাত সরস্বতী, শ্রীবিদ্যা—এক কথায় তন্ত্রসারোক্ত প্রায় প্রত্যেকটি শক্তি দেবীর ধ্যান তিনি বাঙলা কবিতার আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি যে তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত, দেবীর পূজা ও সাধনার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা হইতে মাতৃধ্যানগুলি বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মহারাজ বঙ্গবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, নচেৎ এই গুহ্য মাতৃধ্যানগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত।

মহারাজের রচনায় তান্ত্রিক সাধনার দুরূহ তত্ত্বের কথা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সাধক নহেন, ভক্ত। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া পুরোহিতের উচ্চারিত ধ্যানমন্ত্র তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যও তাঁহার ছিল, তাঁহার 'জগজ্জননীর রূপ'-বর্ণনা সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। ঐশ্বর্য্য মিশ্রা ভক্তি লইয়া তিনি মায়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনায় সন্তান-সুলভ মান-অভিমানের কথা নাই, আছে নিজের অসীম দৈন্যে প্রকাশ। তাহার নিকট জগজ্জননী বিপদহারিণী, কৃপাময়ী, চৈতন্যরূপিণী, ভবকষ্ট নিবারিণী। তাই তাহার পদাবলীর মধ্যে নিজের দীনতা-বোধ, জগজ্জননীর অপার মহিমা প্রকটঃ তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ ও ভবকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের আকৃতি অতি প্রবলঃ 'চন্দ্রের কলুস হর', 'নাশ করে দুরদৃষ্ট মুক্ত কর ভবকষ্ট', 'পার কর ভববারি লইলাম শরণ', 'চন্দ্রে দেহি শ্রীচরণ'—এই সকল প্রার্থনার কথাই বেশী।

মহারাজের অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ। অনুবাদে মূলের রসব্যঞ্জনা অব্যাহত রাখিবার মত শিল্পকুশলী তিনি ছিলেন না তাই কবিতা-হিসাবে এগুলি তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নাই। তবে অনুবাদকের দায়িত্ব তিনি যত্নের সহিত পালন করিয়াছেনঃ তন্ত্রোক্ত ধ্যানের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে তাঁহার পদাবলী সার্থক হইয়াছে। ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই সকল কবিতার মধ্য দিয়া সংস্কৃত মাতৃধ্যানের রস না হউক, বিষয়ের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ বাঙালীর ঘটিয়াছে।

দেওয়ান-বংশের কবি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তিমহিমার পুনরুজ্জীবনের যুগে যে সকল দেওয়ানবংশ শক্তিদেবীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্দ্ধমান-কালনার চুপী গ্রামের দেওয়ানবংশ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুই ছিলেন পঞ্চোপাসক, হরি-হরে, শ্যাম-শ্যামায় সমান ভক্তি। তাঁহারা যেমন কৃষ্ণভক্তিমূলক গান রচনা করিতেন, তেমনই শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করিতেন। রচনা গতানুগতিক। কোথায়ও সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি, কোথায়ও অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি; ইঁহাদের রচিত সঙ্গীত অধিকাংশ স্থলেই আগমোক্ত ধ্যানের অনুবাদ বা তাহারই প্রভাবে রচিত স্তোত্র।

ব্রজকিশোর রায়

বর্দ্ধমানাধিপ অশেষগুণান্বিত মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন চুপী গ্রামনিবাসী ব্রজকিশোর রায়। রায় মহাশয় নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। 'জয়ে ব্রহ্মময়ী বন্দে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী' পদটিতে মায়ের নামাবলীর একটি তালিকা পাওয়া যায়। পদটি তৎসম শব্দবহুল। 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহেশ্বরী মম মনোমানসপূরণকারিণী' ও 'করুণময়ী কাত্যায়নী কমল-ভৈরবনাদিনী' পংক্তিগুলির মধ্যে অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস আছে, কিন্তু তাহাতে কাব্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় নাই। বৈচিত্র্যবর্জ্জিত নামাবলীমূলক এই স্তোত্রটি অনেকটা প্রাচীন চৌতিশা স্তবের মত।

নন্দকিশোর রায়

ব্রজকিশোর রায় দুই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের প্রথম সন্তান নন্দকিশোর বা নন্দকুমার রায়। ইনিও পিতার মত ভক্ত ছিলেন। 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে' পদটি নন্দকিশোর রায়ের রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কোন কোনও পুস্তকে এই পদটি মহারাজ নন্দকুমারের বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। পদটির ভণিতায় আছে 'শ্রীনন্দকুমার', অতএব ইহা মহারাজের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। নন্দকিশোরের 'শ্রীনন্দকুমার' ভণিতা দেওয়ার কোন সঙ্গত হেতু নাই।[1]

১। 'মহারাজ নন্দকুমার'—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬)

দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের প্রথম পক্ষের মধ্যম পুত্র রঘুনাথ রায়। ইনি ছিলেন মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ান। কথিত আছে, রাজার নির্দ্দেশে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা তিনি পারমার্থিক সঙ্গীত-রচনার কাজে লাগাইয়াছিলেন।

রঘুনাথ রায় বেশিদিন দেওয়ানী করিতে পারেন নাই। তাহার অন্তরটি ছিল বিষয়-বিবিক্ত। আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। সাংসারিক 'মায়াসব', 'মানস তামস', 'সুখাভিলাষ' তাহার নিকট বিরক্তিকর ছিল। এই মায়াকুহক হইতে মুক্তিলাভের চিন্তাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন, ভজন-পূজন এইগুলিতেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলির মধ্যে এই বিষয় বিরক্ত পরম বৈরাগ্যের সুর বড় করুণভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। পারমার্থিক সম্পদের দিক হইতে তিনি নিজেকে অতি 'অকিঞ্চন' মনে করিতেন, তাই সঙ্গীতের ভণিতায় নিজ নামের পরিবর্ত্তে 'অকিঞ্চন' শব্দটাই ব্যবহার করিয়াছেন। বৈরাগ্য বিধুর মনোভাবের সহিত 'অকিঞ্চন' নামের যোজনা সার্থক হইয়াছে। মায়াঝড়, মোহতুফানে বিপর্য্যস্ত যাত্রীর সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তি—

পড়িলে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥...
উপায় না দেখি আর অকিঞ্চন ভেবে সার
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার শ্রীনামের ভেলা ধরি॥

দেওয়ানজীর সঙ্গীতে নিজের দীনতা ও পাপবোধের ভাবটি অতি প্রবল। এই ভাব বাহিরের নয় মর্ম্মমূল হইতে উৎসারিত হইয়াছে, গভীর ব্যাকুলতাই সঙ্গীতগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মোহ ভ্রান্তি, বিষয়াকর্ষণ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছেন, মনকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সজাগ হবার উপদেশ দিয়াছেন,

ইন্দ্রিয় বশে নিদ্রাতুর প্রায় হয়েছ উন্মত্ত,
পড়ে রবে সে চন্দ্রচূড় ইন্দ্রিয় অবশ হলে

রঘুনাথ যেমন কালীভক্ত তেমনই কৃষ্ণভক্তও ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন প্রভাতে তিনি একটি করিয়া শ্যামাসঙ্গীত, এবং অপরাহ্ণে একটি করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনগান রচনা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ভক্ত। দেবতা শ্যামই হউন বা শ্যামাই হউন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন। রঘুনাথের

সঙ্গীত শান্তরসপ্রধান। তিনি ঐশী-ঐশ্বর্য্যে বিশ্বাসী; বাৎসল্যের অনুযোগ-অভিযোগ অপেক্ষা অসীম নির্ভরতায় প্রার্থনা, আত্মনিবেদন এবং মাতৃমহিমার কীর্ত্তন তাঁহার সঙ্গীতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

পিতার মত রঘুনাথ প্রচুর মাতৃনামাবলীমূলক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন: 'তারা, তুমি কত রূপ জান ধরিতে। জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে॥'—এই নাম ও রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সহজ অনুপ্রাসের ঘটা দিয়া তিনি রসসঞ্চার করিয়াছেন, নামগুলিতে সংস্কৃত পৌরাণিক জ্ঞানের মোড়ক দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পদ রসোত্তীর্ণ হয় নাই। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে:—

এ মা বিশ্বেশ-বিমোহিনী বিশ্বজন-বন্দিনী
বিমল-বদনী বিন্ধ্য-বিলাসিনী।
প্রসন্ন প্রতিপালিনী পার্ব্বতী পরমেশানী
পতিতপাবনী পশুপতিরাণী পর্ব্বতরাজনন্দিনী॥
ভবার্ণব-নিস্তারিণী ভকতভয়ভঞ্জিনী
ভৈরব-ভবানী ভূতলবাসিনী ভুবনব্যাপিনী।
মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহেশ-মনোমোহিনী
মনুজ-মস্তকমালাধারিণী অকিঞ্চন হৃদিমাঝ-বিহারিণী॥

এই ধরনের সঙ্গীত অর্থহীন 'চৌতিশা' স্তব হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত মানের হইয়াছে মাত্র, কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাতৃরূপ বর্ণনাতেও এই একই কলা-কৌশল অনুসরণ করা হইয়াছে। কঠিন সংস্কৃত শব্দের বন্ধন থাকায়, তাহাও গতানুগতিক। বরং দেওয়ানজীর আকুল আবেগানুবিদ্ধ 'ভক্তের আকূতি' হৃদয়স্পর্শী।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান। ইনি হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইনি হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের জেমোকাঁদি গ্রামে, আদিপুরুষের নাম হরকৃষ্ণ সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতার নাম বিহারী সিংহ। দীনদয়াল, রাধাচরণ, রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ এই চারি ভ্রাতা। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র বিখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত লালাবাবু (=কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কোলে আয় মা ভবদারা' আগমনী গানটির মধ্যে মায়ের জবানীতে ভক্তের হৃদয়টি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫১)

রামদুলাল নন্দী ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি হেলিডে সাহেবের সেরেস্তায় কাজ করিতেন, পরে ত্রিপুরা রাজ-স্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হন। নন্দী মহাশয়ের গানগুলি অন্যান্য দেওয়ান-রচিত গানের মত গতানুগতিক নয়। ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ভোগের প্রতি বিরাগ, মাতৃকৃপালাভের জন্য আকুতি তাঁহার গানগুলিতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। সর্ব্বোপরি মা যে অনন্তরূপিণী, তাঁহার এই স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাঁজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥

—এই গানটির মধ্যে কবি জগজ্জননীর সর্ব্ববাদি-সম্মত রূপটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কেহ ভগবানকে 'গড্' বলেন, কেহ বলেন 'আল্লা', কেহ বলেন 'শক্তি,' কেহ বলেন 'রাধিকাজি'। বস্তুতঃ সবলেই বিভিন্ন নামে এক দেবতারই উপাসনা করিতেছেন। এক ব্রহ্মকে দ্বিধাজ্ঞান করার জন্যই দলাদলি, রেষারেষি। আসলে তিনিই এক, তিনিই বহু। ভ্রান্তিবশেই 'একে'র বহুত্ব-কল্পনা।

'সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' গানটির মধ্যে নিষ্কাম ভাব সুপরিস্ফুট। কেহ কেহ এই গানটিকে কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে করেন। রামদুলাল নন্দীর রচনা সরল ও সরস। কবি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বাদী।

মাতৃবন্দনায় কবিওয়ালা

হরুঠাকুর (১৭৩৯-১৮১৩)

হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। ইনি 'কবির গুরু হরুঠাকুর' নামে বিখ্যাত। সম্ভবতঃ তৎকালে গীত-রচয়িতা হিসাবে ইনি ছিলেন কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার পূর্ব্বেও এদেশে কবিগানের দল ছিল। হরুঠাকুর নিজে রঘুনাথ দাস কবিওয়ালার দলে গান রচনা করিয়া দিতেন।

প্রথমে তিনি অবৈতনিক সখের কবিদল খুলিয়াছিলেন। এই সময় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন এই জাতীয় গানের প্রধান উৎসাহদাতা। হরুঠাকুর অল্পদিনেই রাজা

বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় ও পরামর্শে বৈতনিক কবির দল খুলিয়া গান করিতে থাকেন। সেকালে হরুঠাকুরের গানের যথেষ্ট আদর ছিল। 'হরুঠাকুর স্বভাব কবি ছিলেন' (রামগতি ন্যায়রত্ন)।

হরুঠাকুরের অন্যতম কৃতিত্ব, তিনি রামপ্রসাদ ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রার মত কবিওয়ালাদের গুরুস্থানীয় হইয়া হাতে কলমে তাঁহাদিগকে কবিগানের কৌশল শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত উত্তর সাধক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তিনি আর কোন আসরে গান করিতেন না।

হরুঠাকুরের গানের প্রধান বিশেষত্ব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। হরুঠাকুরের মধ্যে ভাব ছিল, ভক্তিও ছিল। সেই ভাব ও ভক্তি মিশাইয়া স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি দ্বারা তিনি দেবতার মধ্যে মানবত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উপরন্তু পদলালিত্যে তাহার সঙ্গীতগুলি শ্রুতিসুখকর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা, আগমনী ও বিজয়া—সবরকম গানই গাহিতেন। স্বজনগণের বর্ণনায় হরুঠাকুরের এই মিলন-বাৎসল্যের পদটি অতি সুন্দর :

> শুভ সপ্তমীর শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়।
> কোরে নিরীক্ষণ, মুখে হেরে চাঁদবদন
> অভয়ায় গিরিরাণী কয় :
> বল মা, আমার কাছে
> জামাই শিব এখন কেমন আছে ?

উমাকে গৃহস্থঘরের কন্যা সাজাইয়া, মেনকার এই স্নেহার্দ্র পরিস্ফুটনে হরুঠাকুরের মানব চরিত্র পরিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পদটির মধ্যে লৌকিক বাৎসল্যের সহিত অলৌকিক ভক্তি বাৎসল্যের চিহ্নও বর্তমান। 'এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে'—ইহা কোন মায়ের কথা নয়, ভক্ত কবিরই অন্তরের কথা।

রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)

রাম বসু হাওড়ার সালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। ইনি প্রথমে ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তখনকার কবিওয়ালাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, রাম বসুর সত্যকারের কবিত্ব-শক্তি ছিল। শেষে তিনি নিজেই একটি দল খুলিয়াছিলেন এবং সে দলের খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল।

গুপ্তকবি রাম বসুর গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন, 'যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদের কবিতায় রাম বসু।' ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কবির বাঁধনদার ছিলেন, কবিওয়ালার মতই তিনি অত্যুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তবুও বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, কবিওয়ালা রাম বসুর সৃষ্টি-ক্ষমতা অসাধারণ। তাহার গানে কাব্যের উপাদান প্রচুর।

রাম বসুর বেশির ভাগ রচনা রাধার অনুরাগ-বিরহ লইয়া, কবিত্বের রঙে তাহাতে গাঢ়। বৈষ্ণব সঙ্গীতের তুলনায় শ্যামাসঙ্গীত তিনি কম লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মানবস্বভাব পরিজ্ঞানের পরিচয় আছে। যেসব কবিতায় তিনি মর্মাহতা কুলবধূর প্রেম ও বেদনার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে সঙ্গীত করুণ, মধুর, হৃদয়গ্রাহী। আর 'আগমনী' গানে তিনি মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-বিগলিত আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাও কারুণ্যে, মাধুর্যে চিত্তাভিরাম। Dr S K De বলেন, 'In Agamani Ram Basu is undoubtedly supreme,'—উক্তিটি মিথ্যা নয়। প্রত্যক্ষভাবে মাতৃস্নেহই অনুভব করিয়া যেন তিনি মাতৃহৃদয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রাম বসুর 'মা মেনকা' বাঙলার গৃহস্থ ঘরের অনন্যা জননী। কিন্তু অবলা হইলেও তিনি 'অবলা' নহেন, স্বামীকে অনুযোগ দিয়া [illegible] বাক্য প্রয়োগ করিতে তিনি পটু,

তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে গিরিবর।
ওহে শুন, শুন, তোমার [illegible] কি বলে
তুমি গিয়েছিলে কে উমা বলে ঐ
'আমি আপনি এ[illegible] জননী' বলে গো

কন্যার দুশ্চিন্তায় মায়ের আক্ষেপের কথাগুলিও ঘরের কথা ম[illegible]

(১) আছে কন্যা সন্তান [illegible], তাহাতে হয়
সদাই দয়া মায়া [illegible]
(২) তোমারে কেউ [illegible] বলবে না,
দেখে দারুণ পাষাণ,
আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ।

রাম বসুর 'মা মেনকা' একান্ত ভাবে বাঙলার গৃহস্থ ঘরের জননী। তাহার কথায় বার্তায়, আচার-আচরণে চিরপরিচিত 'স্নেহ-বিহ্বল করুণা-ছলছল' মায়ের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এ দেশের মায়েরা জামাইয়ের 'বিত্ত' দেখিতে চায়, যাহাদের মেয়ে-জামাই গরীব, তাঁহাদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না, আবার ঝি জামায়ের ঐশ্বর্যের

কথা শুনিলেও তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। মেয়ের মুখে জামাইয়ের ঐশ্বর্য্যের সংবাদ শুনিয়া মেনকাও আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠেন,

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই,
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।

এই মা মেয়ে-সর্ব্বস্ব। মেয়েকে হারাইয়া যেমন তিনি বলেন,

তারা-হারা হোয়ে, নয়নের তারা-হারা হোয়ে রই
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ-উমা কই।

আবার মেয়েকে কাছে পাইয়াও তেমনই তিনি আত্মহারা হন,

(অমনি দুবাহু পসারি উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নই।)

রাম বসু মানবীয় ভাব দিয়া জীবন-রসাশ্রিত কাব্য রচনা করিয়াছেন: তাঁহার কবিতা ভক্তিভাবে উচ্ছল নয়, মাতৃ-স্নেহে উদ্বেল। কবি বলিয়াই রাম বসু 'লীলা' গাহিয়া সঙ্গীত সমাপ্ত করিয়াছেন, সাধন তত্ত্বের দুরূহ দুর্গমতা পরিহার করিয়াছেন। কবি তত্ত্বের ভিখারী নহেন, রসের পূজারী। তাই, তত্ত্ব পরিহার করিয়া 'বসুজা' বাৎসল্য রসকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাম বসুর 'আগমনী' জীবনের কথা, ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। They embody the simple utterance of a simple heart'—এই জন্যই এ গান অতি উপাদেয়।

নীলু ঠাকুর

নীলু ঠাকুর হরুঠাকুরের উত্তর-সাধক কবিওয়ালা। কবিওয়ালাগণ উচ্চশিক্ষিত না হইলেও, তাহাদের গানে অনেক স্থলে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তির আকৃতিও আন্তরিকতাশূন্য বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা আসরে দাঁড়াইয়া গান করিতেন, সে মুহূর্ত্তে তাঁহারা যেন অন্য লোকের মানুষ হইয়া যাইতেন। ভক্তি-গদগদ কণ্ঠ, অশ্রাসক্ত নয়ন সাময়িক ভাবে শ্রোতার মনেও প্রভাব বিস্তার করিত। নীলু ঠাকুরের 'বাঞ্ছাফলদাত্রী' গানটিতেও ভক্ত শাক্তের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ভাষায় রূপ ধরিয়াছে। ভক্ত মোক্ষ কামনা করেন না:

বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে
বিজ্ঞান দেহি মে শিবে
সজ্ঞানে এই ভাবে আসি যাই।

তাঁহাদের প্রার্থনা: 'যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়'। মায়ের নাম তাঁহাদের সম্বল, চরণ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। নামগান ও চরণ-ধ্যান ব্যতীত তাঁহাদের অন্য ক্রিয়াও নাই। কবিওয়ালাদের কণ্ঠে এই ধরনের গান জ্ঞানের গভীরতায় এবং ভক্তির নিবিড়তায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইলেও, ইহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সমালোচকগণ সংশয় পোষণ করেন।

নীলমণি পাটনী

নীলমণি পাটনীও বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। ইঁহার গানে ভক্তির কথা, সাধনার কথা ও মানস পূজার কথা আছে। 'মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম'—গানটির মধ্যে একদিকে ভক্তির ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃ-লীলার রহস্যময়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা'কে ভক্ত ভক্তির ডোরে বাঁধিতে চান, বাহ্য ষোড়শোপচার তাঁহার নাই, তিনি মানস নৈবেদ্য সাজাইয়া মাকে নিবেদন করিবেন, ছয় রিপুকে বলি দিবেন। ভক্তের ধ্রুব বিশ্বাস: 'তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি, আর পালাতে পারবি নে।'

ভক্ত মায়ের রহস্যময়ী লীলা অনেক সময় ভেদ করিতে পারেন না; কারণ, অনেক ভক্তকে তিনি দয়া করেন না, 'রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি যত্নে যত্ন কোরে পূজা কোরে সবংশেতে যায়', কিন্তু আবার অনেকের প্রতি তিনি বিনা কারণেই প্রসন্ন হন, 'শ্রীমন্তে প্রসন্ন হয়ে, বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে রক্ষা করলি তায়'। তথাপি শেষ পর্যন্ত অনন্ত নির্ভরতায় নাম-মহিমার উপর তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন, বলেন: 'তারা গো তোমায় যে ভজেছে, সেই পেয়েছে।' লৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ভক্তের সরলতায় মিশানো এই গানটি তখনকার দিনে শ্রোতামাত্রকেই মোহিত করিত। 'দুর্গোৎসবের দিনে, মা দুর্গার সম্মুখে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে এই গান গীত হইবার কালে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে কি ভাব উথলিত, হিন্দুমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন'।[১]

এ্যান্টুনী ফিরিঙ্গী

এ্যান্টুনী ফিরিঙ্গী জাতিতে ছিলেন পর্তুগীজ। তখন অনেক ফিরিঙ্গী এদেশেই বিবাহ করিয়া এই দেশের লোক হইয়া যাইতেন। এ্যান্টুনী সাহেবও এই দেশের মেয়ে বিবাহ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এমনও শোনা যায়, বহুবাজার স্ট্রীটের

১। বঙ্গের কবিতা, অনাথকৃষ্ণ দেব।

ফিরিঙ্গী কালী নাকি এ্যান্টুনী সাহেবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান হইলেও সাহেবের ভবানী প্রীতি আন্তরিকতাশূন্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ্যান্টুনী সাহেবের এই গান ঃ

ভজন-পূজন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া কোরে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী॥

—গানটি নিষ্ঠাবান ভক্তের প্রার্থনার মতই শোনায়। খ্রীষ্ট ও কৃষ্টে, শ্যাম ও শ্যামায় তিনি কোন ভেদ জ্ঞান করিতেন না।

এ্যান্টুনী সাহেবের 'জয় যোগেন্দ্র-জায়া, মহামায়া অসীম মহিমা তোমার' সঙ্গীতটির মধ্যেও আর্ত ভক্তের করুণ কণ্ঠের প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে বিপদকালে
ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা।

সন্তানের এ করুণ ডাকেও মা দেখা দেন নাই, তাই অভিমানাত্মক অনুযোগ, 'মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?' তৎপর সুতীব্র অভিযোগ, 'কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ? নাম কেবল করুণাময়ী করুণাশূন্য হয়েছ।' তাহার পাষাণকুলে জন্ম, তাহাকে ভজনা করিয়া ব্রহ্মা দণ্ডধারী, 'ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি, শিব হলেন শ্মশানবাসী', তিনি দক্ষরাজায় নিন্দা হয়ে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছেন, স্বামীর জন্য যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন, 'আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে, তার বুকে পা দিয়েছ।' তিনি নিষ্ঠুর হইলেও কবি যত্ন করিয়া সেই দুর্গা তারার নামই গান করিবেন, আমৃত্যু ('অজপা' না ফুরানো পর্যন্ত) মুখে দুর্গানাম বলিবেন। মায়ের সাধন করিতে গিয়া অনেকে সবংশে নিহত হইয়াছে, রাবণ রাজা তাহার উদাহরণ। তাই শেষ পর্যন্ত ভক্তের সেই এক অনুযোগ ঃ

দয়াময় মাগো,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ?

হিন্দু-পুরাণের কাহিনী সম্বলিত, সন্তানের অনুরাগ মিশ্রিত অথচ ভক্তি বিগলিত এরূপ গান যে একজন ফিরিঙ্গীর রচনা, তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়, মনে হয়, একজন মাতৃভক্ত যেন নিজের হৃদয়-বেদনা মিশাইয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া এই করুণ আবেদনের পদ রচনা করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীর মুখে এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত হইয়া যাইতেন; তাঁহারা কবির ব্যক্তিগত জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া, তাহার কণ্ঠে বিজয় মাল্য দুলাইয়া দিতেন। ফিরিঙ্গী হইয়াও নিষ্ঠাপূর্ণ হিন্দুয়ানার জন্যই এ্যান্টুনী সাহেব জনপ্রিয় কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপতি ঠাকুর নামে বিখ্যাত। তাঁহার নিজের কবিদল ছিল না, অন্যের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। রমাঠাকুরের বাঁধা পালাগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত। গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বও থাকিত। অন্যান্য কবি গান রচনা করিতে গিয়া প্রকৃতিকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন, পারিবারিক সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁহাদের ভাব ও কথা সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু রমাঠাকুর রাধা, মেনকা ও গিরিরাজের হৃদয়-বেদনাকে প্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া বিচিত্র রস সৃষ্টি করিতেন। সুকবি বলিয়াই প্রকৃতি তাহার নিকট উপেক্ষিত হয় নাই, জড়প্রকৃতি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হইয়াছে। রমাপতি ঠাকুরের রাধা-বিরহের গান, 'সখী, শ্যামা না এলো' যেমন মধুর ও করুণ, সে-গানেও যেমন বৃক্ষচয় হয় অশ্রুধারময়'—মালসী গানও তেমনই মধুর ও করুণ। প্রকৃতিকে অবলম্বন করাতেই ভাব আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। উমা না আসায় কেবল মেনকাই বেদনাহত হন নাই হিমালয়ের পশুপক্ষীও বেদনায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। গিরিরাজ বলিতেছেন,

> রাণি গো শুধু তোমারই বেদনা বলে নয়।
> দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে
> উমার লাগিয়া ঝুরে, নিরানন্দময়।

—এ যেন কবি কালিদাসের শ্লোক শকুন্তলার বিরহে সমগ্র তপোবনভূমি কাঁদিয়া উঠিতেছে :

> উগ্গলিঅ দব্ভকবলা মিআ পরিচ্চত্ত নচ্চণা মোরা।
> ওসরিঅ পণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও ॥[১]

—মৃগের মুখের তৃণ খসিয়া পড়িতেছে, ময়ূর নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, লতা দুঃখে অশ্রুর ন্যায় পাণ্ডুপত্র মোচন করিতেছে। রমাপতি ঠাকুর সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্পর্কেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'সঙ্গীত মলাদর্শ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার কবিতায় কাব্যরসের সহিত গীত-রস একত্র মিলিত হইয়াছে।

গদাধর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৮৯৩)

গদাধর মুখোপাধ্যায় কবিদলের বিখ্যাত বাঁধনদার ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণা। ভোলা ময়রা, নীলমণি পাটনী প্রভৃতির দলের জন্য ইনি গান রচনা করিয়া দিতেন। ইনি বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসুর সখের দাঁড়াকবির দলের

১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম—চতুর্থ অঙ্ক

জন্যও গান বাঁধিয়া দিতেন। গদাধর মুখোর 'পুরবাসী বলে, উমার মা, তোর হারা তারা এলো ওই' গানটি খুব জনপ্রিয়। ইহার মধ্যে মায়ের ব্যাকুলতা ও মেয়ের অভিমানের মনোহর ছবি চিত্রিত হইয়াছে। উমা আসিয়াছে, সংবাদ পাইয়া মেনকা ছুটিয়া গিয়া উমাকে বলিতেছেন, 'আমার উমা এলে। একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে ॥'

কিন্তু উমা? সে ও ব্যগ্র বাহু দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। কিন্তু অভিমান জাগিতেছে, অভিমানে কাঁদিয়া বলিতেছে, 'কই, মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।. .গেলে নাকো নিতে, রব না যাব দুদিন গেলে।'

গৃহকন্যারূপে জগজ্জননীর এই অভিমান লীলার তুলনা কোথায়

অন্যান্য কবিওয়ালা

অন্যান্য কবিগায়কদের মধ্যে নবাই ময়রা জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নবাই ময়রার গানে নূতনত্ব আছে। কালীর কালারূপ দর্শন করিবার আকূতি অভিনব :

হৃদয় রাস মন্দিরে দাড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
একবার কালী ছেড়ে হও মা কাল
ওগো ও পাষাণের মেয়ে ॥

কুমার নবচন্দ্র রায় বিরচিত—'যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে?' গানটিকে অনেকে নবাই ময়রার রচনা বলিয়া মনে করেন।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে তেমন বিশেষত্ব কিছু নাই। 'আগমনী' গান রচনায় মা মেনকার স্নেহ ব্যাকুলতার চিত্রটি মন্দ নয়, উমাকে কাছে পাইয়া মেনকা বলিতেছেন,

ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী
তুই তো জগৎ-জননী,
ভাল, তা ব'লে মা একবার, মায়ে তোমার
মনে কর কৈ গো তারিণী।

—এ অনুযোগে জননী হৃদয়ের কাতরতা থাকিলেও,ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই—মায়ের মানবীয় ভাবটি এই ঐশ্বর্য্য-বোধের জন্যই ফুটি ফুটি করিয়াও ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই।

=টপ্পাগায়ক=

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৪)

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের নির্দ্দেশে প্রাচীন খেড়ু গানকে সংস্কার করিয়া, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে যিনি আদিরসাত্মক প্রণয় সঙ্গীতকে নবতর রূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত নিধুবাবু। তাঁহার পুরা নাম রামনিধি গুপ্ত। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই লোকে আদর করিয়া তাঁহাকে 'নিধুবাবু' বলিয়া ডাকিত। সঙ্গীতপারদর্শিতার জন্য তিনি বাঙলার 'শোরী মিঞা' নামেও পরিচিত ছিলেন। নিধুবাবু যে নবতর বৈঠকী সঙ্গীত সৃষ্টি করেন, তাহাকে 'আখড়াই' বলা হইত। হিন্দী খেয়াল বা টপ্পার মত করিয়া গান করা হইত বলিয়া এই গান 'টপ্পা' নামেও বিখ্যাত ছিল।

টপ্পা বা আখড়াই গানে এক বৈঠকে তিনটি করিয়া গান গাওয়া হইত: প্রথমে ভবানী-বিষয়ক গান, তৎপরে প্রণয়-গীত (বিরহ বা সখী-সম্বাদ), তাহার পর 'প্রভাতী'। নিধুবাবুর সখী-সম্বাদ ও প্রভাতীর প্রণয়-গীতিগুলিই শ্রেষ্ঠ। ইহা মানবীয় প্রেমের কান্ত-কোমল ভাবে, দুঃখে-শঙ্কায়, আবেগে-উচ্ছ্বাসে অতি মনোরম। এই গানগুলিকে আধুনিক প্রণয়-গীতির পথ-প্রদর্শক বলা চলে।

টপ্পার গানগুলি সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বদ্ধ। কবিওয়ালাদের গানে কথার বিস্তার, টপ্পায় কথার সঙ্কোচ, সুরের ওস্তাদি ও রাগরাগিণীর বিস্তার। এইখানেই কবি-গানের সহিত টপ্পার প্রধান পার্থক্য। কবিগানে ধর্মের মণি-মঞ্জুষায় মানবীয় ভাব, টপ্পায় কেবলই মানবীয় ভাব। মানব-জীবনের আনন্দ বেদনার সংবাদে, শিল্প-সঙ্গত সংযমবোধে টপ্পা গান অতি মনোহর।

নিধুবাবুর প্রণয়-গীতি যেমন কবিত্বপূর্ণ, মালসী গান তাহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ভাবের গাঢ়বদ্ধতা ব্যতীত ইহাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। তবে নিধুবাবুর প্রণয়-গীতিতে যে 'intense realism of passion' দেখা যায়, শাক্ত গীতিতেও তাহা বর্ত্তমান। শাক্তপদাবলীতে নিধুবাবুর একটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা মাতৃ-হৃদয়ের আবেগে উচ্ছল:

গিরি কি অচল হ'লে আনিতে উমারে।
না হেরি তনয়ামুখ হৃদয় বিদরে॥
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করে ধরি
উমা 'ওমা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে॥

শ্রীধর কথক

হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে শ্রীধর কথক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণি। শ্রীধর নিধুবাবুর সমসাময়িক এবং টপ্পা-গায়ক হিসাবে নিধুবাবুর পরেই তাঁহার স্থান। ইনি 'কবিরত্ন' বা 'কবিভূষণ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ভাবের সূক্ষ্মতায় ও সৌন্দর্যে শ্রীধর কথকের সঙ্গীতও নিধুবাবুর গীতাবলীর সমকক্ষ। উভয়েরই কৃতিত্ব প্রণয়-সঙ্গীত রচনায়। মানব-মনের তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সঙ্গীতগুলি অপূর্ব্ব। গানগুলির সাহিত্যিক দাবিও তুচ্ছ নয়।

শ্রীধর কথকের ভবানী-বিষয়ক গানেও ভাবময়। উমার আগমন উপলক্ষ্য করিয়া কবি মাতৃ-হৃদয়ের আনন্দকে ভাষারূপ প্রদান করিতেছেন,

গিরিরাজরে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এলো।

—এতদিন যে গিরিপুরী ছিল অন্ধকার, শূন্য—আজ উমার আগমনে তাহা আলোময় ও পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীপাঠে ঘটস্থাপনে দুর্গোৎসবের আনন্দ উমার আগমন-উপলক্ষে তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের এই আনন্দ উল্লাসিত চিত্র চিত্তাকর্ষক।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৫০-১৮২০)

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ও খ্যাতনামা টপ্পা-গায়ক। ইঁহার পিতার নাম বিজয়রাম। কালিদাস হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও শাস্ত্র অধ্যয়ন-মানসে ইনি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে যান। ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষাতেও ইনি পারদর্শী ছিলেন। আচারে-আচরণে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্ত্তায় মুসলমানী কেতাদুরস্ত ছিলেন বলিয়া, ইনি 'কালী মির্জ্জা' নামে অভিহিত হইতেন। কথিত আছে, রাজা রামমোহন রায় ইঁহার নিকট গান শুনিতেন। ইনি এককালে বর্দ্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের সভাসদ ছিলেন। পরে গোপীনাথ ঠাকুরের আশ্রয়ে বসবাস করেন। শেষ বয়সে কাশীতে কালী মির্জ্জার মৃত্যু হয়।

কালী মির্জ্জার প্রণয়-মূলক টপ্পা নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক হইতে উন্নতমানের নয়, কিন্তু 'মালসী' গানগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কালী মির্জ্জার মালসী গানগুলি সংহত, ভাব-বৈচিত্র্যে পূর্ণ, ইহাতে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও কবিত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান। কবির অলঙ্কার-প্রয়োগ নৈপুণ্যও লক্ষ্য করিবার মত। অলঙ্কার যেন ভাবেরই সজ্জা, রসের ইঙ্গিতবহ।

'চঞ্চল চরণে চলে অচল-নন্দিনী'—পদটিতে অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ব্রহ্মসনাতনীর বাল্যলীলার রূপটি চমৎকার ফুটিয়াছে, অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে নৃত্যছন্দটিও যেন পরিস্ফুট। 'আমি ওই ভয়ে মুদিনে আঁখি। নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে থাকি॥'—এ পদটিও ভাব-বৈচিত্র্যে সুন্দর।

'কেও বিহরে হর-হৃদি 'পরে, হর-মন হরে মোহিনী'—গানটিকে অনেকে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু গানটি কালী মির্জ্জার নামেই অধিক প্রচলিত।

অন্যান্য টপ্পা-গায়ক

অপর টপ্পা-গায়কদের মধ্যে শিবচন্দ্র সরকার, আন্দুলের জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক ও মুজা হুসেন আলির নাম উল্লেখযোগ্য। শিবচন্দ্র সরকারের 'ভুবনেশ্বরী মার রূপে ভুবনে নাহিক সীমা' গানটি তন্ত্রোক্ত 'ভুবনেশ্বরী' দেবীর ধ্যানানুবাদ কেহ কেহ পদটিকে মহারাজ শিবচন্দ্রের রচনা বলিয়া অনুমান করেন।

আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক সঙ্গীত-রসিক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতাও উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও টপ্পা রচনা করিয়া গান করিতেন। মল্লিক মহাশয়ের গান গতানুগতিক। গানগুলিতে শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'শঙ্করি করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চন'—পদটির প্রার্থনায় আন্তরিকতা নাই, তবে টপ্পাগায়ক-সুলভ অনুপ্রাস-প্রয়োগের প্রয়াস আছে।

মুসলমান হইলেও যে-হেতু মুজা হুসেন আলি ছিলেন টপ্পা গায়ক, তাই গীতারম্ভে তাহাকেও 'মালসী' গাহিতে হইত। 'যা রে শমন এবার ফিরি। এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি'—গানটির মধ্যে মুজা হুসেন 'কালভয়হারিণী' মায়ের শক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। মায়ের খাসতালুকে যিনি বসবাস করেন, তিনি নির্ভয়, মৃত্যুকেও তিনি অবহেলা করিতে পারেন। ভক্তির দিক হইতে না হইলেও ভক্তের মানসিক শক্তির প্রকাশ হিসাবে পদটির মূল্য আছে।

রূপচাঁদ পক্ষী

রূপচাঁদ দাস অর্থাৎ R. C. D, পক্ষী (Bird) ইঁহাদের বিশেষ উপাধি। উপাধিটি কৌলিক নয়। তখনকার দিনে একদল গায়ক নিজেদিগকে 'পক্ষী' বলিতেন, ইঁহাদের বিশেষ কুলজি-পুঁথি অনুযায়ী—ইঁহারা 'খগসম্পাতি কশ্যপনাতি'র বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিমতলানিবাসী বাবু শ্রীনারায়ণ মিত্র পক্ষীর দল গঠন করেন;—

পক্ষীর দলও টপ্পা-গায়কদের মত নূতন ঢংয়ে গান গাহিতেন। নিধুবাবুর টপ্পার আসরে ইঁহাদের সমাদর ছিল। রূপচাঁদ পক্ষী বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরহরি দাস।

'পক্ষীর দলের পক্ষীসকল ভদ্রসন্তান, উপস্থিত বক্তা, উপস্থিত কবি, বাবু এবং সৌখীন নামধারী 'সুখী' ছিলেন।'[১]

পক্ষীর দলের বিখ্যাত পক্ষী রূপচাঁদ। ইংরাজি-বাংলা মিশাইয়া বিচিত্র কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করিয়া ইনি গান রচনা করিতেন। গানগুলি নূতন ইংরাজি শিক্ষিত, বিলাসী বাবুদলের তৃপ্তিসাধন করিত। যেমন রুচি, তেমনই গান। গানগুলি অনেকটা প্যারডি ধরনের। ভক্তি-মূলক রাধাকৃষ্ণলীলার কৌতুকাবহ চিত্র, তখনকার বাবুদলের রুচির পরিচয় বহন করে। রূপচাঁদ পক্ষীর বৈষ্ণব পদাবলীর একটি নমুনা,—

লেট মি গো ওরে দ্বারী
আই ভিজিট টু বংশীধারী
এসেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের ব্রজনারী।
বেগ ইউ ডোর কিপার,
লেট মি গেট, আই ওয়াণ্ট টু সি ব্লক-হেড,
ফর হুম্ আউয়ার রাধে ডেড,
আমি তারে সাচ্চ করি॥

ধর্মকে ইনি এই এক দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভক্তি অপেক্ষা বাইরের মাতামাতি বেশি ছিল; সব কিছুকেই হাসির দৃষ্টিতে দেখিয়া ইনি লঘু-তরল গান রচনা করিতেন। বৈরাগ্যের কথা বলিতে গিয়াও কৌতুক করিতেন। ধর্মের প্রতি একটু বক্র কটাক্ষও ছিল, যেমন,

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয়-মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছ বেমালুম্।
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদসারুম্।

—ইহা মোহ-মুদ্গর, না শ্লেষ-উদ্গার। 'মনোদীক্ষা', না নব্য ইংরাজি শিক্ষার বুকনি।' কেবল ধর্ম্ম কেন, যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই ইনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। কন্যার বিবাহে অভিভাবককে নাকাল হইতে হইতেছে, আর্য্যজাতি অবনতির দিকে যাইতেছে, বাবুর দল 'বাগান-সর্ব্বস্ব'—সবই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, 'আপন দোষে যাচ্ছে টেঁসে ভারতী'।

১। বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব।

রূপচাঁদ পক্ষীর কতকগুলি গানে কিছুটা গাম্ভীর্য্য আছে। 'নবমী নিশি পোহাল, কি করি কি করি বল' গানটিতে উমার বিজয়া উপলক্ষ্য করিয়া মাতৃ-হৃদয়ের বেদনা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তি ও আন্তরিকতা কতখানি আছে তাহা বিচার্য্য নয়। বাবুরাও সখ করিয়া যে 'নবমী', 'বিজয়া' গাহিতেন ('কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটা কচ্চেন')[১], সেই গানের নমুনা রূপচাঁদ পক্ষীর গীতাবলীতে আছে। 'ভোরাও ওক্তে ভয়রো রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হোলো',—এ গানে ভক্তি না থাকিলেও রসিকতা থাকিত, বিবিধ রাগ ও রাগিণীর আলাপও থাকিত। রূপচাঁদের গান তৎকালীন বাবুদের 'নবমী-বিজয়া' গাহনার দৃষ্টান্ত।

=পাঁচালিকার=

দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭)

দাশরথি রায় বাঙলা দেশের জনপ্রিয় পাঁচালিকার। তিনি বর্দ্ধমানের বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। শৈশবাবধি তিনি মাতুলালয় পীলা গ্রামে প্রতিপালিত হন। দাশরথিও কবিদলের বাঁধনদার হিসাবে গীতের আসরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'চাপান', 'উতোর'-এর বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচালি রচনা করিয়া গান করিতে থাকেন। নূতন পাঁচালি গানের গায়ক হিসাবেই তিনি বিখ্যাত। তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া 'দাশু রায়' বলিয়া ডাকিত।

দাশরথি রায়ের পাঁচালি দোষে-গুণে মিশ্রিত। তৎকালীন অনুপ্রাস-যমকের আড়ম্বরে রচনা পূর্ণ; গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার চিহ্নও প্রচুর। তথাপি দাশরথি রায় 'দাশু রায়'; তাহার প্রধান কারণ, তিনি যুগের ধারা অনুযায়ী লোকের রসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পদের লালিত্য ও বক্র কটাক্ষ—দুইই লোকের রুচিকর ছিল: 'দাশুর রচনা ভ্রমরের মত, — মধু কিন্তু হুলে বিষ বহন করে'—আচার্য্য দীনেশ সেনের এই মন্তব্য মিথ্যা নয় (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')।

দাশরথি রায় অবিশ্রান্ত লেখক ছিলেন, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা যে তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে প্রভাস, চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞ, জন্মাষ্টমী, গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি পালা প্রসিদ্ধ। তৎকালে দাশু রায়ের অসংখ্য গান

১। হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাঁহার বিদ্রূপ, ব্যঙ্গরস, কবিত্ব, লৌকিক জ্ঞান প্রভৃতির জন্য তাঁহার পাঁচালি সকলের হৃদয় হরণ করিয়াছিল।

সাধারণ লোকের স্থূল রস-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি যে অতি তরল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, পারমার্থিক সঙ্গীতগুলির জন্যই দাশু রায় অমর হইয়া থাকিবার যোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনের গ্লানি-দীনতার ঊর্দ্ধে এই সকল গানের স্থান, যেন পঙ্কোর্দ্ধে পদ্মের মত। ভক্তির আবেগ, বিশ্বাসের নিবিড়তা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সঙ্গীতগুলি হৃদয়-হারী। এগুলিতে শ্লেষ নাই, কুরুচির পরিচয় নাই, কেচ্ছা নাই: এগুলিতে আছে ভক্ত হৃদয়ের গভীর আকুতি, স্বীয় দীনতার স্বীকারোক্তি, এখানে বৈরাগ্য, অনুশোচনা, সাশ্রু কাতরতা।

দাশু রায়ের শ্যামাসঙ্গীতগুলিতেই এই পারমার্থিক আকুতি গভীর হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'আগমনী' গানগুলির মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের বেদনার চিত্র অতীব মর্ম্মস্পর্শী:

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো।

উমাকে বিদায় দিতে গিয়া, মায়ের সকাতর আবেদন আরও মর্ম্মান্তিক:

গিরি, যায় হে লয়ে হর প্রাণকন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী,
বাঁচে পাষাণী, গিরি, যায়।

দাশুরায়ের 'আগমনী' ও 'বিজয়া'য় মাধুর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'মা বলে মা ডাকে, মুখে আধআধ বাণী' যে উমা, তিনি যে ত্রিভুবন-মান্যা তিনি যে 'ব্রহ্মময়ী, এক'। তিনি বিস্মৃত হন নাই। কবিওয়ালাদের মত মাধুর্য্যের আবেগ আবর্ত্তে দাশু রায় ভগবতীর ঐশ্বর্য্যকে ডুবাইয়া দেন নাই।

ঐশ্বর্য্য বোধকে উদ্দীপ্ত রাখিয়াই তিনি নৃত্যকালীকে স্বীয় হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছেন:

কর কর নৃত্য, নৃত্যকালী একবার মন-সাধে
রণক্ষেত্রে মা। মোর হৃদয় মাঝে।

জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন, মানুষের পতন মানুষেরই নিজ-কৃত কর্ম্মের পরিণাম, তাই আত্মানুশোচনায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিয়াছেন,

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কুমতি তাঁহাকে অধঃপতনের দিকে আকর্ষণ করে, তাই কবির প্রার্থনা 'আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি রক্তবীজে।' তারও পরে আরও আকাঙ্ক্ষা আছে, মাতৃ-চরণ-নির্ভর ভক্তের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা,

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি,
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।

কারণ, এই সুগভীর বিশ্বাস সন্তানে আছে যে, 'কালহরা কালীমন্ত্র', ডাকিলে 'জয় কালী বলে, কাল ভয়ে পলায় অমনি।'

দাশু রায়ের শ্যামাসঙ্গীত ভক্তের ভক্তিপ্লুত পুষ্পাঞ্জলি। তাঁহার আক্ষেপ ও আত্মনিবেদনের পদগুলি অশ-শুদ্ধ বলিয়াই তাহা অন্তরকে এমন করিয়া স্পর্শ করে। তখন মনে হয় না দাশু রায় লোক-রঞ্জক পাঁচালিকার, মনে হয়, তিনি ভক্ত, তিনি সাধক কবি।

রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৯৩)

রসিকচন্দ্র রায় হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রাম। পিতার নাম হরিকমল রায়। ইনি দাশরথি রায়ের সমসাময়িক। পাঁচালি গায়ক হিসাবে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দাশু রায়ের মত বহুব্যাপক খ্যাতির অধিকারী না হইলেও পাঁচালি-গায়করূপে রসিক রায়ের সুনাম ছিল। কুরুচি-দুষ্ট বলিয়া পাঁচালিগানের অখ্যাতি আছে, তাহার প্রধান কারণ, পাঁচালিকারকে প্রাকৃত জনের রসতৃষ্ণা মিটাইতে হইত, তাই রঙ্গ-রসের নামে ভদ্রজনের রুচি বিগর্হিত ভাবও পরিবেশন করিতে হইত। কিন্তু গায়কগণ যখন আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে তান ধরিতেন, তখন তাহারা অন্য জগতের মানুষ হইয়া যাইতেন। তখন ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ভাবের ব্যাকুলতায় গায়কেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত, চোখে অশ্রুধারা নামিত। মুহূর্ত্তের জন্য শ্রোতৃবর্গকেও স্তম্ভিত হইতে হইত এবং তাহাদের নয়ন-যুগল বাষ্পাকুল হইয়া উঠিত।

রসিক রায়ের পাঁচালিগানের মধ্যেও এই ধরনের পারমার্থিক সঙ্গীতের সংখ্যা কম নয়। তাঁহার কতকগুলি সঙ্গীতে দাশু রায়ের স্পষ্ট প্রভাব আছে বিশেষ করিয়া আগমনী

ও বিজয়ার গানগুলিতে এই প্রভাব বেশি। উমার মত মেয়ের জননী হইবার সৌভাগ্যে মেনকার গর্ব্বোল্লাসিত বাৎসল্যমিশ্রিত উক্তিটি গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ :

জগৎ ভুলে যার মায়ায়
ভুলেছে সে আমার মায়ায়
একবার কোলে মা আয়,
মা, আয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

কবিওয়ালাদের গানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগমনী-বিজয়ার গানগুলি ছাড়া সাধন-রাজ্যের কথা নাই। পাঁচালিগায়কের গানে সাধন-রাজ্যে প্রবেশের আকৃতি আছে। রসিক রায়ের পাঁচালিতে সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান। গ্রাবুখেলার রূপকে রায় মহাশয় শক্তি-সাধনার কথা কহিয়াছেন,

সাধনরূপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা মেরে।

শুধু তাই নয়, সাধনার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া, মানস-পূজায় 'সাধনরাজ্যের কার্য্যের অধিকার' লাভ করিয়া সাধন সমরে অবতীর্ণ হইবার সাহসও তাঁহার আছে,—

আয় মা সাধন-সমরে,
দেখবো মা হারে, কি পুত্র হারে।

শক্তির গূঢ়তত্ত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। 'যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও, নয় নে যাও পারে।'—এ তত্ত্ব তিনি জানেন এই 'ইচ্ছাময়ী মা'-ই 'ব্রহ্মময়ী' জননা :

ত্যজ্য করি নির্ব্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে
সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী॥

রসিক রায়ের গানের বিবেক-বৈরাগ্য, মানসপূজা, শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের কথা সুগভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। ইহা বহু-শ্রুতত্ত্বের পরিচায়ক। পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় গানগুলিতে জ্ঞান ও ভক্তির সাযুজ্য ঘটিয়াছে।

ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১-১৮৭৬)

ঠাকুরদাস দত্তের নিবাস হাওড়া বাঁ্যাটরা। ইনিও দাশু রায়ের সমসাময়িক। যাত্রা ও পাঁচালি উভয় প্রকার গানে তাহার সুনাম ছিল। ইনি 'বিদ্যাসুন্দর', 'শ্রীমন্তের মশান', 'দুর্গামঙ্গল' প্রভৃতি পালা গান করিতেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত পাওয়া যায়। ঠাকুরদাসের রচনা প্রাঞ্জল, স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে। 'গিরি, কারে আনিলে, এনে কার তনয়া প্রবোধিলে?'—এই পদটিতে মেনকার বিস্ময়-বোধের

মধ্য দিয়া অদ্ভুত রস সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই ধরনের রচনা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশু রায় প্রভৃতির গানেও দুর্লভ নয়।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পাঁচালিকার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও বিখ্যাত। দ্বিজ নবীনের শ্যামাসঙ্গীত পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুরে ভরপুর। খাঁটি ভক্তের মত তিনি কেবল মাতৃচরণ কামনা করিয়াছেন। সংসারের সামান্য ধনে তিনি অভিলাষী হন নাই—'যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী'। তিনি মোক্ষপদও কামনা করেন না, মায়ের শ্রীচরণে স্থান পাইলে, 'মোক্ষপদ সামান্য গণি'—ইহাই ভক্তের উক্তি। 'সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী'—এই প্রার্থনাই ভক্ত কবি দ্বিজ নবীনের শ্যামাসঙ্গীতের প্রধান প্রার্থনা। কোথাও কোথাও ভক্ত-জনোচিত মানসিক দৃঢ়তাও আছে; ভক্তি ও প্রপত্তি হইতেই এই দৃঢ়তা আসিয়াছে।

যাত্রাওয়ালা

মদন মাস্টার

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমে, বাঙলা দেশে যাত্রাগানের বড় সমাদর ছিল। প্রথমতঃ 'কৃষ্ণযাত্রা' ছিল প্রধান গাহনার বিষয়। ক্রমে 'চণ্ডীযাত্রা', 'রামযাত্রা' ইত্যাদির প্রচলন হয়। প্রথম দিকে প্রধান যাত্রাওয়ালা হিসাবে পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, বদন অধিকারীর নাম দেশজোড়া বিখ্যাত ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাও একদা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই কৃষ্ণযাত্রার পালা গাহিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ 'চণ্ডীযাত্রা'য় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

মদন মাস্টার প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন। উৎকৃষ্ট যাত্রাওয়ালা হিসাবে মদন মাস্টারের সুনাম ছিল। কালক্রমে মদন মাস্টারের দল ভাঙ্গিয়া 'বৌ মাস্টার', 'বৌ কুণ্ডের দল' গঠিত হইয়াছিল। যাত্রাপালায় মাঝে মাঝে অতি উৎকৃষ্ট গান থাকিত; গানগুলি যে যাত্রার অধিকারীরাই রচনা করিতেন, এমন নয়, তবে গানগুলি অধিকারীর নামেই চলিত। মদন মাস্টারের নামে কয়েকটি সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত চলিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য :

আর অভিমান করিস্ নে মা
ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি।
দুনয়নে বহে ধারা, মা হয়ে কি সইতে পারি ?

মদন মাস্টারের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত গানটি অধিক সমাদৃত :

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ॥

গানটির মধ্যে দিব্যভাবের তীর্থস্নান ও মানস জপের কথাগুলি, একজন প্রকৃত সাধকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাতৃনামের মহিমায় গানটি পরিপূর্ণ।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)

বর্দ্ধমান জেলায় ধরনী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। নীলকণ্ঠের যাত্রা অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমে ইনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে ছিলেন; অধিকারীর মৃত্যুর পর দল ভাঙ্গিয়া গেলে নীলকণ্ঠ নিজেই এক দল গঠন করেন। ক্রমে নীলকণ্ঠের দল রাঢ় অঞ্চলের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে।

নীলকণ্ঠ যাত্রার অধিকারী বলিয়াই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; আসলে তাঁহার আন্তরিক ভক্তিমার্গ, গান ও ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনেকটা পাঁচালির প্রভাব সূচনা করে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন, 'দাশরথির আসল ভাবশিষ্য হইতেছেন ভক্ত কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়...নীলকণ্ঠের গানে দাশরথিরই ভক্তি-উচ্ছসিত প্রতিধ্বনি শুনি।'[১]

নীলকণ্ঠের গান 'কণ্ঠের পদ' বলিয়া বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা হইলেও ছিলেন ভক্ত, কবি-প্রতিভাও তাঁহার ছিল। নানা শাস্ত্রেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তির উচ্ছ্বাস মিলিত হওয়ায় 'কণ্ঠের গীত' এত মধুর। 'মা আমার আজ বৃন্দাবনে হয়েছেন কালশশী', 'মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে' প্রভৃতি গানে শক্তির গভীর তত্ত্ব, জগজ্জননীর বিশ্বব্যাপিনী রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। 'কণ্ঠের পদে' ভাব অনুযায়ী ছন্দের প্রয়োগ এবং শব্দ-নির্ব্বাচনের কৌশল দৃষ্ট হয়। মুণ্ডালী কালীর ভীষণ রূপবর্ণনায় নীলকণ্ঠ ভাবোপযোগী ছন্দে, ধ্বন্যাত্মক তরল ও গম্ভীর শব্দ-প্রয়োগে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর :

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

ঘোর ধ্বান্তবরণী, দুঃখান্তকরণী, কার কামিনী, কামান্ত-উরে।
বামোর্দ্ধ করে অসি করিছে ঝক্ ঝক,
ফণা বিস্তারি ফণী করিছে লক লক,
নৃমুণ্ড মুখে উঠে শোণিত হক হক্
চক্ চক্ করি শিবা পান করে॥

নীলকণ্ঠের 'আগমনী' গান জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির স্পর্শে সমুজ্জ্বল। তাঁহার,—

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো,
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে—

পদটির মাতৃস্নেহ, লৌকিক ভাব রাজ্যের উপরে এক অলৌকিক ভক্তির রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ যেন লৌকিক ভাব ও অলৌকিক ভক্তির মণিকাঞ্চন সংযোগ।

ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৫)

ব্রজমোহন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত তেতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজমোহনের যাত্রার দল প্রসিদ্ধ। পাঁচালী গানের মধ্যে যাত্রার উপাদান মিশাইয়া তিনি যাত্রাগানের নূতন রূপ সৃষ্টি করেন। প্রথমে তিনি পাঁচালিকার ছিলেন, পরে যাত্রার দল খোলেন।

ব্রজমোহনের যাত্রা গ্রামাঞ্চলে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। পালাগুলির গীতাংশ বিশেষত্বপূর্ণ। 'কাননে যে ফুল ফুটেছে নানা জাতি' গানটিতে বিবিধ ফুলের তালিকা, 'দেখ জলে জলে দলে দলে মাছে করে খেলা' গানে নানা-জাতীয় মৎস্যের নাম, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের মনেই কৌতুক ও আনন্দ সঞ্চার করিত। ব্রজমোহনের গানে দাশু রায়ের প্রভাব বর্ত্তমান। 'কে রণরঙ্গিণী! কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।' পদটি দুর্গার বেশে উমার হিমালয়ে আগমনে মা-মেনকার বিস্ময়-প্রকাশক পদ। এই ধরনের পদ প্রাচীন শাক্তপদাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়।

তিনকড়ি বিশ্বাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জনপ্রিয় যাত্রাকার, ইনি কলিকাতা-নিবাসী। তাঁহার যাত্রার পালায় কতকগুলি শ্যামাসঙ্গীত পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত গানটিতে ভব-সাগরে নিমজ্জমান বদ্ধজীবের অসহায় অবস্থার সহিত মাতৃ-কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হইয়াছে:

কোথায় গো মা ভব-দারা ভবার্ণবে ডুবে মার।
দয়া করে দেও মা তারা, তোমার ঐ চরণতরী॥

নাট্যকার

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবি-গানের ছাঁচে, পাশ্চাত্য-প্রভাব-সম্বলিত নাটকে পরিবর্তন আনয়ন করেন মনোমোহন বসু। নব্যযুগের হইয়াও তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি একাধিক যাত্রা-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক রচনাগুলির মধ্যে ভক্তিরসের প্রবাহ মনোমোহন বসুর নাটকের অভিনবত্ব সূচনা করে। পরবর্তী পৌরাণিক নাটকে ও যাত্রায় মনোমোহন বসুর প্রভাব সুস্পষ্ট। 'মনোমোহন-গীতাবলী'—তাঁহার রচিত কবি, পাঁচালি ও যাত্রানাট্যে সন্নিবিষ্ট গানগুলির সঙ্কলনগ্রন্থ। ইহাতে নানা ভাবের গান আছে। মনোমোহন কবিগান ও পাঁচালি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে।
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না, দিতে এনে॥

—এই গানটির মধ্যে 'আগমনী' গানের কারুণ্য ও সন্তান-বিরহাতুরা রমণীর স্বামীর প্রতি অনুযোগ ধ্বনিত হইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)

হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর-পরিবারের এক তরফ পাথুরিয়াঘাটায় থাকিতেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, আই, বাহাদুর এই পরিবারভুক্ত। তিনি নাট্যাভিনয়ের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনটি ছিল সনাতনপন্থী। 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' তাঁহার নামেই প্রচলিত। এই নাটকে কয়েকটি ভাল ভাল গান আছে। যতীন্দ্রমোহনের শ্যামাসঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষা কবিত্বপূর্ণ।

তুষার ধবলহৃদে নীলিম নলিনী।
হরহৃদি মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥

—পদটিতে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষায় 'জগজ্জননী'র শ্যামামূর্তিটি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

'নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝার।
তুমি তো শ্মশানপ্রিয়—শ্মশান হৃদয় আমার॥'

—এই পদে শোকে-তাপে জর্জরিত, স্বজন-বিয়োগে বিধুর আর্তের আকুতি অতি করুণ। কল্পনারও বিশিষ্টতা ইহাতে আছে।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

ঢাকা-নিবাসী হরিশ্চন্দ্র মিত্র ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার 'আগমনী' সুন্দর একখানি গীতাভিনয়। হরিশ্চন্দ্র সুকবি ছিলেন, তাঁহার 'আগমনী' গানগুলি কবিত্বের স্পর্শে উজ্জ্বল। 'গিরি, কি সুধাও হে সমাচার' গানটিতে মেনকার দুঃস্বপ্ন বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি পৌরাণিক কাহিনীকে ঘরোয়া রূপ দিয়াছেন।

মিলন-বাৎসল্যের আর একটি পদে দেখা যায়, বহুদিন পরে উমা মায়ের কাছে আসিয়াছেন। আনন্দে মায়ের নয়নে পুলকাশ্রু দেখা দিয়াছে। উমাকে দেখিবার পক্ষে অশ্রুধারা বাধা সৃষ্টি করিতেছে, তাই মা অশ্রুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন:

থাক, থাক, থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা।
না হেরে যে উমা, তারা, বহিতে শ্রাবণের ধারা
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা একি ধারা?

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের আগমনী গানে সূক্ষ্ম অনুভূতির বর্ণনাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

হরিমোহন রায়

নাটককে গীতবহুল করিয়া গীতাভিনয় সৃষ্টির ব্যাপারে হরিমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অপেরা বা বিশুদ্ধ গীতিকা তৎপূর্বে কেহ রচনা করেন নাই। হরিমোহনের রচনায় ইংরাজী অপেরা অপেক্ষা দেশীয় যাত্রা ও পাঁচালির প্রভাব বেশি। ইনি প্রথমে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকে গান যোজনা করিয়া নাটকটিকে গীতাভিনয়ের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার 'শ্রীবৎস চিন্তা', 'ইন্দুমতী' বিখ্যাত গীতি-নাট্য। প্রচুর গান থাকায় তাঁহার রচনা যাত্রার দলেও সমাদৃত হইয়াছিল। যাত্রা ও নাটকের মধ্য পথ অবলম্বন করায় তাঁহার রচনা উভয় স্থানেই আদৃত হইত। কাব্য রচনাতেও হরিমোহনের হাত ছিল

হরিমোহন রায়ের অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্যে শাক্ত সঙ্গীতগুলিও উল্লেখযোগ্য। জগজ্জননীর রণ-রঙ্গিণী, কৃপাণ-ধরা রূপ দেখিয়া কবি কাতরভাবে তাঁহাকে এ রূপ সম্বরণ করিতে বলিতেছেন। মায়ের রূপবর্ণনায় বলিষ্ঠ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। অতি কোমল অনুযোগ মিশানো বিস্ময়-বোধটিও বেশ ফুটিয়াছে:

কোথা মা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদাকার,
করাল বদনে বিষম হুঙ্কার, পদভরে করে টলমল ধরা!

বনোয়ারীলাল রায়

বনোয়ারীলাল রায় সুকবি। তিনি নব্য রোমান্টিক কাব্যের অনুসরণে 'যোজনগন্ধা', 'জয়াবতী' প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন। নাটক-রচনাতেও তাঁহার হাত ছিল। সঙ্গীত-রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটকের গানগুলি ইনিই রচনা করিয়া দেন। তাঁহাব রচিত 'চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে' নৃত্যপরা কালীর এই রূপবর্ণনাটি বড় সুন্দর :

ওহে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে !
মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে !

—গানটিতে ভবভূতির প্রভাব আছে। অবশ্য ভবভূতি-বর্ণিত চামুণ্ডার নৃত্যপরা রূপটি আরও জীবন্ত, বর্ণনা আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র

গ্রেট ন্যাশন্যাল, এমারেল্ড প্রভৃতি রঙ্গালয়ের জন্য ছোট ছোট অভিনয়োপযোগী গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করিয়া অতুলকৃষ্ণ মিত্র যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার 'নন্দবিদায়' গীতাভিনয় একদিন অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। অতুলকৃষ্ণের 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতাভিনয় দুইটিও সুপ্রসিদ্ধ।

কোলে তুলে নে মা কালী
কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে !
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী ব'লে।

—এই গানটিতে, সংসার-জ্বালায় কাতর ভক্তের পারমার্থিক শান্তির আকূতিটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

বাঙলা দেশের স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে, পরে কলিকাতায় বাসস্থান স্থানান্তরিত করা হয়।

অভিনেতা ও নাট্যকার-রূপে গিরিশ ঘোষ অতুলনীয়। তাঁহার জীবনের অন্য একটি ভূমিকা আছে, তাহা ভক্তের ও শিষ্যের ভূমিকা। ইনি যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপা-ধন্য। তাঁহার রচনাবলীতে এই কৃপার মূল্য অসাধারণ।

গিরিশ ঘোষের অধিকাংশ রচনা ঠাকুরের জীবনাদর্শ, সরল কথামৃত, ঔদার্য্য ও ভক্তি-ধারার রূপায়ণ। গিরিশচন্দ্র নিজে বহুশ্রুত ছিলেন, তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান অসামান্য। এই জ্ঞান সিদ্ধ-সাধক পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন: তাহার ধর্ম্ম তন্ত্রের দিব্য মন্ত্রের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতে সমুজ্জ্বল।

গিরিশচন্দ্র প্রায় শতাবধি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এই সকল নাটকে অসংখ্য শাক্তগীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার 'আগমনী' গীতিনাট্যখানা প্রথম দিকের রচনা, ইহাতে মাতৃ-স্নেহের অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। গিরিশ ঘোষের আগমনী বিষয়ক গানগুলি এই গীতি-নাট্য হইতেই সমুদ্ধৃত। গিরিশচন্দ্রের আগমনী গানে উমা ও মেনকা উভয়েরই অভিমানাত্মক উক্তিগুলি বড় সুন্দর, ঘরোয়া ভাবও চিত্তাকর্ষক। উমার মুখে স্বামী শিবের আত্মভোলা ভাবের বর্ণনা ও উমা অন্ত প্রাণের উক্তিটি অভিনব: উমা বলেন,

তুমি তো মা ছিলে ভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না মা, আমা বই॥

'জগজ্জননীর রূপ' বর্ণনায় কবি তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুসরণ না করিয়া, মায়ের (কালী বা তারার) যে রূপমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতিশয় মনোরম:

মদমত্ত মাতঙ্গিনা উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলজাল বিজড়িত পায় পায়॥

এ যেন ভক্তের ধ্যানে আবির্ভূত মায়ের এক নূতন মূর্ত্তি।

কবির মাতৃ-নির্ভরতাও অপরিসীম: 'মা' বলিয়া কাঁদিলে জননীর প্রাণে সয় না, 'মা বলে, 'আয় রে কোলে, মুখ মুছায়ে কোলে টানে'—করুণাময়ী মায়ের এই স্নেহে কবির কোন সংশয় নাই। অভিমান থাকিলেও, মাতৃস্নেহে অভিমান ভাসিয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের কতিপয় মাতৃ-সঙ্গীত শক্তি-তত্ত্বের কাব্যরূপ। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলিয়াই, গিরিশ ঘোষের গানে তত্ত্ব রসোত্তীর্ণ কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'আগমনী' বাৎসল্যরসের আধার, মুণ্ডমালিনী, কৃপাণ-ধরা, নৃত্যপরা জগজ্জননীর রূপবর্ণনা যুগপৎ অদ্ভুত ও রৌদ্র রসের আশ্রয়—সর্ব্বত্রই ভক্তিরসের স্পর্শ। গিরিশ ঘোষ একাধারে ভক্ত ও মহাকবি, তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলীও ভক্তিতে ও কবিত্বে হৃদয়গ্রাহী।

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

প্রাচীন ও নবীন ধারার যুগসন্ধিকালের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইনি 'গুপ্তকবি' নামে বিখ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইঁহার নাম অবিস্মরণীয়। দেশীয় ভাব ও ভাষার প্রতি আন্তরিক প্রীতি লইয়া তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ব্যঙ্গাত্মক রচনার কবিরূপেই গুপ্তকবির সমধিক খ্যাতি; তাহার পারমার্থিক রচনাগুলিও আন্তরিকতাপূর্ণ। গুপ্তকবি স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

নদীয়া জিলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশব হইতেই কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। প্রথমে ইনি কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা গুপ্তকবির রচনার অন্যতম বিশিষ্টতা। রামপ্রসাদাদি প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহে তাঁহার দান অসামান্য।

গুপ্তকবির শ্যামাসঙ্গীতগুলির মধ্যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় বর্তমান। পৌরাণিক কাহিনী লইয়া লৌকিক রস সৃষ্টি করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কবির ছিল। 'আগমনী' গানে যোগাচারী শিবের যে ভিখারী-মূর্তি তিনি অঙ্কন করিয়াছেন, মায়ের কল্পনায় দুঃখাঘাতে জর্জ্জরিত উমার যে ভৈরবী-মূর্তির আলেখ্য দিয়াছেন, তাহা অভিনব। তাঁহার রচিত 'কৈলাস সংবাদ শুনে মরি হে পরাণে'—গানখানি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, শ্রীধর কথকের গানেও সঙ্গীতটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীতগুলির মধ্যে,—

> কে রে বামা বারিদ-বরণী তরুণী ভালে ধরিছে তরণী
> কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী করিছে দনুজ জয়।

—প্রভৃতি গান অনুপ্রাসের ঘটায়, শব্দের চাতুর্য্যে, কল্পনার বাহাদুরিতে চমৎকার। ব্যাজস্তুতির সাহায্যে দৈব বিভূতির মধ্যে লৌকিক ভাবের স্পর্শগুলিও সুন্দর। গুপ্ত-কবির রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে। উমা পিতৃ-গৃহে যাইবেন, অনুমতি লইবার জন্য আসিয়াছেন স্বামী শিবের নিকট। শিব উত্তর করিতেছেন :

> জনকভবনে যাবে ভাবনা কি তার।
> আমি তব সঙ্গে যাব কেন ভাব আর॥

আহা আহা মরি মরি বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরী কেঁদ নাকো আর ॥

—রচনায় গ্রাম্যতার স্পর্শ থাকিলেও, এইরূপ স্থূল রসপূর্ণ রচনাই এককালে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। গুপ্তকবির রচনা সর্ব্বত্রই সরস। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিযা গিযা পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।' এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)

হরিনাথ মজুমদার গুপ্তকবির শিষ্যদলের একজন ইনি 'নিঃস্ব, নিষ্কাম, নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমিক' (ডাঃ সুকুমার সেন)। ইনি গ্রামবার্ত্তা পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। ইঁহার 'চারুচরিত্র', 'পদ্মপুণ্ডরীক', 'কবিতা কৌমুদী' প্রভৃতি কবিতার পুস্তক এককালে সমাদৃত হইযাছিল। হরিনাথ মজুমদার 'বাউল' গান গাহিয়া একদিন দেশকে মাতাইয়াছিলেন। ইনি গানে 'কাঙ্গাল', 'ফিকিরচাদ' প্রভৃতি ভণিতা দিতেন। কাঙ্গালের পারমার্থিক সঙ্গীতগুলি প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

কাঙ্গালের গান বাউলের হৃদযের গান। বাউলগণ প্রেমভরে 'মনের মানুষ' এর খোঁজ করেন, কাঙ্গাল 'মাযে'র গানে বিভোর হইযাছেন। তিনি মাতৃস্নেহের কাঙ্গাল। আবেগের সহিত সত্যকারের কবিত্ব এবং ভাবের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওযায কাঙ্গালের গান প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করে। গানগুলি যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত। কাঙ্গাল বলেন,

যদি ডাকার মতন পারিতাম ডাক্‌তে
হায রে তবে কি মা, এমন করে তুমি
লুকিযে থাক্‌তে পারতে ?

সরল কথায় অন্তরের এমন সরল প্রকাশ, একান্ত সরল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

কাঙ্গালের 'নবমী' ও 'বিজযা' হৃদযের ক্রন্দনে-উচ্ছ্বাসে উদ্বেল : নবমী নিশিকে বিলম্বিত করিবার জন্য মেনকার কাতর প্রার্থনা যেন কবিরই অন্তরের প্রার্থনা। 'শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে', গানখানি প্রেমিক ভক্তের অশ্রু-ধৌত। 'বিজয়া'র অন্তর্গত 'মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে' সঙ্গীতটি আরও মর্ম্মস্পর্শী। মেয়েকে বিদায দিতে মাতৃ-হৃদয বিদীর্ণ হইয়া যায, তবু বিদায দিতে হয। উমাকে সর্ব্বব্যাপিনী বোধ করিয়া মা সান্ত্বনা লাভ করেন। কাঙ্গালের সহজ বুঝ : 'কাঙ্গাল বলে, মাগো সহজ বুঝ আমার।' সাধারণ লোকের যে দৃষ্টি, কাঙ্গালের দৃষ্টি তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তাই মায়ের ব্রহ্মময়ী রূপ

দেখিতে বা অনুভব করিতে তাঁহার ভুল হয না: 'চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী, তুমি নাই যথায়, এমন স্থান আব কৈ?' রূপময়ী হইয়াও মা অরূপ—এই স্বরূপ বোধ কাঙ্গালের হৃদি-গত। কঠোবতা সত্বেও তিনি কোমল, 'সর্বমঙ্গলা সুন্দরী',—বিরাট বলিয়াই 'অসীম অম্বব সম্ববিতে নারে, তাইতে নাম ধবেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী'—এই জ্ঞানে তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠিত। 'শিবেব প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি'—উক্তিগুলি সুগভীর শক্তি-দর্শনেব সহজ ভাষ্য।

সহজ ভাব, সহজ বুঝ বলিযাই কাঙ্গাল মায়েব সহজ পূজায় বিশ্বাসী। ভারত শক্তি-পূজা কবিযাও শক্তিহীন কেন, তাঁহাব কাবণ তিনি বুঝিযাছেন: ভারতবাসীব পূজায আডম্বব আছে, আন্তরিকতা নাই,—সমাবোহ আছে, ভক্তি নাই। ভাবত স্বার্থমগ্ন, ভেদবুদ্ধিতে একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন, জাতি-বিচাবে শতধা বিচূর্ণ। অথচ শক্তিপূজায় প্রযোজন—ভক্তি, অভেদবুদ্ধি ও প্রেম। তাই কাঙ্গাল বলেন, 'শক্তিপূজা কথাব কথা নয',—'ডাকেব গযনায, ঢাকেব বাজনায শক্তিপূজা হয না':

যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কব নাশ
বলিদান কব বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কয কাতবে, জাতি-বিচাবে, শক্তি পূজা হয় না।
সকল বর্ণ এক হযে, ডাক মা বলিযে
নইলে মাযেব দযা কভু হবে না ॥

কাঙ্গালেব গান প্রেমভক্তিতে পূর্ণ, ইহাদেব ভাব গভীব, প্রকাশভঙ্গী সরল। বাউল গানেব মিষ্টিক ভাব, তাঁহাব গানে নাই। আর্থিক দিক হইতে তিনি নিঃস্ব বটে, কিন্তু তিনিই বলিতে পাবেন,—

'We are the poor children, but not so poor who sing
Our carol without voiceless hearts to greet
the new-born King'. (Middleton)

প্যাবীমোহন কবিবত্ন

সহজ ও সবল গীতবচযিতা হিসাবে প্যাবীমোহন কবিরত্নের প্রসিদ্ধি ছিল। ইনি বর্দ্ধমানেব অন্তর্গত সাহাজুই গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহাব পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই কবিরত্ন মহাশয সঙ্গীত বচনা করিতেন। বর্দ্ধমানের মহাবাজ তাঁহাব গীতশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'কবিবত্ন' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

কবিরত্ন মহাশয় নানা বিষয়েই গান রচনা করিতেন। কোন কোন গানে মাছ-মাংসের প্রশস্তি, কোন গানে মদ্যপানের নিন্দা। ইয়ং বেঙ্গলের ইংরাজিপনার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। ইঁহার রচনা অনেকটা ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক। যুগের ছাপ তাঁহার কবিতাবলীতে সুস্পষ্ট। প্যারীমোহন কবিরত্নের পারমার্থিক সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি 'মালসী'ও পাওয়া যায়। লঘু-তরল ভঙ্গীতে তিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন। 'আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া'—কবিতায় কল্পনার বিশেষত্ব আছেঃ বদ্ধজীব এ স্থলে কুয়োর ঘড়ার সহিত উপমিত হইয়াছে। 'এই বেলা মন, নে রে ডেকে নীলাব্জ-বরণী মাকে'—গানটি 'মনোদীক্ষা'র অন্তর্গত। কবির সকল কথাই যেন তখনকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত 'হঠাৎ বাবু' ও ইয়ং-বেঙ্গলের উদ্দেশ্যে রচিত। নিম্নলিখিত 'মনোদীক্ষা'র ব্যঙ্গাত্মক উপদেশটি দ্রষ্টব্যঃ

ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল পটল তুলতে হবে।
এখনও উপায় আছে, ভেবে নে ভবানী ভবে।
কোথা থাক্‌বে ঘড়ি-বাড়ী পড়ে গড়াগড়ি যাবে···
পমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে?
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা গান করবে কে মধুর রবে,
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে!

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী বাঙালী-সত্তার প্রতীক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই শতকের 'ইয়ং-বেঙ্গল' আচার-আচরণে পাশ্চাত্ত্য রীতির অনুরাগী ছিল; সে অনুরাগ কতখানি হৃদয়ের তাহা বলা শক্ত। মধুসূদন 'ইয়ং-বেঙ্গলে'র প্রতিনিধি। ইউরোপ গমনের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, নাম হয় মাইকেল। মাইকেলী-ভাব ঠিক অন্তরের সামগ্রী নয়, বাইরের আবরণমাত্র। অন্তরে তিনি 'দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন।' তাই হোমার, ভার্জ্জিল, মিল্টন, দান্তে পাঠ করিয়া তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে যে অমর 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙালীর অন্তর-মথিত মাতৃ-স্নেহ, স্বামী-প্রীতি, পত্নী-প্রেম ও ভ্রাতৃ-স্নেহের আদর্শে রচিত। অন্তরের এই বাঙালী ভাবই তাঁহাকে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনায় প্রেরণা দান করিয়াছিল। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে শ্রীমধুসূদনের দেশীয় ভাবানুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টান হইলেও, এ দেশের 'নবমী'র গান, বিজয়া'র করুণ সঙ্গীত তাঁহাকে কি ভাবে

কাঁদাইত, তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাব বচিত 'নবমী-নিশীথ' বিষযক এই চতুর্দ্দশপদী কবিতায়,—

যেয়ো না বজনি, আজি লযে তাবাদলে,
গেলে তুমি দযাময়ি, এ পবাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় ববি উদয-অচলে,
নয়নেব মণি মোব নযন হাবাবে।

মা মেনকাব এই সকরুণ মিনতি কি একজন খ্রীষ্টানেব, না ভক্ত শাক্ত কবিব।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেন বাঙলাব বিখ্যাত কবি। ইনি চট্টগ্রামে নযাপাডায জন্মগ্রহণ কবেন পিতাব নাম গোপীমোহন সেন। নবীনচন্দ্রেব গীতিকবিতায উচ্ছল ভাবাবেগেব আতিশয্য লক্ষণীয। উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলিযাই তাঁহাব কবিতায গীতিকবিতাব সংহত, বসঘন রূপ প্রকট হয় নাই। কাহিনী-কাব্য বচনায তাঁহাব খ্যাতি অবিসংবাদিত। নবীনচন্দ্র 'নবমী' বিষযক এই কবিতাটি বচনা কবিযাছিলেন,—

যেও না, যেও না নবমী বজনি,
সন্তাপহাবিণী লযে তাবাদলে।
গেলে তুমি দযাময়ি, উমা আমাব যাবে চলে॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)

পূর্ব্ববঙ্গেব 'বিদ্যাসাগব', সুবক্তা, প্রবন্ধকাব কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি বহুবিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকাব সম্পাদনা কবিতেন। আবেগেব উচ্ছ্বাসে বচনা পূর্ণ হইলেও, তাঁহাব প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যেব চিহ্ন সুস্পষ্ট। ইনি পাবমার্থিক সঙ্গীতও বচনা করিয়াছিলেন। শাক্তপদাবলী-ধৃত,—'হেলায আমি যাব তবে মাগো, তোমাব ভক্তি-ভেলা দৃঢ ধরে'—কবিতাটিতে সাধকের 'সাধন-শক্তি'ব মহিমা ঘোষিত হইযাছে। পদটিতে ঐকান্তিক ভক্তি ও আত্মনিবেদনেব সুবও বর্ত্তমান।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)

অক্ষয়চন্দ্র সরকাব বঙ্কিম-চন্দ্রের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। গদ্যরচনাতেই তাঁহার সমধিক কৃতিত্ব। ইনি 'সাধাবণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকাব সম্পাদনা করিতেন। লোকসেবার উদ্দেশ্যেই তাহাব সাহিত্য-সেবা ঃ তাই তাঁহার বচনা প্রাঞ্জল, ভাব

মধুর ও সহজ-বোধ্য। 'বঙ্গদর্শনে'ও ইনি লিখিতেন। ইঁহার রস-রচনাও সমাদৃত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে ইনি 'দশমহাবিদ্যা'র রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইনি কবিতাও লিখিতেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, 'গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে'—আগমনী গানটির মধ্যে মেনকার জবানীতে লেখকের সূক্ষ্ম লোক-জ্ঞান ও কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন রহিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)

রাজকৃষ্ণ রায় সুকবি। গদ্যে ও পদ্যে তিনি প্রচুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'লিখিয়া জীবিকার্জ্জনে রাজকৃষ্ণই পথপ্রদর্শক' (ডাঃ সুকুমার সেন)। ইনি 'বীণা' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' তাঁহার বিখ্যাত নাটক। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহসন 'উৎকট বিরহ,' 'বিকট মিলন'-এ অকৃত্রিম হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার 'আগমনী-বিজয়া' অনেকটা নকসাজাতীয় রচনা। 'কেমনে মা ভুলে ছিলি এ দুঃখিনী মায়? পাষাণ-নন্দিনী, তুইও কি পাষাণীর প্রায়?'—মিলন বাৎসল্যের এই পদটিতে মেনকার উক্তি অনুযোগ-মিশ্রিত হইলেও অসীম স্নেহ মাখানো। কন্যা-বিরহে সংসার কেমন করিয়া মা মেনকার সময় কাটিত, তাহার বর্ণনাও বেশ কবিত্বপূর্ণ। কবিতাটিতে ভক্তিরস অপেক্ষা, লৌকিক ভাবের মাধুর্য্যই অধিক আস্বাদনীয়।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় সুকবি। তাহার পারমার্থিক কবিতাগুলিও ভাবপূর্ণ। তাহার রচনায় লৌকিক ভাবের মধ্যে ভক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। কবি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়াই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। 'কাল এসে, আজ আমার উমা যেতে চায়'—এই বিজয়ার গানটিতে যেমন মায়ের হৃদয়-বেদনা মূর্ত্ত হইয়াছে, তেমনই—

'মা বলে কাঁদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয়!
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়।'

গানটিতে ভক্ত সন্তানের মাতৃ-স্নেহ লাভের করুণ আর্ত্তি ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় অনুযোগ, আশঙ্কা আত্মনিবেদনের ভাবগুলি চমৎকার।

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৫১-১৯০২)

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হুগলী গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন।

ইনি 'আয্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা' স্থাপন করেন ও 'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ইনি 'পরিব্রাজক' উপাধি লাভ করেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া 'কৃষ্ণানন্দ স্বামী' নাম গ্রহণ করেন। ইনি 'গীতার্থ সন্দীপনী,' 'ভক্তি' ও 'ভক্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শক্তি-সঙ্গীতও ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

দুর্গা নামে রয় না জীবের ভয় ভাবনা
ভয় ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা।

—গানটিতে নন্দী ও জয়ার রস-কলহের মধ্য দিয়া শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। শিব ও শক্তির মধ্যে শক্তিই প্রধান, এই কথাটি কৌতুকরসের মধ্যে উপস্থাপিত হওয়ায়, গানটি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গানটির মধ্যে পাণ্ডিত্যও কৌতুকহাস্যের স্পর্শে স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য ইহাতে গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্বমূলক বিখ্যাত 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের' গানটির প্রভাব বর্ত্তমান। গোবিন্দ অধিকারী যেখানে গাহিয়াছেন,

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা,
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ওই যে যায় গো দেখা।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী সেখানে লিখিয়াছেন,

নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী,
জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা বলব কত।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের পূর্ব্ব নিবাস ছিল নবদ্বীপ, পরে ইনি কলিকাতায় বসবাস করেন। ত্রৈলোক্যনাথ নববিধানমতে ব্রাহ্ম ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী। নাটক উপন্যাস ও কাব্য লিখিয়া ইনি নাম করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু অধ্যাত্মসঙ্গীতও আছে। 'মন একবার হরিবল, হরিবল, হরিবল। হরি, হরি, হরি, ব'লে ভবসিন্ধু পারে চল'—এই বিখ্যাত গানখানি সান্যাল মহাশয়ের রচনা। শাক্তপদাবলীর 'ভক্তের আকূতি' অধ্যায়ের 'আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।'—গানটি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা। গানটিতে কবি 'প্রেমদাস' ভণিতা দিয়াছেন। জ্ঞান অপেক্ষা ভাব ও প্রেমের প্রতিই কবির বেশি আগ্রহ : 'প্রেমধনে কর মা ধনী'—ইহাই কবির বিশিষ্ট আকূতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সুযোগ্য পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা সংক্ষেপে ডি. এল. রায়। অভিনয়োপযোগী নাটক স্বদেশপ্রীতিমূলক গান এবং হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের আসন বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আবেগ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ হইলেও ডি. এল. রায়ের নাটক সুখপাঠ্য। সঙ্গীতে তিনি একটি বিশিষ্ট সুর প্রবর্ত্তন করেন: বিশেষ করিয়া দেশপ্রেমমূলক সমবেত সঙ্গীতে এই সুর অতি পরিচিত। ডি. এল. রায়ের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ', 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' প্রভৃতি সঙ্গীত এবং হাসির গানের মধ্যে 'উই আর রিফরম্ড্ হিন্দুস', 'হতে পাত্তেম', 'একটা নূতন কিছু কর' গানগুলি প্রসিদ্ধ। শাক্ত গীতির—

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা॥

—গানটি 'পরপারে' নাটক হইতে উদ্ধৃত। গানটিতে ভক্তের কাতরতা, মৃদু অভিমান ও মাতৃ-নির্ভরতার ব্যাকুল সুরটি বড় মনোরম। ইহাতে ভাব ও ভক্তির অত্যাশ্চর্য্য মিলন সাধিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০)

পাবনা জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুগায়ক ও সুকবি। 'কান্তকবি' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। কান্তকবির 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গীতগ্রন্থদ্বয় বঙ্গ-সাহিত্যের পরম আদরের সামগ্রী। কান্তকবির গান কবিত্বপূর্ণ, গভীর ভাবের অভিব্যঞ্জক। 'ভক্তের আকূতি' পর্য্যায়ে রজনীকান্তের—'আর কতদিন ভবে থাকিব মা, পথ চেয়ে ক' ডাকিব মা!'—গানখানি ভক্তের কাতরতা ও মিনতির সুরে ভরা। মাতৃস্নেহবঞ্চিত সন্তানের হতাশার ব্যঞ্জনাও মর্ম্মস্পর্শী!

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

বরিশালের নেতা, সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমিক বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত, জজ ব্রজমোহন দত্তের পুত্র, জন্মস্থান পটুয়াখালি। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের পরিচালনায় সমগ্র বরিশাল আন্দোলিত হইয়াছিল। ইনি 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম', 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। দত্ত মহাশয়ের—

'শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান,
এ জগতে কোথায় পেলি?

—গানটির মধ্যে ব্রিটিশ-অত্যাচারে পীড়িত দেশকেই শ্মশানভূমি কল্পনা করা হইয়াছে। এই মহাশ্মশানে, যেখানে 'ত্রিশ কোটি শব' পড়িয়া আছে, সেইখানে মায়ের নৃত্য হউক। পদটির মধ্যে নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীর প্রতি কটাক্ষও রহিয়াছে। ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষ জীবন্ত নয়, শব। অশ্বিনীকুমারের গানগুলি স্বদেশ প্রেমের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৭-১৯৪০)

চব্বিশ পরগণা জিলার বিখ্যাত ভাটপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দদুলাল বিদ্যারত্ন। ইনি বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ সম্পাদনা করিয়া বঙ্গবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কতকগুলি পুরাণের বঙ্গানুবাদও তিনি করিয়াছেন। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের চণ্ডীভাষ্যও বিখ্যাত। 'মা তোমা নিদয়া বলে কোন্ জন নিন্দা করে' গানটিতে করুণাময়ী জগজ্জননীর অশেষ করুণার কথা বলা হইয়াছে। গানটির মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকচ্ছায়া পড়িয়াছে।

শাক্তপদাবলীতে গৃহীত কবিদের আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। আমার বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রদের নিকট হইতে কয়েকজন সাধক কবির কথা জানিতে পারিয়াছি। নিম্নে তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

সাধক কবি ভুলুয়া বাবা (১৮৬২-১৯৪১)

মহাপুরুষ ভুলুয়া বাবা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণা ঘোষ পুরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশেই পরম বৈষ্ণবাচার্য শাক্ত যাদবানন্দ অবধূত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুলুয়া বাবা সেই অবধূত যাদবানন্দেরই অংশ।

ইঁহার পিতৃদত্ত নাম কালিদাস শৈশব হইতেই তাহার মধ্যে মাতৃভক্তির বিকাশ হয়। ইনি সংস্কৃত কাব্যের উপাধি লাভ করেন এবং কলেজীয় শিক্ষাও তাহার ছিল। কিছুদিন রংপুরে (কুণ্ডীর গোপালপুরে) শিক্ষকতাও করেন। অন্যান্য শাক্ত সাধকদের মত তিনিও গৃহধর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু হৃদয় যাঁহার মাতৃভাবের গৈরিকে অনুরঞ্জিত, গৃহী হইয়াও তিনি সন্ন্যাসী। বাল্যকাল হইতেই কালিদাস সহজ এক ভাবদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং আঠারো বছর বয়স হইতেই পরিব্রাজক বেশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কামাখ্যায় আসিয়া তিনি ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর মণ্ডলেশ্বর পূর্ণানন্দ সরস্বতী ও শ্যামানন্দ সরস্বতীর সহিত মিলিত হন। এইখানেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী' দুই খণ্ডে সমাপ্ত করেন এবং অসংখ্য ভক্তি-সঙ্গীত রচনা করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুমহারাজ শ্যামানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে বিধিমতে অবধূত আশ্রম ও কাষায় বস্ত্র প্রদান করেন। এই সময় হইতেই তিনি 'ভুলুয়া' নামে পরিচিত হন।

পূর্ববর্তী শক্তি সাধক ও শাক্ত কবিদের ধারা ধরিয়া সাধনা এবং সঙ্গীত রচনা করিলেও —ভুলুয়া বাবা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শক্তি-সাধনার ঐশ্বর্য্যানুভূতি তাঁহার সাধনায় মাধুর্য-পরিণত লাভ করিয়াছিল এবং শাক্ত দীক্ষা ও শাক্ত সিদ্ধি ব্রজ মাধুরীর রসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি কেবল অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই— রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত হইতে যে শক্তি-সাধনা সুরু হইয়াছিল, তাহার একটি তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার শ্রীশ্রীকালীকুণ্ডলিণী, সম্ভাবতরঙ্গিনী ও উচ্ছ্বাসতরঙ্গিনী এই দিক হইতে অতিশয় মূল্যবান। এই সকল গ্রন্থ হইতে শক্তিসাধনা সম্পর্কে এবং লুপ্ত-পরিচয় প্রাচীন শাক্ত-সাধক সম্পর্কে অনেক সুদুর্লভ তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায়।

ভুলুয়া বাবার কবিত্ব শক্তিও অনন্য সাধারণ। তাঁহার পদসমূহের সংখ্যা কয়েক শত এই সকল গানে তিনি উমা ও শ্যামার ভাবে বিভোর হইয়াছেন:

'মাটি তোর প্রতিমাটি প্রতিমা প্রতিমা।
প্রতিমা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিমা ॥'

—ব্রহ্মময়ী মায়ের এই বিশ্বরূপের কল্পনা অভিনব। তাহার রচনা কোথাও সহজ আন্তরিকতায় পূর্ণ যেমন,

'হার, তুই কি আমার মেয়ে হবি?
মেয়ে হলে এবার, মায়ের ধরম যত
আমার কাছে তুই কি দেখবি, শিখবি?'

আবার কোথাও বা রচনা ছন্দে, শব্দঝঙ্কারে সচেতন শিল্পীর শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। যেমন,—

মরি হায়, কি অপরূপ ওই কালীরূপ
আমি বড় ভালবাসি।
নাচে মা, এলোচুলে হেলেদুলে
বিলায়ে নীল কিরণ রাশি ॥

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভুলুয়া বাবা দেহরক্ষা করেন।

সতীশচন্দ্র সেনশর্মা (বাংলা ১২৮৫-১৩৫৭)

বরিশাল জেলায় ভাটিয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত সেনবংশে সতীশ চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম অভয়া চরণ ও মাতার নাম দ্রবময়ী। ইনি কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নিকট সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি সুচিকিৎসক রূপে খ্যাতি লাভ করেন

শৈশব হইতেই সতীশ চন্দ্রের মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন এবং নিত্য মাতৃমন্ত্র স্মরণ তাঁহার জীবনের অন্যতম বিশিষ্টতা। তিনি অনেক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, তন্মধ্যে,

জয় মা কালিকে কৈবল্য দায়িকে
জয় মা তারিণী তারা।
জয় মা শিবানী অশিব নাশিনী
জয় কালভয় ভীতি হরা॥

প্রভৃতি গান ভক্তির স্পর্শে প্রাণময়।

গিরীশ ভট্টাচার্য

গিরীশ ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কুটবিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত শিক্ষা সমাপন করিয়া কবি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সুললিত কণ্ঠে তিনি প্রতিবৎসর শ্রাবণমাসে মনসার ভাসান গান করিতেন 'গিরীশের আশা কেবল গিরিশ-হৃদয়ধন'। ইনি মহাবিদ্যা তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং প্রাণায়ামে ছিলেন অগ্রসর সাধক। কুম্ভক করিয়া ইনি বহুক্ষণ জলে ভাসিয়া থাকিতে পারিতেন। মৃত্যুর ৩।৪ মাস পূর্বে ইঁহার জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তখন তিনি রোগশয্যায় শায়িত। একদিন তাঁহার নাভিশ্বাস উঠিল, সকলেই মনে করিল, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেহ গৃহের বাহিরে আনা হইল এবং শবদাহের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন এবং সকলে সাশ্চর্যে দেখিল তিনি বাঁচিয়াই আছেন। ইহার পর তিনি ছয়মাস জীবিত ছিলেন।

গিরীশের গানগুলি অত্যন্ত মধুর, ভক্তি ও বিশ্বাসের স্পর্শে প্রাণময়। তাঁহার রচিত কয়েকশত সঙ্গীত 'সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গান গভীর আবেগের পরিচয় বহন করে।

'কত ভালবাসি তোরে বুঝাতে পারি না ব'লে।
গাঁথা আছে প্রাণে প্রাণে ভুলিব না প্রাণ গেলে॥'

—গানখানি সুগভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ।

এইরূপ অসংখ্য কবি শাক্তগীতি রচনা করিয়াছেন। এখনও নিভৃত পল্লীর বুকে বনফুলের মত কত সঙ্গীত সঙ্গোপনে প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করিবে কে। শাক্তগীতি মায়ের 'প্রসাদ'। যাহাতে অনাদরে এই প্রসাদ নষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সমাপ্ত